শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

ইসলাহী খুতুবাত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদী

উস্তাযুল হাদীস ওয়াত্‌তাফসীর মাদরাসা দারুর রাশাদ

মিরপুর, ঢাকা।

খতীব বাইতুল ফালাহ্ জামে মসজিদ

মধ্যমণিপুর, মিরপুর ঢাকা।

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

স্ত্রীর অধিকার ও তার মূল্যায়ন

স্বামীর মর্যাদা ও অধিকার

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

হজ্জ. কুরবানী এবং দশই জিলহজ্জ

বিষয়	পৃষ্ঠা

সীরাতুন্নবী (সা.)-এর আয়নায় আমাদের জীবন

বিষয়	পৃষ্ঠা

সীরাতুন্নবী (সা.)
মাহফিল ও জলসা-জুলূস

বিষয়	পৃষ্ঠা

গরীবদের অবজ্ঞা করো না

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

নফসের টালবাহানা

বিষয় পৃষ্ঠা

মুজাহাদা কেন প্রয়োজন?

স্ত্রীর অধিকার ও তার মূল্যায়ন

একটি মেয়ে দুটো কথা উচ্চারণের মাধ্যমে একজন পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এই দুটো কথাকে মেয়েটি এতটুকু সম্মান করে যে, যার জন্য সে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বংশ- পরিবারসহ সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে একমাত্র স্বামীর জন্য হয়ে যায়। এরপর তার জন্য আসে এক নতুন পরিবেশ, অপরিচিত ঘর। অজানা-অচেনা মানুষদের সাথে সংসার পাতার জন্য সে অন্যের ঘরে আবদ্ধ হয়ে যায়। তবুও কি তোমরা নারীর এই ত্যাগের মূল্যায়ন করবে না? অথচ বিধান যদি এর উল্টোটা হতো, পুরুষদের যদি বলা হতো, বিয়ের পর তোমরা তোমাদের মাতা-পিতা ছেড়ে, বংশ-পরিবার সর্বস্ব পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে স্ত্রীর বাড়িতে। তখন তা কত কঠিন হতো। অতএব, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের কুরবানির যথাযথ মর্যাদা দেয়া পুরুষ সমাজের মানবিক কর্তব্য।

স্ত্রীর অধিকার ও তার মূল্যায়ন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ـ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ،

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ ١٩)

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ (سُوْرَةُ النِّسَآءِ ـ ١٢٩)

এবং তোমরা যতই ইচ্ছা করনা কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি কখনই সমান ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তোমরা কোনো একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না আর অপরজনকে রেখোনা ঝুলন্ত অবস্থায়। যদি তোমরা

নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । [সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১২৯]

হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِى الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَّرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ - (صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ المدارة مع النساء . رقم الحديث ٥١٨٤)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। কেননা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড্ডি থেকে। পাঁজরের হাড়ের উপরের দিকটা খুব বাঁকা। সুতরাং তুমি যদি ওটা সোজা করতে চাও, ভেঙ্গে ফেলবে। আর ছেড়ে দিলেও বাঁকাই রয়ে যাবে। তাই তাদের ব্যাপারে সদুপদেশ গ্রহণ কর। [বুখারী শরীফ]

হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হকের গুরুত্ব

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আল্লামা ইমাম নববী (রহ.) বান্দার হক ও অধিকার সম্পর্কে তাঁর আলোচনার সূচনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বান্দার যেসব হক জরুরী বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং যেসব অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে ইমাম নববী (রহ.) বিশদ আলোচনা করেছেন। আমি ইতিপূর্বেও বারবার বলেছি যে, হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হক ও অধিকার দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়টি এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহর হক তাওবাহ করলে মাফ হয়ে যায়। অর্থাৎ (আল্লাহ না করুন) আল্লাহর হক আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার গাফলতি হয়ে গেলে তার সামাধান করা খুব কঠিন নয়। মানুষ যখনই এই ভুলের কারণে লজ্জিত হবে, তাওবাহ ও ইসতিগফার করবে, তখনই আল্লাহ তা'আলা তা মাফ করে দিবেন। কিন্তু মানুষের হক এমন যে, এক্ষেত্রে শুধু লজ্জিত হলে, তাওবা ও ইসতিগফার করলে মাফ পাওয়া যায় না। বরং

হকদারের কাছে তার হকও পৌছিয়ে দিতে হয়। তারপর হকদার যদি মাফ করে দেন, তাহলে ভিন্ন কথা। এ কারণেই হুকূকুল ইবাদের ব্যাপারটা বড় কঠিনই বটে।

হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হক সম্পর্কে উদাসীনতা

হুকূকুল ইবাদের ব্যাপারটি যতখানি কঠিন, দুঃখজনক ভাবে আমাদের সমাজে তা ততখানি গুরুত্বহীন। আমরা যেন বেশ কিছু ইবাদতকেই দ্বীন ভাবছি। অর্থাৎ নামায, রোযাও হজ্জ যাকাত এগুলোকে তো আমরা দ্বীন মনে করি ঠিকই, কিন্তু হুকূকুল ইবাদকে যেন আমরা দ্বীন ভাবতে রাজী নই। অনুরূপ ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায় আমাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও। এসব ক্ষেত্রে অবহেলা, ভুল-ত্রুটি যেন আমরা বুঝতেও রাজী নই।

গীবত হুকূকুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত

বিষয়টি বুঝানোর জন্য একটি সহজ সরল উদাহরণ এভাবে পেশ করা যেতে পারে। (আল্লাহ না করুন) কোনো মুসলমান মদ পানের কুঅভ্যাসে লিপ্ত। এখন যার মাঝে সামান্যতম ধর্মীয় অনুভূতি আছে সেও এমন ব্যক্তিকে মন্দ চোখে দেখবে। মদ্যপায়ী নিজেও তার কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হবে, যেহেতু সে একটি অপরাধে লিপ্ত। কিন্তু গীবত করা যার অভ্যাস তাকে সমাজে মদ্যপায়ীর মত এতটা মন্দ চোখে দেখা হয় না। গীবতকারী নিজেও নিজেকে মদ্যপায়ীর মত অপরাধী বা গুনাহগার মনে করে না। অথচ মদপান করা যতটুকু গুনাহ গীবত করাও ততটুকু গুনাহ। বরং বলা চলে যে, গীবত মদপানের চাইতেও জঘন্যতম অপরাধ। কারণ, গীবতের সম্পর্ক হুকূকুল ইবাদের সাথে। তাছাড়া কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা গীবত সম্পর্কে এমন একটি উদাহরণ পেশ করেছেন, যে উদাহরণ অন্য কোনো গুনাহ সম্পর্কে পেশ করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, গীবতকারী কেমন যেন আপন মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণকারী। গীবতের গুনাহ এত মারাত্মক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সমাজে তা ব্যাপক। কোনো মজলিসই যেন গীবত ছাড়া আমাদের জমে উঠে না। এটাকে মন্দ হিসেবে ভাবতেও আমরা রাজি নই। কেমন যেন এর সাথে দ্বীন-ধর্মের কোন সম্পর্কই নেই।

ইহসান সর্বদাই কাম্য

আল্লাহ তা'আলা আমার আধ্যাত্মিক রাহবার ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) এর দরজা বুলন্দ কুরুন। তিনি একদিন বললেন, একবার জনৈক ভদ্রলোক আমার

এখানে এসেছিলেন এবং আনন্দচিত্তে গর্বিত ভঙ্গিতে আমাকে বললেন, আল্লাহর শোকর ইহসানের দরজা আমার অর্জিত হয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ ইহসান অনেক বড় বিষয়, যার সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে–

أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ـ (صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ، كِتَابُ الْإِيْمَانِ ، بَابُ سُوَال جبرئيل ، رقم الحديث ٥٠)

অর্থাৎ, ইহসান বলা হয়, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এমনভাবে করা যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে কমপক্ষে এই খেয়াল করো যে, তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন, ইহসানের এই স্তরটি আমি জয় করে নিয়েছি। হযরত ডাক্তার সাহেব (রহ.) বলেন, ভদ্রলোকের কথা শুনে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার মঙ্গল করুন এটা তো অনেক বড় নেয়ামত। তবে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। বলুন তো আপনার কথিত এই ইহসান শুধুই কি নামাযের মধ্যেই সীমিত না কি নামাযের চৌহদ্দি পেরিয়ে স্ত্রী, সন্তানাদির সাথে আচার-আচরণের সময়েও উক্ত ইহসান অনুভব করেন? অর্থাৎ, স্ত্রী পরিজনের সাথে পারিবারিক কাজ -কর্ম যখন করেন, তখনও এই ইহসানের কথা আপনার খেয়াল হয় কি? না কি তখন এই খেয়াল আর হয় না? ভদ্রলোক উত্তরে বললেন– হাদীস শরীফে তো এসেছে যে, তোমরা ইবাদত করার সময় এমন ভাবে ইবাদত করবে যেন আল্লাহ তোমাদের দেখছেন। কিংবা তোমরা তাকে দেখছো! সুতরাং আমরা তো জানি, ইহসানের সম্পর্ক শুধু ইবাদতের সাথে, নামাযের সাথে। অন্য কোনো কিছুর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এবার হযরত ডাক্তার সাহেব (রহ.) বললেন– এজন্যই আমি উক্ত প্রশ্নটি করেছিলাম। কারণ আজকাল সাধারণতঃ প্রায় সকলেই আপনার মত এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত। তাদের ধারণা মতে, ইহসান শুধু নামাযের মধ্যেই কাম্য কিংবা যিকির তেলাওয়াতের মধ্যেই শুধু সীমিত; অথচ বাস্তবতা হচ্ছে ইহসান সর্বদাই কাম্য, জীবনে প্রতিটি স্তরে ইহসান অবশ্যই প্রয়োজন। দোকানে বসে ব্যবসা করছো সেখানেও ইহসানের উপস্থিতি থাকতে হবে। মোটকথা সর্বক্ষেত্রে স্মরণে থাকতে হবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। নিজ অধীনস্তদের সাথে চলা ফেরার সময়ও এই ইহসানের উপস্থিতি থাকা চাই। ছেলে-সন্তান, স্ত্রী-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীর-সাথে উঠাবসার সময়ও ভাবতে হবে যে, আল্লাহ

আমাকে দেখছেন। প্রকৃতপক্ষে এটার নামই ইহসান। ইহসান শুধু নামাযের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

যে নারী জাহান্নামী

ভালোভাবে বুঝে নিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা আমাদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এক মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন নারী। রাতদিন যে ইবাদতে লিপ্ত থাকে। নফল নামায, যিকির তেলাওয়াতও খুব করে। এক কথায়, সর্বদাই সে ইবাদতে মগ্ন থাকে। এই নারী সর্ম্পকে আপনার রায় কি? তার পরিণাম ফল কেমন হবে? একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন– বল তো, মহিলাটি প্রতিবেশীর সাথে কেমন আচরণ করে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন– প্রতিবেশীর সাথে তার আচরণ অসন্তোষজনক। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– মহিলাটি জাহান্নামে যাবে। [আল আদাবুল মুফরাদ-, ইমাম বুখারী, পৃ. ৪৮, হাদীস নং ৯১১]

বেহেশতী মহিলা

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আরেকজন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। যে মহিলাটি নফল ইবাদত খুব একটা বেশী করতো না। ফরয ওয়াজিবগুলো শুধু যত্ন সহকারে আদায় করতো বড় জোর সুন্নাতে মুয়াক্কাদার গুরুত্ব দিতো। তবে প্রতিবেশীর সাথে তার আচরণ ছিলো সন্তোষজনক। পিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন– এই মহিলাটি বেহেশতে যাবে। [প্রাগুক্ত]

দরিদ্র কে?

উল্লিখিত হাদীস সমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কেউ যদি নফল ইবাদত করে তাহলে এটা খুবই ভালো। তবে নফল ইবাদত না করলে তাকে পরকালে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে না। জিজ্ঞাসা করা হবে না তুমি অমুক নফল ইবাদত করোনি কেন? কারণ নফল অর্থই হলো করলে সাওয়াব পাবে আর না করলে গুনাহ নেই। কিন্তু বান্দার হক এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, কিয়ামতের দিবসে যার সর্ম্পকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। বেহেশত-দোযখের ফয়সালা নির্ভর করবে এই হুকূকুল ইবাদের

উপর! একটি হাদীসে এসেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই প্রকৃত দরিদ্র, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায রোযা নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু দুনিয়াতে সে কারো হয়তো হক নষ্ট করেছিল, কাউকে বা গালমন্দ বলেছিল, কারো অন্তর চূর্ণ করে দিয়েছিল কাউকে বা দিয়েছিল দুঃখ, তার পরিণতি হবে এই যে, সে যত নেক আমল করে এসেছিল সবগুলো কাউকে না কাউকে দিয়ে দিতে হবে তাদের হক নষ্ট করার কারণে। আর অন্যদের গুনাহ তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে, তার হক নষ্ট করার কারণে। এই জন্য হক্কুল ইবাদের বিষয়টি শরীয়তে এক অতী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

[তিরমিযী শরীফ, বাবু মা-জা-আ ফী শানিল হিসাব ওয়াল ক্বিয়ামাহ, বাবু সিফাতিল ক্বিয়ামাহ হাদীস নং ২৫৩৩]

হক্কুল ইবাদ ইসলামের তিন চতুর্থাংশ

এর পূর্বেও আপনাদেরকে বলেছিলাম ইসলামী ফিকাহ এর কথা। অর্থাৎ যে শাস্ত্রটিতে ইসলামের যাবতীয় বিধি বিধানের বর্ণনা দেয়া হয়, তার নাম ইসলামী ফিকাহ। যদি ইসলামী ফিকাহকে সমানভাবে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়, তাহলে দেখা যাবে এর এক চতুর্থাংশ রয়েছে ইবাদতের বর্ণনা। আর অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ জুড়ে শুধু হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ ব্যাপী বর্ণনা দেয়া হয়েছে মানুষের লেনদেন, কাজ-কারবার, আচার-ব্যবহার, পারস্পরিক সম্পর্ক তথা মানুষের সব প্রকার অধিকার সম্পর্কে। হানাফী মাযহাবের একটি প্রসিদ্ধ কিতাব হিদায়া এর নাম আপনারা হয়তো শুনেছেন। কিতাবটি চার খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে রয়েছে ইবাদাতের আলোচনা। অর্থাৎ পবিত্রতা, নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্জের যাবতীয় বর্ণনা, আর অবশিষ্ট তিন খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে মু'আমালাত, মু'আশারাত তথা লেনদেন, কাজ-কারবার, আচার-ব্যবহার, শিষ্টাচার এক কথায় হক্কুল ইবাদ সম্পর্কে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার ইসলামের তিন চতুর্থাংশ। আমাদের আলোচনা চলছে সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। আল্লাহপাক আমাদেরকে আমলের নিয়্যাতে বলার ও শোনার তাওফীক দিন এবং তার সন্তুষ্টি মতে হক্কুল ইবাদ সম্পাদনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রাক-ইসলামী যুগে নারীর অবস্থা

বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা ইমাম নববী (রহ.) প্রথমে বাবুল ওসিয়্যাতি বিন নিসা, নামক একটি অধ্যায় লিখেছেন। অর্থাৎ নারীদের অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব নসীহত করেছেন, সেগুলোর বর্ণনা ওই অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন। সর্ব প্রথম নারীদের আলোচনা করেছেন, যেহেতু সমাজে সব চাইতে বেশী অবিচার, অবহেলা নারীদের ক্ষেত্রে হয়। তাদের প্রতি অবিচার ইসলাম পূর্ব যুগে আরো বেশী ছিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনীত আদর্শ পূর্ব পর্যন্ত নারীদেরকে যেন মানুষই মনে করা হতো না। ভেড়া-বকরির ন্যায় আচরণ করা হতো তাদের সাথে। নারীদেরকে সকল মানবিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত করে রেখেছিল। যেকোনো লেনদেনের ব্যাপারে তারা ছিলো অধিকার হারা। তারা ছিল যেন ঠিক গৃহপালিত পশু। আচার-ব্যবহারে গৃহপালিত পশু আর একজন গৃহিনী ছিলো একই সমান।

নারীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্বপ্রথম এই পৃথিবীকে নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম এই অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন যে, নারীদের অধিকার আছে, তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর। এ সম্পর্কে আল্লামা নববী (রহ.) সর্বপ্রথম কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। যে আয়াত এ বিষয়ে অত্যন্ত সারগর্ভপূর্ণ।

ইরশাদ হচ্ছে– وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .

আয়াতটিতে সকল মুসলমানকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের সাথে ভালো আচরণ করবে, তাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দিবে না। এটা এক ব্যাপক হিদায়াত। বরং আয়াতটিকে নারীদের অধিকার সম্পর্কে একটি শিরোনামও বলা চলে। যে শিরোনামের ব্যাখ্যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং কথা ও কাজের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। নারীদের প্রতি সদাচরণের ব্যাপারে তিনি আরো গুরুত্বারোপ করে বলেন–

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَاءِهِمْ، وَاَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِىْ . (جَامِعُ التِّرْمِذِىْ، بَابُ مَا جَاءَ فِىْ حَقِّ الْمَرْاَةِ عَلٰى زَوْجِهَا رقم الحديث . ١١٧٢)

তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো মানুষ তারাই যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করে।আর আমি তোমাদের মধ্য থেকে আমার স্ত্রীদের সাথে সব চাইতে সদাচারণকারী।

নারীদের অধিকার ও তা সংরক্ষণ এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যাবহারের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। অসংখ্য হাদীসে তিনি বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। এমনকি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত সর্বপ্রথম হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ـ

নারীদের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সদাচরণের উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আমার এই উপদেশ গ্রহণ কর।

কুরআন শরীফ শুধু মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করে

আলোচনা সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে একটি কথা বলতে চাই। তা হলো, কুরআন মজীদের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, কুরআন মজীদ শুধু মৌলিক কথা বলে। মূলনীতির বাইরে খুঁটিনাটি বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ কুরআন শরীফ করে না। এমনকি যে নামায দ্বীনের এক গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ, যে নামায সম্পর্কে কুরআন শরীফের ৭৩ জায়গায় শুধু নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই নামায কিভাবে পড়া হবে, পদ্ধতি কি হবে, কত রাকআত পড়া হবে, কি কি কারণে নামায ভেংগে যায় আর কি কি কারণে নামায ভাংগে না ইত্যাদি এসব বিষয়ের ব্যাখ্যা কুরআন শরীফে করা হয়নি। বরং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষার উপরই এগুলো নির্ভর করতে হয়। এমনিভাবে যাকাতের নির্দেশও কুরআন মজীদে বার বার এসেছে। কিন্তু কি পরিমাণ সম্পর্দের মালিক হলে যাকাত দিতে হবে, কোন কোন জিনিসের যাকাত দিতে হবে, এর কোন বিশ্লেষণ কুরআন শরীফে নেই। বরং এসবই নির্ভর করতে হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষার উপর। বুঝা গেলো, কুরআন শরীফ কেবলমাত্র মূলনীতিগুলোর বর্ণনা দেয়, চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রতি সে অগ্রসর হয় না।

পারিবারিক জীবনই পুরো সভ্যতার ভিত্তি

কিন্তু স্বামী-স্ত্রী এবং পরিবারিক ব্যাপার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, তার বিভিন্ন খুটি নাটি দিকও কুরআন শরীফে তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণনা করা

হয়েছে এক একটি করে খুলে খুলে। অতঃপর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। কেনই বা এমন করা হলো? কারণ তো এটাই যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং পারিবারকি জীবনই হলো এই মানব সভ্যতার প্রধান বুনিয়াদ। এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে একটি সভ্য ও সুশীল সমাজ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি সন্তোষজনক হয়, যদি তাদের দাম্পত্যজীবন সুমধুর হয়, পারিবারিক জীবন হয় যদি আনন্দময়, তাহলে ঘর-সংসার হবে সুশৃংখল। ঘর-সংসার সুশৃংখল হলে ছেলে সন্তান হবে সভ্য, ভদ্র ও মার্জিত। আর এরাই যেহেতু সমাজের ভবিষ্যত, তাই এসব শিশু ভদ্র-সভ্য হলে পুরো সমাজটাই হবে সভ্য, সুশীল ও সুশৃংখল। এভাবেই গড়ে উঠবে একটি সভ্য ও সুশীল সমাজের বিশাল ইমারত।

পক্ষান্তরে যদি পারিবারিক কাঠামো হয় ঘুনে ধরা, যদি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক হয় জাহান্নম তুল্য, রাতদিন যদি অশান্তি বিরাজ করে পারিবারিক জীবনে, তাহলে এর প্রভাবে অবশ্যই আক্রান্ত হবে ছেলে সন্তানেরা, বিশৃংখলার নির্মম শিকার এই নতুন প্রজন্মের মাধ্যমে যে সমাজ গড়ে উঠবে সেই সমাজ কতটুকু সভ্য হতে পারে, আপনিই বলুন? এগুলোকে বলা হয় পারিবারিক আইন। যার টুকিটাকি বিষয়ও কুরআন শরীফে আলোচিত হয়েছে।

নারী পাঁজরের বক্র হাড় হতে সৃষ্টির অর্থ

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন। উপমাটি অত্যন্ত চমৎকার ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। এমন উপমা সত্যিই বিরল। তিনি বলেন– নারীদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের বক্র হাড় থেকে। কেউ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাটির ব্যাখ্যা করছেন এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাঁরই পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেছেন হযরত হাওয়া (আ.)-কে।

আবার এর ব্যাখ্যায় অনেকে বলেছেন– মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাটি একটি উপমা মাত্র। অর্থাৎ, নারী যেন পাঁজরের বক্র হাড়ের মতো। পাঁজরের হাড় দৃশ্যত বাকা। কিন্তু তার এই বক্ররূপেই তাকে চমৎকার মনে হয়। এটাতেই তার সুস্থতা। সুতরাং কেউ যদি মনে করে, হাড়টি যেহেতু বাঁকা, তাকে সোজা করে দেই, তাহলে হাড় তো সোজা হবে না, বরং ভেঙ্গে যাবে। যেহেতু ওটা তখন আর পাঁজরের হাড় থাকবে না, প্লাষ্টার করে ফের বাঁকা করতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে হাদীসে একথাই বলা হয়ছে।

إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَّرْتَهَا .

'তুমি ওই পাঁজরের বক্র হাড়টিকে সোজা করতে চাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে।

وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ .

আর যদি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তবে তার বক্রতা বজায় রেখেই উপকৃত হতে হবে। মূলতঃ এটি চমৎকার প্রজ্ঞাপূর্ণ উপমা যা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন বক্রতার মাঝেই তার সুস্থতা। সুতরাং তাকে সোজা করার প্রয়াস বৃথা মাত্র। বরং এ ভাবেই তাকে কাজে লাগাতে হবে।

এটা নারীর দোষ নয়

কেউ কেউ উপমাটিকে দোষ হিসেবে ব্যবহার করে। উপমাটিকে টেনে তারা বলে থাকে, নারীর মূলই হচ্ছে বাঁকা, আমার কাছে অনেকে এধরনের পত্র লিখেছেন যে, নারী পাঁজরের বক্র হাড়ের সৃষ্টি। কেমন যেন তারা এটা নারীর দোষ মনে করেছেন। অথচ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর উদ্দেশ্য আদৌ দোষ বর্ণনা করা নয়।

নারীর বক্রতা একটি স্বভাবজাত বিষয়

মূলতঃ কথা হচ্ছে নারী-পুরুষ দুই মেরুর দুটি মানুষ। উভয়ের মধ্যকার যথেষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ পাক তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। উভয়ের স্বভাব-চরিত্রের মাঝেও যথেষ্ট অমিল বিদ্যমান। ফলে পুরুষ নারী একে অপরকে স্বভাববিরোধী মনে করে। অথচ নারী পুরুষের মাঝে এ ব্যবধান দোষের কিছু নয়। কারণ নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যই হলো বক্রতা। কেউ যদি বলে, পাঁজরের হাড় যেহেতু বাঁকা, তাই নারীজাতিও বাঁকা আর বাঁকা হওয়া নারী জাতির দোষ।

এধরণের কথা নিশ্চয়ই বাস্তব বিরোধী হবে। কারণ নারী তো তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণেই বাঁকা। এটা তার দোষ নয়। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– নারীর মাঝে যদি তোমরা স্বভাববিরোধী কিছু পরিলক্ষিত করো, এটাকে তোমরা বক্রতা মনে করে তার সাথে তিক্ত আচরণ কারো না। বরং তখন মনে করবে, এটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। যদি এটাকে সোজা করার চেষ্টা কর তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং বাঁকা রেখেই তার থেকে উপকৃত হতে হবে।

সরলতা নারীর আকর্ষণ

আধুনিক যুগের বাতাস বইছে উল্টো দিকে। আভিজাত্যের হাওয়ায় গা লেলিয়ে দিয়ে অনেকেই অনেকটা বদলে গেছে। চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটেছে অনেক, অন্যথায় প্রকৃত সত্য হলো, পুরুষের জন্য যা দূষণীয় নারীর জন্য তা অনেক ক্ষেত্রে দূষণীয় নয়, বরং নারীকে তা করে তোলে আরো মনোহর। কুরআন শরীফের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলেও দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে যা পুরুষের জন্য অমার্জিত, নারীর জন্যে তা ভূষণ। যেমন পুরুষের জন্য মূর্খতাসুলভ স্বভাব ও সরলতা শোভনীয় নয়। দুনিয়া সম্পর্কে বেখবর থাকা পুরুষের বেলায় বেমানান। কারণ দুনিয়ার কাজ কারবারের জিম্মাদারী আল্লাহ পাক পুরুষদের কাঁধে দিয়েছেন। তাই তার কাছে জ্ঞান থাকতে হয়। তাকে হতে হয় যথেষ্ট সতর্ক ও সবজান্তা। যদি সে গাফেল বা উদাসীন থাকে, থাকে অসতর্ক ও বে খবর, তাহলে সেটা তার জন্য মোটেও মানানসই নয়, অথচ গাফলতির এ গুণটি, সারল্যতার এ বৈশিষ্টটি নারীর বেলায় প্রশংসনীয়, তার জন্য এটি ভূষণও শোভাবর্ধক। কুরআন শরীফে সূরায়ে নূরে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ . (سُوْرَةُ النُّوْر . ٢٣)

অর্থাৎ, যারা সতীসাধ্বী সরল মনা ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে.....। এখানে গাফলাত, শব্দের অর্থ যারা সরলমনা, দুনিয়া সম্পর্কে বেখবর ও অসচেতন। আর এটা নারীদের গুণ ও শোভা হিসেবে কুরআন শরীফে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এদের প্রতি যারা অপবাদ আরোপ করে তাদের শাস্তি সম্পর্কে আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

বুঝা গেলো নারী যদি জাগতিক ব্যাপারে অসচেতন হয়, চলনসই কাজ কর্মই শুধু যদি তার জানা থাকে তাহলে এটা তার দোষ নয়। বরং এটা তার ভালো গুণ, কুরআন শরীফ এ গুণটিকে উত্তম হিসেবেই আখ্যায়িত করেছে।

জোর করে সোজা করার চেষ্টা করো না

প্রতীয়মান হলো, পুরুষের ক্ষেত্রে যা দূষণীয় নারীর ক্ষেত্রে তা দূষণীয় নয়। আবার যা পুরুষের গুণ, অনেকক্ষেত্রে তা নারীর জন্যে দোষের কারণ হয়ে যায়। সুতরাং কখনো যদি এমন কোনো কিছু নারীর মাঝে পরিলক্ষিত হয় যা পুরুষের ক্ষেত্রে দোষের কারণ, কিন্তু নারীর জন্য দোষের কারণ নয়, তাহলে তখন এটিকে

কেন্দ্র করে তার সাথে খারাপ ব্যবাহর করা উচিত হবে না। কারণ পাঁজরের হাড়ের চাহিদাই হলো, সে তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরুষের স্বভাব থেকে অনেকটা স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। দুইয়ের মাঝে থাকবে যথেষ্ট ব্যবধান। তাই তাকে জোরপূর্বক সোজা করার চেষ্টা করো না।

সকল ঝগড়ার মূল

এটা আমার বক্তব্য নয়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য। নারী-পুরুষের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে তার চাইতে অধিক কে-ই বা জানে! তাই তিনি সমূহ ঝগড়া-বিবাদের মূল চিহ্নিত করেছেন। নারী পুরষের সকল ঝগড়া ঝাটির মূল কারণ এটাই যে, পুরুষ চায় নারীও তার মতো হউক। অথচ এটা তো কখনই সম্ভব নয়। এমনটি করতে গেলে সে ভেঙ্গে যাবে। তাই এরূপ চিন্তা করা আদৌ উচিত হবে না। তবে হ্যাঁ, তার স্বভাবের বিপরীত প্রকৃতিবিরোধী বিষয়গুলোর মাঝে যদি ত্রুটি থাকে সেটা শোধরাবার কথা ভাবতে হবে। এটা পুরুষের দায়িত্বও বটে।

নারীর মাঝে পছন্দের অনেক সু-স্বভাবও আছে

এ অধ্যায়ের আরেকটি হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَفْرُكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا أٰخَرَ. (صَحِيْح مُسْلِم، كِتَابُ الرِّضَاعِ، بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ)

এ হাদীসটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বিস্ময়করও বিরল মূলনীতির বর্ণনা দিয়েছেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো ঈমানদার পুরুষ কোনো ঈমানদার নারীর প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ মোটেই করতে পারবে না। অর্থাৎ তাকে একেবারে অপদার্থ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারবে না। এটাত বলতে পারবে না যে, তার মধ্যে ভালো বলতে কিছুই নেই। কারণ তার কোনো কথা পছন্দসই না হলেও এমন কিছু তো অবশ্যই তার মধ্যে আছে যা পছন্দসই।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মূলনীতির বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন যে, দু'জন মানুষ এক সাথে এক জায়গায় থাকলে কখনও কোনো কথা

ভালো লাগে, কোনো কথা খারাপ লাগে। তাই কোনো কথা খারাপ লাগলে তাকে একেবারে পরোপুরি মন্দ বলা ঠিক হবে না। বরং তখন তার ভালো মন্দ উভয়টাকে স্মরণ করে ভাবা উচিত, তার মধ্যে ভালো গুণও তো আছে। তার এই ভালো গুণটির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত, যাতে এই ভালোর আলোয় যেন মন্দের তমসাটা কেটে যায়।

বাস্তবেই মানুষ অকৃতজ্ঞ। দু'চারটা কথা পছন্দমাফিক হলো না, একটা কিছু যেন হয়ে যায়। সেই বিষয়টি নিয়েই যেন সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার এই দোষ ওই দোষ। যেন ভালোর বাতাসও তার গায়ে লাগেনি। এই নিয়ে কত কান্নাকাটি। সর্বদা তার দোষ চর্চা করতে থাকে। তার সাথে ভালো ব্যবহারের তো প্রশ্নই উঠে না।

ভালো মন্দের মিশ্রণ সব বিষয়েই আছে

পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই, যার মধ্যে ভালো-মন্দ উভয়টার মিশ্রণ নেই। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক বস্তুর মাঝে ভালো মন্দ রেখে দিয়েছেন। নিরেট ভালো বা কল্যাণকর এবং নিরেট মন্দ বা অনিষ্টকর বলতে পৃথিবীতে কোনো কিছু নেই। সবকিছুর মাঝেই ভালো-মন্দের সংমিশ্রণ ঘটেছে। কাফের মুশরিক অথবা একজন মন্দ স্বভাবের লোক এদের মাঝেও গভীর দৃষ্টিপাত করলে কোনো না কোনো ভালো গুণ পাওয়া যাবে।

একটি ইংরেজী প্রবাদ

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কথাটা বলেছেন– প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো সম্পদ। ওটা যেখানেই পাবে কুড়িয়ে নিবে। প্রবাদটি ইংরেজী ভাষায় বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বড়ই বিজ্ঞসুলভ কথা। জনৈক মনীষী বলেছেন, বন্ধ ঘড়িও প্রতিদিন দু'বার সত্য কথা বলে। উদাহরণ স্বরূপ, একটা ঘড়ি বন্ধ হলো বারটা পাঁচ মিনিটে। বলাবাহুল্য ঘড়িটি সব সময় আর সঠিক টাইম দিবে না। বরং ভুল টাইমেই দিবে। তবে দিনে দু'বার সে অবশ্যই সঠিক টাইম নির্দেশ করবে। একবার দুপুর বারাটা পাঁচ মিনিটে আরেকবার রাত বারটা পাঁচ মিনিটে। সুতরাং বন্ধ ঘড়িও দু'বার সঠিক বলতে পারে।

ভালো কিছু সন্ধান করলে পাওয়া যায়

প্রবাদ রচয়িতা বুঝাতে চেয়েছেন, একটা জিনিস দৃশ্যত যতো মন্দ কিংবা অযথাই হোক না কেন, কেউ যদি তার মধ্যে ভালো দিকটা সন্ধান করে, তাহলে সে তা পাবেই। তাই ভালোমন্দ দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু।

কুদরতের কারখানায় কোনো মন্দ নেই

আমাদের মুহতারাম আব্বাজান প্রায়ই কবি ইকবালের একটি কবিতা পড়তেন–

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

অহেতুক অনর্থক বলতে যুগের মাঝে কিছু নেই।
মন্দ আর অমঙ্গল বলতে কুদরতের কারখানায় কিছু নেই।

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসকে স্বীয় জ্ঞান ও ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিটি বস্তুর মাঝে মঙ্গল, কল্যাণ এবং গভীর রহস্য লুকায়িত রয়েছে। কিন্তু মানুষ কেবল মন্দটাই দেখে। ভালোর প্রতি দৃষ্টি দিতে রাজী নয় সে। এই কারণে অন্তর কালো হয়ে জুলুম ও বে-ইনসাফের পথে অগ্রসর হয়।

রমণীর ভালো গুণের প্রতি লক্ষ্য কর

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ـ سورة النساء : ١٩

যদি তোমাদের (বিবাহে আবদ্ধ) নারীদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়ত তোমরা তাদের এমন কোনো বিষয়কে অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ তা'আলা অনেক কল্যাণ রেখেছেন। তাই নির্দেশ হলো, রমণীদের ভালো গুণের প্রতি তাকাও, তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসবে। অসদাচারণের পথও বন্ধ হবে তখন।

জনৈক বুযুর্গের একটি শিক্ষনীয় ঘটনা

হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) জনৈক বুযুর্গের একটি ঘটনা লিখেছেন। বুযুর্গের স্ত্রী ছিলো খুব ঝগড়াটে প্রকৃতির। ঝগড়া ঝাটিতে সে মেতে থাকতো সর্বক্ষণ। ঝগড়া-ঝাটি, গাল-মন্দ, লা'নতের মাধ্যমে মহিলাটি স্বীয় ঘরকে যেন এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত করে রেখেছিল। এ অবস্থা দেখে বুযুর্গকে কেউ বললো, বকা-ঝকা, ঝগড়া-ফ্যাসাদের এ মানবীকে আপনি লালন করছেন কেন? তাকে তালাক দিয়ে কিস্সা খতম করে দিলেই তো হয়। উত্তরে বুযুর্গ বললেন– তালাক দেয়া তো খুবই সহজ। ইচ্ছা করলেই দিতে পারি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হলো, মহিলাটির মাঝে বহু দোষ আছে। তবে তার মাঝে একটি গুণও আছে। যে গুণাটির কারণে তাকে আমি কখনো ছাড়বোনা। তালাকও দিবো না। গুণটি হলো, কৃতজ্ঞতা, সে এমন কৃতজ্ঞ যে, কথার কথা যদি আমি কোনো কারণে গ্রেফতার হয়ে পঞ্চাশ বছরও জেলে থাকি, তাহলে আমার বিশ্বাস, তাকে আমি যেখানে রেখে যাবো সেখানে বসেই আমার জন্য অপেক্ষা করবে। অন্য কারো প্রতি দৃষ্টিপাতও করবে না সে। আর এই কৃতজ্ঞতা এমন একটি গুণ যার কোনো মূল্য হতে পারে না।

হযরত মির্যা জানে জাঁনা (রহ.)-এর নাযুক তবিয়ত

হযরত মির্যা জানে জাঁনা (রহ.) এর নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের আল্লাহর ওয়ালী। স্বভাব ছিলো তাঁর খুবই নাযুক, খুবই উন্নত। তাঁর দরবারে কেউ কল্সীর মুখে গ্লাস বাঁকা করে রাখলে যথারীতি তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যেতো। স্বভাব যার এতটা পরীশীলিত নাযুক, শয্যা বস্ত্রের সামান্য এলোমেলোয় যার মাথা ব্যথা সৃষ্টি হয়ে যেতো, তাঁর স্ত্রীটি ছিলো বেজায় বদমেজাজী। অসাদাচরণ, নিয়ন্ত্রণহীন বাক-বিতণ্ডা, বকা-ঝকা। ইত্যাদি অমার্জিত কিছু একটা নিয়ে সে মেতে থাকতো সারাক্ষণ।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদেরকে অভিনব পদ্ধতিতে পরীক্ষা করেন। যেন তাঁরা পরীক্ষায় সফলতা লাভ করে পৌছে যেতে পারেন মর্যাদার শীর্ষ মাকামে। মীর্যা জানে জাঁনা (রহ.)-এর জীবনেও ছিলো এই একই পরীক্ষা। এমন একজন বদস্বভাবের মহিলাকে নিয়েই পুরো জীবনটা তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন– আল্লাহ তা'আলা হয়তো বা এ উসিলায় আমার গুনাহ গুলো মাফ করে দিবেন।

আমাদের সমাজের মেয়েরা দুনিয়ার হুর

হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলতেন– আমাদের ভারতবর্ষের সমাজের মেয়েরা তো আমাদের পারিবারিক জীবনের জন্য হুর। কারণ হিসেবে তিনি বলতেন– আমাদের সমাজের মেয়েদের মাঝে কৃতজ্ঞতার গুণ আছে। তবে পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণহীন সভ্যতার পাদুর্ভাবের পর থেকে ধীরে ধীরে আমাদের দেশীয় সভ্যতা থেকে এসব গুণ মিটে যেতে শুরু করেছে। এরপরেও এদেশের মেয়েদের মধ্যে স্বামী ভক্তির অনুপম বৈশিষ্ট্য এখনও আছে। সংসারে যতো কিছুই ঘটুক স্বামীর জন্যে তারা প্রয়োজনে জীবনও দিতে প্রস্তুত। এবং স্বামীই হয় তাদের সকল আশা ভরসার কেন্দ্রবিন্দু। একমাত্র স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পরপুরুষের প্রতি তারা দৃষ্টি তুলে তাকায়ও না।

যাক মূলকথা হলো, এই সমস্ত বুযুর্গানেদ্বীন বাস্তবেই এই হাদীসটির উপর আমাল করে দেখিয়েছেন–

اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ۔

নারীর কোনো একটি বিষয় অপছন্দ হলে অন্য গুণটি পছন্দও হতে পারে। সেই গুণটির প্রতিই তাকাও। পছন্দের গুণটির প্রতি লক্ষ্য করে তার সাথে সদাচরণ করো। আমাদের সমাজের সকল নষ্টের মূল এটাই। আমারা কেবল মন্দটাই জপি। ভালো গুণের প্রতি তাকানোরও প্রয়োজনবোধ করি না।

স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা নীচু স্বভাবের পরিচয়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔ يَخْطُبُ ..... ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيْهِنَّ، فَقَالَ الْعَبْدُ اَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ اٰخِرِ يَوْمِهِ ۔ (صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ، كِتَابُ النِّكَاحِ، باب مايكره من ضرب النساء رقم الحديث ۔۵۲۰۴)

একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দিচ্ছিলেন। দীর্ঘ ভাষণ। সেই ভাষণের এক পর্যায়ে নারীদের কথাও বললেন যে, তোমাদের মধ্যে

কেউ কেউ স্ত্রীকে গোলামের মত মারধোর করে। অথচ সেই স্ত্রীর সাথে দিনের শেষভাগে কাটায়, শয্যা গ্রহণ করে, মানবিক চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ এ কেমন কথা। নিজের জীবনসঙ্গিনীকে এভাবে গোলামের মত মারধোর করে আবার সেই তার সাথে একাই বিছানায় রাত কাটায়। এটা তো নিশ্চয়ই নীচু স্বভাবের পরিচয়। আত্মমর্যাদাবোধের সাথে সাংঘর্ষিক।

স্ত্রীকে শোধরাবার তিনটি পর্যায়

আগেই উল্লেখ করেছি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কীয় খুঁটিনাটি বিষয় ও মাসআলা অত্যন্ত যত্ন সহকারে কুরআন শরীফ বর্ণনা করেছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক ঝগড়া-কলহ দেখা দেয়া স্বাভাবিক। তবে নিরসনকল্পে প্রথম পর্যায়ে ইসলামের নির্দেশনা হলো, স্ত্রীর কোনো বিষয় স্বামীর নিকট খারাপ লাগলে দেখতে হবে ভালোলাগার মতো অন্য কোনো গুণ তার মধ্যে আছে কি না। এরপরেও যদি স্বামী মনে করে যে, স্ত্রীর মাঝে বাস্তবিকই এমন কিছু বদগুণ আছে যেগুলো বরদাশত করার মতো নয়, বরং সংশোধন করা অপরিহার্য, তখন স্বামীর অধিকার আছে স্ত্রীকে সংশোধন করার। তবে সে সংশোধনের পদ্ধতি কি হবে, কুরআনে কারীম সেই পদ্ধতির কথাই তুলে ধরেছে এভাবে–

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوْهُنَّ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ ۳۴)

স্ত্রীদের মধ্যে যারা অবাধ্য হবে বলে আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও। তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে মারধোর কর।

অর্থাৎ, কোনো স্ত্রীকে অবাধ্য হতে দেখলে প্রথমে তাকে নরমভাবে মার্জিত ভাষায় ভালোবাসা ও দরদপূর্ণ কথা দিয়ে বোঝাবে। এটা সংশোধনের প্রথম পর্যায়। এতেই যদি বোধদয় হয়, তবে বিষয়টি এখানেই মিটে গেল। আর সামনে অগ্রসর হবার প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে যদি ওয়াজ নসীহতে, বুঝিয়ে শুনিয়ে কাজ না হয়, তখন সংশোধনের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্ত্রীকে সতর্ক করার জন্য তাকে পৃথক বিছানায় শুইবে। স্ত্রীর যদি বিবেক থাকে, মানসিক সাধারণ সুস্থতাও থাকে তাহলে এতে তার টনক নড়বে বিবাদটিও এখানেই শেষ হয়ে যাবে। (বিছানা পৃথকিকরণ এর বিস্তারিত বিবরণ ভিন্ন আরেকটি হাদীসে সামনে আসবে।)

স্ত্রীকে মারধোর করার সীমারেখা

স্ত্রী শোধরাবার পন্থাটি ভদ্রোচিত শাস্তির দ্বিতীয় পন্থাটিও যদি কাজে না আসে, তাহলে সর্বশেষ তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আর তা হলো তাকে মারধোর করা। কিন্তু এই মারধোর কী ধরনের হবে? কতটুকু মারধোর করা যাবে? এ সম্পর্কে বিদায় হজ্জের ভাষণে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতকে সর্বশেষ নসীহতকালে বলেন-

وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ـ

নারীদেরকে এমনভাবে মারবে যেন শরীরে সে মারধোরের প্রতিক্রিয়া কিংবা জখম সৃষ্টি না হয়।

সর্বপ্রথম তো মারের পর্যায়ে আসাটাই উচিত নয়, অন্য কোনো উপায়ে যদি তাকে শোধরানো সম্ভব না হয়, তখন একেবারে শেষ আশ্রয় হিসাবে মারধোরের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এরও মাঝে আবার বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ মারের উদ্দেশ্য হবে তাকে সংশোধন করা, তাকে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য হতে পারবে না। তাই এমন তীব্র মারধোর করা উচিত হবে না যাতে শরীরে দাগ বসে পড়ে।

স্ত্রীদের সাথে প্রিয়নবী (সা.)-এর আচরণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন তখনও তাঁর ঘরে নয় জন স্ত্রী ছিলেন তাঁরাও তো মানুষ ছিলেন। আকাশ থেকে নেমে আসা কোনো ফেরেশতা ছিলেন না। তাঁরা নিজেদের সমাজের মানুষই ছিলেন। সতীনদের মাঝে যেসব ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক, সেসব ছোট-খাটো দু'একটা ঘটনা তাদের জীবনেও ঘটেছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ছোট খাট মতের আমল হয়ে থাকে তা তাঁদের ক্ষেত্রেও হয়েছে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবনে একবারের জন্যও কোনো স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেন নি। বরং ঘরে প্রবেশকালে তাঁর পবিত্র চেহারায় মুচকি হাসির স্নিগ্ধতা লেগেই থাকতো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত

সুতরাং স্ত্রীর গায়ে হাত না উঠানো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত। মারধোরের অনুমতি দেয়া হয়েছে একান্ত অপরগতায়। মারধোর করা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত নয়। সুন্নাত হচ্ছে তা-ই

যা হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন যে, ঘরে প্রবেশকালে স্নিগ্ধ হাসি তাঁর চেহারায় ফুটে থাকতো।

ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) এর কারমাত

আমাদের শাইখ হযতর ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.)। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। তিনি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে বলতেন- 'আমি বিয়ে করেছি পঞ্চান্ন বছর হলো। আল্লাহর শোকর, এ পঞ্চান্ন বছরে আমার স্ত্রীর সাথে সুর বদল করে ধমকের স্বরে কথা বলিনি।

আমি বলে থাকি, মানুষ সাতার কাটাকে আর বাতাসে উড়ে বেড়ানোকে কারামত মনে করে। প্রকৃত কারামত তো এটা। পঞ্চান্ন বছর তাঁর স্ত্রীর সাথে কেটেছে, আর এর মাঝে কোনো খুটিনাটি বিবাদ হওয়া স্বাভাবিক। তবুও কিন্তু তিনি বলেন, আমি স্বর বদল করে রাগতস্বরে কথা বলিনি। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ডাক্তার সাহেবের সম্মানিতা স্ত্রী বলেন, ডাক্তার সাহেব সারা জীবনে একবারও আমাকে বলেননি আমাকে পানি পান করাও। অর্থাৎ, তিনি আমার সাথে কখনও নির্দেশের স্বরে কথা বলেননি; বরং আমি নিজে আগ্রহ করে নিজের সৌভাগ্য মনে করে তাঁর সেবা-যত্ন করতাম। ভক্তির সাথে তাঁর কাম কাজ করতাম।

মাখলুকের খেদমত করা ব্যতীত তরীকত লাভ হয় না

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) প্রায়ই বলতেন- নিজের সম্পর্কে আমার ধারণা বরং বিশ্বাস এবং আমি চাই এ ধারণা ও বিশ্বাস নিয়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। আর তাহলো, আমি একজন খাদেম-সেবক। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাখলুকের খাদেম হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যতো লোকের সাথে আমার সম্পর্ক আছে, আমি তাদের সকলেরই খাদেম। তাদের খেদমতের যিম্মাদার আমি। আল্লাহ আমাকে মাখদুম তথা সেবিত বানিয়ে দুনিয়াতে পাঠাননি, বরং আমি সকলেরই খাদেম। আমি আমার স্ত্রীর খাদেম, ছেলে-সন্তানের খাদেম, মুরীদ-ভক্তদের খাদেম এবং স্বজনদের খাদেম, বন্ধু-বান্ধব সকলের খাদেম। কারণ বান্দার জন্য খাদেম হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। খাদেম হওয়ার মর্যাদা অনেক বেশী। তাই আমি খাদেম। কবি বলেন-

زتسبیح وسجادہ و دلق نیست

طریقت بجز خدمت خلق نیست

অর্থাৎ, তাসবীহ জ়ায়নামায বা পীরালী আসন আর সূফিগিরীর ভিতর কিছুই নেই। আল্লাহর সৃষ্টির খেদমত ও সেবা করা ছাড়া কোনো তরীকত নেই।

তরীকত মানে শরীয়তের আলোকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। কিন্তু প্রকৃত সফলতা খেদমতে খালক্ব তথা সৃষ্টির সেবা ছাড়া অর্জিত হয় না। এজন্য হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) বলেন– আমার বুঝ মতে আমি যখন একজন খাদেমমাত্র; মাখদুম নই। এমতাবস্থায় আমি কি করে অন্যের উপর হুকুম চালাবো? কিভাবে নির্দেশ দিবো একাজটি করো?

এ মহান আধ্যাত্মিক রাহবারের পুরো জীবনটা এমনভাবে কেটেছে, যখনই কোনো প্রয়োজন দেখা দিতো নিজ হাতে করে ফেলতেন। কাউকে কোনো কাজের হুকুম দিতেন না। একেই বলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের প্রকৃত অনুসরণ। আমরা বাহ্যত অনেক বিষয়ে সুন্নাতের আনুসরণ করি। কিন্তু আচার-আচরণ, লেন দেন, চলা-ফেরার ক্ষেত্রেও সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে।

দাবিই যথেষ্ট নয়

ইত্তেবায়ে সুন্নাত বা সুন্নাতের অনুসরণ একটি বিস্তৃত ও বহু বড় বিষয়। ইত্তেবায়ে সুন্নাত মানেই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। এরদ্বারা জীবন হয়ে উঠে নির্ভরযোগ্য। ইত্তেবায়ে সুন্নাত শুধুমাত্র দাবি করার বিষয় নয়। দাবি করলেই এটা অর্জিত হয় না।

وَكُلٌّ يَدَّعِيْ حُبًّا لِلَيْلٰى * وَلَيْلٰى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ

সবাই বলে লাইলী আমার; লাইলী বলে, নইকো কারো

অর্থাৎ, সবাই তো লাইলীর ভালোবাসার দাবি করে। কিন্তু লাইলী কতজনকে হৃদয়ের মানুষ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে? তদ্রূপ ইত্তেবায়ে সুন্নাত তথা সুন্নাতের অনুসরণের ব্যাপারটিও এমন। এটি শুধু দাবি করলেই হয়ে যায়না, বরং আমল করেও দেখাতে হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত আখলাক চরিত্রে, কাজে-কর্মে সর্ব বিষয়ে বাস্তবিকই আমল করে দেখাতে হয়। এসব ক্ষেত্রে সুন্নাতের বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করার নামই ইত্তিবায়ে সুন্নাত। আর যার সাথে ন্যূনতম সম্পর্কও আছে, তাকে কথায়, কাজে আচার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র কষ্ট না দেয়াই তো প্রিয় নবীজীর সুন্নাত।

সারকথা হলো, কুরআন শরীফ স্ত্রীকে সংশোধন করার তৃতীয় যে পন্থাটি নির্দেশ করেছে তার ব্যাখ্যা করেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আমলের মাধ্যমে। তিনি আজীবন কোনো স্ত্রীর গায়ে হাত উঠাননি। অথচ তাঁর দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীদের সাথে কোনো মনোমালিন্য হয়নি, এমন নয়। উপরন্তু যারা স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলেন তাদেরকে নীচু স্বভাবের লোক বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন–

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَأَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا ! وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ، إِلَّا أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ. (جَامِعُ التِّرْمِذِيْ، كِتَابُ التَّفْسِيْرِ، باب ومن سورة التوبة، رقم الحديث ـ ٣٠٨٧)

বিদায় হজ্জের ভাষণ

আলোচ্য হাদীসটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিদায় হজ্জের ভাষণ থেকে চয়নকৃত। বিদায় হজ্জে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের শেষ হজ্জ, সে হজ্জে তিনি ভাব গম্ভীরপূর্ণ ভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণে তিনি সম্পষ্টভাষায় বলেছিলেন– আগামী বছর হয়তো তোমাদেরকে এখানে নাও পেতে পারি। এ কারণে ভাষণের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো তিনি আলোচনা করেছেন। যেসব বিষয়ে উম্মতের পদচ্যুতি হওয়ার আশংকা ছিলো সেগুলো গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষণে। যেন ভাষণটি কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী ও জীবন বিধান। উম্মতের পদস্খলন ঘটার সমূহ পথকে ভাষণটির মাধ্যমে বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সুদীর্ঘ ভাষণ। যার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে বারবার। উল্লিখিত হাদীসটিও সেই সুদীর্ঘ ভাষণের কিদাংশ। এ অংশে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর স্ত্রীদের অধিকার

সম্পর্কে জানা ও তার প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে বিশেষভাবে। এবার আপনি বিষয়টির গুরুত্বও তাগিদ সহজেই অনুমান করুন। কারণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন, এটাই তার সর্বশেষ ভাষণ। এও জানতেন যে, আগামীতে এখানে তিনি এভাবে সবাইকে সামনে নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন না। সুতরাং পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথাগুলো বলার জন্য নির্বাচন করেছেন, যে কথাগুলোর গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করেছেন সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উম্মতের জন্য জরুরী। আর এসব বিষয়ের অন্যতম হলো স্বামী-স্ত্রীর অধিকারসমূহ।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কের গুরুত্ব

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের যে কতটটুকু গুরুত্ব তা আলোচ্য ভাষণ থেকে প্রতীয়মান হয়। শরীয়তের ধারক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এ সত্যটি উপলব্ধি করেছেন। কারণ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অসাদচরণের প্রেক্ষিতে যদি একে অন্য থেকে প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিযোগিতায় কোমর বেঁধে নেমে যায়, তাহলে এর প্রতিক্রিয়া শুধু তাদের উভয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা উভয়ের বংশ পর্যন্ত গড়ায়। ছেলে মেয়েরাও প্রভাবিত হয়। ফলে ছেলে মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র দূষিত হয়ে যায়। আর যেহেতু সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তিই হলো বংশ ও পরিবার, সেহেতু বংশ ও পরিবারের এ বিষক্রিয়া সমাজকেও বিষিয়ে তোলে। যে কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে তাগিদ দিয়েছেন গুরুত্বসহকারে।

নারীরা তোমাদের নিকট আবদ্ধ

সাহবী হযরত আমর ইবনুল আহওয়াস (রা.) বলেন– এই ভাষণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও প্রশংসা করেন এবং ওয়াজ নসীহত করেন। অতঃপর ইরশাদ করেন– জেনে রেখো! আমি তোমাদেরকে নসীহত করছি, তোমরা নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। তোমরা আমার নসীহত গ্রহণ করো। পূর্বেকার হাদীসটিতেও হুবহু কথাটি বলা হয়েছিলো। এর পরবর্তী বাক্যে তিনি ইরশাদ করেন–

فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ.

নিশ্চয়ই নারীরা তোমাদের নিকট বন্দী জীবন কাটায়।

এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি কথা বললেন, কোনো ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করে তাহলে সে আর নারীদের সাথে অশুভ আচরণ করবে না।

এক বোকা মেয়ে থেকে শিক্ষা নাও

হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলতেন–এক বোকা, অশিক্ষিত মেয়ে থেকে শিক্ষা নাও। একটি বোকা মেয়ে দুটো কথা উচ্চারণ করে একজন পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। একজন বলে, আমি তোমাকে বিয়ে করলাম। অন্যজন বলে, আমি কবুল করলাম। এই দুটো কথাকে মেয়েটা এতটুকু সম্মান করে যে, যার জন্য সে মাতা-পিতা, ভাই-বোন বংশ-পরিবারসহ সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে একমাত্র স্বামীর জন্যে হয়ে যায়। গৃহবন্দী হয়ে যায় স্বীয় স্বামীর নিকট। ছোট্ট দু'টি কথার মূল্যায়ন তার কাছে এতো বেশী ! হযরত থানভী (রহ.) বলেন– একটি বোকা মেয়ের দুটোমাত্র কথার প্রতি এতটা গভীর আস্থা, শ্রদ্ধাও হৃদ্যতা যে, এখন সে এ দুটো কথার সম্মান রক্ষার্থে সবকিছু পরিত্যাগ করে স্বামীর জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়। অথচ তোমরা তো এতটুকুও পারো না। তোমরাও তো দুটো কথা এ ভাবে উচ্চারণ করেছো। কালিমায়ে তাইয়িবা–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ.

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, কথাটুকু উচ্চারণ করেছো। অথচ তোমরা যার জন্য এ দুটো কথা পাঠ করলে তার জন্যে কুরবান হতে পারোনা। এই কালিমার প্রতি বোকা মেয়েটির সমান আস্থা ও শ্রদ্ধাশীল হতে পারলে না। মেয়েটি তো দুটো কথার ইজ্জত রক্ষা করলো, তার সবকিছু স্বামীর জন্য নিবেদিত করে, কিন্তু তোমরা তো পারলে না আল্লাহর জন্য নিবেদতি হতে।

নারীদের অসংখ্য কুরবানী তোমাদের জন্য

দেখুন, নারীরা পুরুষদের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করে! অথচ বিধান যদি এর উল্টো হতো, পুরুষদেরকে যদি বলা হতো, বিয়ের পর তোমরা তোমাদের মাতা পিতা ছেড়ে, বংশ পরিবার সর্বস্বঃ পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে স্ত্রীর বাড়িতে। একটু ভাবুন তো, তখন তা কতো কঠিন হতো! এক নতুন পরিবেশ, অপরিচিত ঘর, অজানা অচেনা মানুষদের সাথে সংসার পাতার উদ্দেশ্যে নারী স্বামীর

গৃহাবদ্ধ হয়ে যায়। তাই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–এর পরেও কি তোমরা নারীর এ কুরবানীর মূল্যায়ন করবে না? তাদের সাথে সদ্ব্যবহার, তাদের উৎসর্গের সঠিক মর্যাদাদান তোমাদের জন্যে জরুরী।

এছাড়া তাদের উপর তোমাদের অন্য কোনো দাবি নেই

তারপর আরো কঠিন বাণী উচ্চারণ করেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যে বাণীটির ব্যাখ্যা পুরুষ সমাজ শুনতে রাজী নয়, ভ্রূকুঞ্চিত করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। বাণীটি হলো–

لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَالِكَ

তারা (নারীরা) তোমাদের ঘরে থাকবে, এছাড়া তাদের উপর তোমাদের শরীয়াত সম্মত অধিকার নেই।

রান্না করা নারীদের শরয়ী দায়িত্ব নয়

এরই আলোকে ইসলামী ফিকাহবিদগণ একটি নাজুক মাসআলা বলেছেন। যে মাসআলাটি বললে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মাসআলাটি হলো, ঘরে রান্নাবান্না করা নারীদের জন্যে শরয়ী কর্তব্য নয়। অর্থাৎ তাদেরকে রান্নাবান্না করতেই হবে, এটা ফরয, এমন কোনো নির্দেশ শরীয়ত দেয় নি। এমনকি ফুকাহায়েকেরাম বলেছেন–মেয়েদের মধ্যে দু'টি শ্রেণী আছে। যথা–

এক. যারা পারিবারিকভাবে বাবার সংসারে ঘরকন্নার কাজে অভ্যস্ত।

দুই. যারা পারিবারিকভাবে বাবার সংসারে ঘরকন্নার কাজে অভ্যস্ত নয়। বরং চাকর নওকরের সাহায্যে তার গৃহস্থলী কাজগুলো করায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েদের সম্পর্কে কথা হলো, এরা স্বামীর ঘরে আসার পর খানা পাকানো তাদের দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে বিচারের কাঠগড়ায়, চরিত্রের মাপকাঠিতে তথা যে কোনো অবস্থাতে এটা তাদের কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে না। বরং স্ত্রী স্বামীকে একথা বলার অধিকার রাখে যে, আমার ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। রান্নাবান্না করার দায়িত্ব আমার নয়। কাজেই প্রস্তুতকৃত খাবার আমাকে দিতে হবে। ফিকাহবিদগণ লিখেছেন, স্ত্রী যদি এরূপ দাবি করে তাহলে স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে প্রস্তুতকৃত খাবার এনে দেয়া। স্বামী এ ব্যাপারে বাধ্য থাকবেন। স্বামী রান্নাবান্নার জন্যে স্ত্রীকে চাপ প্রয়োগ করতে পারবেন না। তাই তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন– لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَالِكَ

অর্থাৎ, স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের অধিকার হলো, তারা তোমাদের গৃহে অবস্থান করবে। এবং তারা তোমাদের অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারবে না। এছাড়া শরীয়ত নির্দেশিত কোনো অধিকার তোমাদের নেই।

আর মেয়েটি যদি হয় প্রথম শ্রেণীর। অর্থাৎ মেয়েটি পারিবারিকভাবে বাবার সংসারে রান্নাবান্নার কাজে অভ্যস্ত ছিল। তাহলে রান্নাবান্না করা আইনগতভাবে তার কর্তব্য নয়। তবে হ্যাঁ, ধার্মিকতা, দ্বীনদারী এবং মানবিক দৃষ্টিকোণে রান্নাবান্না করা তার উপর অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে তাকে রান্নাবান্না করার চাপ দেয়া যাবে না। তবে তার চারিত্রিক দাবি এটাই যে, সে নিজ হাতে নিজের খাবার রান্না করবে। এক্ষেত্রে স্বামীর দায়িত্ব হলো, রান্নাবান্নার যাবতীয় সরঞ্জামাদি জোগাড় করে দেয়া।

অবশিষ্ট থাকলো, স্বামী ও সন্তানদের খানা পাকানোর ব্যাপারটি। এটাও কিন্তু স্ত্রীর কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হবে না। আবার স্বামীর নিকট এ দাবিও করতে পারবে না যে, আমাকে প্রস্তুতকৃত বাজারের খাবার এনে দিতে হবে। স্ত্রী খানা পাকাতে অস্বীকৃতি জানালে আইনের আশ্রয় নিয়ে তাকে বাধ্য করে রান্না করানোও যাবে না। সারকথা এই সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের বিশদ আলোচনা রয়েছে।

শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা বউ এর কর্তব্য নয়

আরেকটি কথা জেনে নিন, যার প্রতি আমাদের অবহেলা যথেষ্ট হয়। আর তা হলো স্বামীর জন্যে এবং সন্তানদের জন্যে যখন রান্নাবান্না করা নারীর কর্তব্য নয়, তখন স্বামীর পিতা মাতা, ভাই বোনের জন্যে রান্নাবান্না করা তো তার দায়িত্বের আওতায় পড়ার প্রশ্নই উঠে না। আমাদের সমাজে একটা প্রথা চালু আছে, ছেলের বউ ঘরে তোলার পর ছেলের মা-বাবা মনে করেন, ছেলের হক তো পরে, সর্ব প্রথম হলো আমাদের হক। তাই ছেলের খেদমত করুক বা না করুক, পহেলা আমাদের খেদমত করতেই হবে। পরিণামে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ, দেবর ও পরিবারের অন্যান্যদের সাথে বউয়ের ঝগড়া শুরু হয়। সকলেরই দাবি, আমাদের খেদমত করুক। এর পরিণতি কত মারাত্মক হয়, তা প্রতিনিয়ত আমরা প্রত্যক্ষ করি।

শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করা ভাগ্যবতীদের কাজ

আরো জেনে নিন, ছেলের কর্তব্য হলো মা-বাবার সেবা যত্ন করা। তবে হ্যাঁ! ছেলের বউ যদি শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করে, যদি তাদের সেবা যত্ন সানন্দে

করে, তাহলে সেটা তার জন্য এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এর বিনিময়ে সে অবশ্যই সাওয়াব পাবে। তাই বলে স্বামী তার স্ত্রীকে তার মাতা-পিতার খেদমত করতে বাধ্য করতে পারবে না। এটা স্ত্রীর ইচ্ছা খুশীর ব্যাপার। তদ্রূপ শ্বশুর শাশুড়ীও ছেলের বউকে খেদমত করার জন্যে চাপ প্রয়োগ করতে পারবেন না। তবে পরিবারের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করে, নিজের সৌভাগ্যের বিষয় ও সাওয়াব লাভের আশা করে শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা ছেলের বউয়ের নৈতিক কর্তব্য। তার কাছে এটা এক প্রত্যাশাও বটে।

পুত্রবধুর খেদমতের মূল্যায়ন করতে হবে

পুত্রবধূ নিজের সৌভাগ্য ও সাওয়াব মনে করে শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করবে ঠিক, তবে এক্ষেত্রে শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীকে মনে রাখতে হবে যে, বউ তাদের সেবা যত্ন করছে, এটা তার চারিত্রিক মাধুর্যতা ও মানবিক আচরণের কারণে। অন্যথায় এটা বউয়ের জন্য শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব নয়। ফরয ওয়াজিব নয়। প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয় না বোঝার কারণে বর্তমান সমাজের পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে। শাশুড়ী, ননদ, দেবরদের বউদের সাথে ঝগড়াঝাটিতে ঘরের পর ঘর বিরান হচ্ছে। এসব কিছুর একমাত্র কারণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথ থেকে ছিটকে পড়া। আমাদের হৃদয়ে আজ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শের মর্যাদা নেই।

একটি অদ্ভুত ঘটনা

অদ্ভুত এ ঘটনাটি শুনিয়েছেন আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.)। তিনি বলেন– আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি এবং তার স্ত্রী মাঝে মধ্যে আমার মজলিসে আসা যাওয়া করতেন। তারা আমার সাথে কিছুটা ইসলাহী সম্পর্কও গড়ে তুলেছিলেন।

একবার উভয় মিলে তারা আমাকে দাওয়াত করলেন। দাওয়াতের প্রেক্ষিতে আমি তাদের বাড়িতে গেলাম, খাওয়া-দাওয়া করলাম। বেশ সুস্বাদু খাবার খেলাম। হযরত ডাক্তার সাহেব (রহ.) এর অভ্যাস ছিলো, কোথাও দাওয়াত খেতে গেলে খাবারের পর খাবার প্রস্তুতকারীর প্রশংসা করতেন। হযরতের যখন খাওয়া দাওয়া শেষ হলো, তখন সেই মহিলা পর্দার আড়াল থেকে হযরতকে সালাম করলেন। সালামের উত্তর দিয়ে হযরত নিজ অভ্যাসবশতঃ বলতে লাগলেন– খুব সুস্বাদু খাবার হয়েছে। আল্লাহর শোকর, রুচিমত খেয়েছি। হযরত

বলেন– মহিলাটি আমার এই কথা শোনার পর পর্দার আড়াল থেকে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। কান্নার আওয়াজ শুনে আমিও ঘাবড়ে গেলাম, না জানি আমার কোন কথায় সে মনে ব্যথা পেয়েছে, যে কারণে কাঁদছে। অবশেষ কান্না থামিয়ে মহিলাটি বলতে লাগলো, আজ চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার এই স্বামীর ঘর করছি। চল্লিশ বছরে কখনো একটি বারের জন্যও বলেননি; আজ সুন্দর, সুস্বাদু খাবার পাকিয়েছ। তাই আজ প্রথম যখন এমন কথা শুনলাম, কান্না আর থামিয়ে রাখতে পারিনি।

খাবারের প্রশংসা করার যোগ্যতা এ জাতীয় লোকের নেই

এই ঘটনাটি প্রায়ই হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) আমাদেরকে শুনাতেন এবং বলতেন– যে ব্যক্তির মনে এই অনুভূতিটুকুও নেই যে, খাবার তৈরী করার জিম্মাদার তার স্ত্রী নয় বরং খাবার তৈরী করে দিয়ে তার স্ত্রী উত্তম চরিত্র ও সদাচরণের পরিচয় দিচ্ছে সেই ব্যক্তি কখনো তার স্ত্রীর প্রশংসা করতে পারবে না। যেহেতু এমন ব্যক্তি স্ত্রীকে মনে করে সেবিকা বা চাকরাণী। সুতরাং খানা ভালো পাকালেই বা কী হলো ! কিন্তু যার কাছে এই অনুভূতি আছে যে, তার স্ত্রী দায়িত্বের আওয়াতায় পড়ে না এমন কাজ করছে। খাবার পাকিয়ে দিচ্ছে। এটা তার প্রতি অনুগ্রহ করছে, তাহলে সে ব্যক্তি স্ত্রীর রান্নাবান্নার প্রশংসা না করে পারবে না।

স্বামী তার মাতা-পিতার সেবা নিজে করবে

প্রশ্ন হতে পারে, মা বাবা যদি বৃদ্ধ হয়ে পড়েন কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তারা তো অন্যের খেদমত নির্ভর হয়ে পড়বেন অন্যের খেদমত ছাড়া তাদের জীবন কাটানো অসম্ভব। আর ঘরে শুধু ছেলে ও ছেলের বউ। এই অবস্থায় কি করা হবে?

এমতাবস্থায় শরীয়তের মাসআলা হলো, স্বামীর মা-বাবার খেদমত করা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। হ্যাঁ! যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সৌভাগ্য ভেবে সাওয়াব লাভের আশায় স্ত্রী তার শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করে, তাহলে সে প্রচুর সাওয়াব পাবে। স্বামীকে কিন্তু তখন বুঝতে হবে যে, তার মা-বাবার খেদমত করা স্ত্রীর দায়িত্ব নয় বরং দায়িত্ব তো তার নিজের। এখন চাই সে নিজে করুক কিংবা চাকর বাকরের মাধ্যমে করাক, এটা তার ব্যাপার। আর যদি স্ত্রী করে তাহলে সেই স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

স্ত্রী বাইরে যেতে হলে স্বামীর অনুমতি নেয়া প্রয়োজন

এ ব্যাপারে শরীয়তের আরেকটি বিধান জেনে নিন! যে বিধানটি জানা না থাকলে ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যাবে। কারণ মানুষ শুধু একপক্ষের কথা শুনে অবৈধ সুযোগের অন্বেষায় থাকে। যেমন একটু আগে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম, খাবার পাকানো নারীর দায়িত্ব নয়। সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– নারীরা তোমাদের ঘরে বন্দী। অর্থাৎ তোমাদের অনুমতি ছাড়া তারা কোথাও যেতে পারবে না। ফিকাহবিদগণ যেমনিভাবে খাবার তৈরী করার মাসআলা লিপিবদ্ধ করছেন তেমনিভাবে এও লিখেছেন। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে দেয়, তুমি গৃহের বাইরে যেতে পারবে না। তোমার আত্মীয় স্বজনদের সাথেও দেখা করতে যেতে পারবে না তোমার মা-বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ারও অনুমতি নেই, তাহলে স্ত্রী কোনো অবস্থাতেই স্বামীর কথা অমান্য করতে পারবে না। তখন তার জন্য সাক্ষাৎ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বাইরে যাওয়া জায়েয হবে না। তবে হ্যাঁ যদি স্ত্রীর মা-বাবা মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে তখন কিন্তু স্বামী সাক্ষাতে বাধা দিতে পারবেনা। কিন্তু ফিকাহাবিদগণ এক্ষেত্রেও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তারা বলেছেন, মা-বাবা সপ্তাহে একবার আসতে পারবে এবং সাক্ষাত করেই চলে যাবে। এটা স্ত্রীর অধিকার। স্বামী এতে বাধা দিতে পারবে না। তবুও স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে যেতে পারবে না।

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা উভয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান দান করেছেন। স্বামীকে বলা হয়েছে, খাবার তৈরী করা স্ত্রীর কর্তব্য নয়। আর স্ত্রীকে বলা হয়েছে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে পারবে না।

উভয় মিলে জীবনগাড়ী পরিচালনা করবে

এসব তো হলো আইনের কথা। তবে শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও সচ্চরিত্রের কথা কিন্তু ভিন্ন। সচ্চরিত্রের কথা হলো, উভয় উভয়কে রাজী-খুশী রাখতে সচেষ্ট ও আন্তরিক হওয়া। হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.) নিজেদের মাঝে পারিবারিক কাজ কর্ম বণ্টন করে নিয়েছিলেন। ঘরকন্নার কাজ দেখা শুনার দায়িত্ব ছিল ফাতেমা (রা.) এর জিম্মায়। আর বাইরের কাজ দেখাশুনা করার দায়িত্বে ছিলেন হযরত আলী। আর এটাই মূলতঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত। আমাদেরকে এভাবেই আমল করা উচিত। সব সময় আইনের মার প্যাচের মধ্যে পড়ে থাকা উচিত নয়। উচিত, স্বামী স্ত্রীর সাথে স্ত্রী

স্বামীর সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করা। স্বামী বাইরের কাজ করবে, স্ত্রী করবে ঘরের কাজ, এটাই মানুষের প্রাকৃতিক দাবি ও পদ্ধতি। এভাবেই তারা তাদের জীবন নামক গাড়ীটি পরিচালনা করবে।

যদি স্ত্রী নির্লজ্জ কাণ্ড ঘটায়

إِلَّا أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غير مبرح فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ـ

হ্যাঁ! এ সব নারী ঘরের মধ্যে কোনো নির্লজ্জ কাণ্ড ঘটায়, যে নির্লজ্জ কাণ্ড কোনোভাবেই বরদাশত করার মতো নয়। তাহলে প্রথমে তাদেরকে কুরআন শরীফের নির্দেশিত পন্থায় বোঝাতে হবে। তাতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে তাদের শয্যা পৃথক করে দাও। তবুও যদি টনক না নড়ে, নিরুপায় হয়ে তখন তাদেরকে মারধোর করার অনুমতি আছে। তবে সে মারধোর যেন সীমাতিরিক্ত না হয়। অতঃপর যদি আনুগত্যে চলে আসে, অন্যায় অপকর্ম পরিত্যাগ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ ও পন্থা খুঁজে নেয়া উচিত হবে না। অর্থাৎ এর অতিরিক্ত অন্য কোনো কষ্ট দেয়ার অনুমতি নেই। বলা হচ্ছে–

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ـ

সাবধান! নারীদের তোমাদের উপর এই অধিকার রয়েছে, তোমরা তাদের সাথে মার্জিত আচরণ করবে। খাবার-দাবার পোশাক-পরিচ্ছদসহ যে সব কিছু তাদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য সে সব ব্যাপারে সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। দায়সারাভাবে কোনো মতে দায়িত্ব পালন নয়। বরং প্রাণ খুলে উদারচিত্তে ভালমত তাদের খাবার-দাবার পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি যত্নবান হবে।

স্ত্রীর হাত খরচ পৃথকভাবে দিতে হবে

এখানে আরো কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করার ইচ্ছে করেছি। যেসব বিষয়ে হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)ও গুরুত্বারোপ করতেন। অথচ এসব বিষয় আমাদের কাছে উপেক্ষিত। হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেছেন–শুধু খাবার দাবার, কাপড়-চোপড় দেয়ার নামই স্ত্রীদের ভরণ

পোষণ বা নফকাহ নয়। বরং কিছু টাকা স্ত্রীর হাতে পকেট খরচ হিসেবে তুলে দেয়াও ভরণ-পোষণের অন্তর্ভুক্ত, যে টাকা সে নিজের ইচ্ছে মতো খরচ করবে। অনেকে শুধু স্ত্রীর খাবার দাবার আর কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করেই শেষ। হাত খরচার প্রতি তাদের কোনো খেয়ালই নেই। অথচ হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন- খাবার-দাবার ও কাপড়-চোপড় ছাড়াও স্ত্রীদেরকে কিছু হাত খরচ দিতে হবে। কারণ মানুষের এমন কিছু প্রয়োজন থাকে যা সে অন্যের কাছে বলতে লজ্জাবোধ করে। কখনও বা বলতে গিয়ে বিব্রতবোধ করে। সুতরাং এসব প্রয়োজনের কারণেই কিছু হাত খরচ তাদেরকে পৃথকভাবে দেয়া দরকার। যেন তারা অন্যের কাছে হাত পাততে না হয়। এবং এটাও ভরণ পোষণের অংশবিশেষ। হযরত থানভী (রহ.) বলেন- যারা এমন করে না তারা কিন্তু ভালো করছে না।

খরচের বেলায় উদারমনা হওয়া উচিত

এ সুবাদে আরেকটা কথা না বলে পারছিনা। কথাটি হলো, খানাপিনার ক্ষেত্রে আন্তরিকতা থাকা চাই। এমন যেন না হয় যে, কোনো রকম দায়সারা ভাবে না মরে যেন বেঁচে থাকা যায় এমন করে খাবার দিলেই তো হলো। না, এমনটি মোটেও উচিত নয়। বরং অনুগ্রহ করো। অর্থাৎ আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী প্রশস্তচিত্তে ও দরাজ দিল নিয়ে পরিবারের জন্য খরচ করো। অনেকের মনে আবার খটকা দেখা দিতে পারে। কারণ একদিকে ইসলাম অপচয়কে হারাম ঘোষণা করেছে, অন্যদিকে বলা হয়েছে ঘরের খরচাদির ব্যাপারে কৃপণতা দেখাবে না। বরং ঘরের খরচের বেলায় উদারমনা হওয়া উচিত। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, কৃপণতা ও অপচয় এ দুটো নির্ণয়ের সীমারেখা কি? কোন ধরনের খরচ অপচয় হবে আর কোনটা হবে কৃপণতা?

বৈধ আবাসন, বৈধ আরাম আয়েশ

এ প্রশ্নের জবাবে হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন-ঘর বলা হয়, যা বসবাসের উপযুক্ত। যেমন একটি চাল টানিয়ে দিলো, বস্তিতে ঝুপড়ি পেতে দিলো এভাবেও মানুষ বসবাস করে। এটা হলো বসবাসের প্রথম পর্যায়। শরীয়তের দৃষ্টিকোণে যা সম্পূর্ণ বৈধ। দ্বিতীয় পর্যায় হলো, যেখানে বসবাসের সাথে আরাম-আয়েশেরও ব্যবস্থা আছে। যেমন, বাস করার জন্য বিল্ডিং তৈরী করা হলো, যেন মানুষ একটু আরাম আয়েশে থাকতে পারে। এর সাথে হয়ত আরো কিছু আয়েশী ব্যবস্থা করা হলো। ইসলাম এতে বাধা দেয়নি এবং এটা অপচয়ের অন্তর্ভুক্তও হবে না। যেমন

কেউ হয়তো ঝুপড়িতে বসবাস করতে পারে, কেউ হয়তো তা পারে না, যে পারে না তার জন্য পাকা বাড়ি প্রয়োজন। বিদ্যুত প্রয়োজন, প্রয়োজন আরেকটু আরামের জন্যে বৈদ্যুতিক পাখার। এসব ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ এবং অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

বৈধ সাজসজ্জা

তৃতীয় পর্যায় হলো, বৈধ আরাম আয়েশের আয়োজনের পাশাপাশি একটু সাজ সজ্জারও ব্যবস্থা করা। যেমন এক ব্যক্তির একটি পাকা বাড়ি আছে। প্লাস্টার, বিদ্যুত, বৈদ্যুতিক পাখা সবই আছে। কিন্তু বাড়িটিতে রং করা হয় নি। বলা বাহুল্য, বসবাসের জন্য তো বাড়িটি নিশ্চয় উপযুক্ত, তবে তা দেখতে একটু বেমানান বটে। এখন যদি বাড়ির মালিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রং করে একটু সাজসজ্জা করে; তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ।

মোদ্দাকথা, বসবাসের উপযুক্ত আবাসন, সেই আবাসনে কিছুটা আরাম আয়েশের আয়োজন ও সাজসজ্জা করার অবকাশ ইসলামে রয়েছে। সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের অর্থ হলো, কোনো কিছু দেখতে ভালো লাগা ও তৃপ্তিবোধ হওয়া। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয নয়।

সাজ সজ্জা প্রদর্শন অবৈধ

চতুর্থ পর্যায় হলো এতটুকু সাজসজ্জা করা যদ্বারা শারীরিক আরাম কিংবা মনের তৃপ্তিবোধ উদ্দেশ্য নয়। বরং নিজেকে অন্যের চোখে ধনী বলে জাহির করাই মূল মতলব। তার কাছে যে প্রচুর অর্থ আছে, সে যে বেশের বড়লোক এ ধরনের বড় মানুষী জাহির করাই তার সাজসজ্জার আসল উদ্দেশ্য। তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের সাজসজ্জা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং এটা অপচয়ের শামিল।

অপচয়ের সীমারেখা

উল্লিখিত চারটি স্তর পোশাক পরিচ্ছদ, খানাপিনাসহ সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেউ যদি আরাম ও তৃপ্তিবোধের উদ্দেশ্যে দামী পোশাক পরে, যদি এজন্য দামী পোশাক পরিধান করে যে, আমার পরিবার পছন্দ করবে, আমার সাক্ষাতে যারা আসবে তারা দেখে খুশী হবে, তাহলে এতে ক্ষতির কিছু নেই। কিন্তু যদি কেউ নিজেকে ধনী সাব্যস্ত করার জন্য, পয়সাওয়ালা প্রমাণ করার জন্যে, সম্পদের প্রাচুর্য বিকাশের জন্যে দামী পোশাক পরিধান করে তাহলে তা সম্পূর্ণ হারাম বা

অবৈধ। এ কারণে হযরত থানভী (রহ.) অপচয়ের একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যদি কেউ নিজের প্রয়োজন পূরণার্থে এবং আরাম, মানসিক তৃপ্তি কিংবা অন্যের আরামের খাতিরে কোনো খরচ করে ওটা অপচয় হবে না।

এটা অপচয়ের শামিল নয়

আমি একবার একটি শহরে অবস্থান করছিলাম। সেখান থেকে করাচী ফিরে আসার প্রোগাম ছিলো। তখন ছিলো প্রচণ্ড গরমের মৌসুম, তাই আমি বললাম, ভাই! আমার জন্যে এয়ারকন্ডিশন থেকে একটি টিকিট বুক করবেন-এই বলে টিকেটের টাকা দিয়ে দিলাম। তখন আমার পাশে ছিলেন এক ভদ্রলোক। তিনি সাথে সাথেই বলে উঠলেন– জনাব আপনি তো অপচয় করছেন দেখছি! কারণ নরমাল কোচ থাকতে এয়ারকন্ডিশনে যাওয়া নিশ্চয়ই অপব্যয়ের শামিল। অনেকই কিন্তু এমনটি মনে করেন। তাদের ধারণা ফার্স্ট ক্লাশের টিকেটে সফর করা মানেই অপচয়। ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে, যদি আরাম লাভের উদ্দেশ্য কেউ ভালো গাড়িতে সফর করে তাহলে তা অপচয় নয়। যেমন মনে করুন গরমের মৌসুম। এমন প্রচণ্ড গরম যা তার বরদাশ্ত হয় না। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে অর্থ দান করেছেন, এমন ব্যক্তির জন্য উন্নত গাড়িতে সফর করা মোটেও অপচয় নয়। কিন্তু হ্যাঁ, কেউ যদি এই মানসিকতা নিয়ে ভালোমানের গাড়িতে সফর করে যে, মানুষ তাকে বড়লোক মনে করবে, তাহলে নিশ্চয়ই তা অপব্যয় হবে এবং তা সম্পূর্ণ নাজায়েযও হবে। অনুরূপ বিধান কাপড় চোপড়, খানাপিনা সর্বক্ষেত্রেই।

সকলের কার্পণ্যতা ও বদান্যতার ধরন এক নয়

প্রত্যেকটি মানুষের কার্পণ্যতা ও বদান্যতার ধরণ ভিন্ন ভিন্ন। তাই প্রত্যেক স্বামীকে এই ভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই স্ত্রীর ভরণ পোষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। আমার সম্মানিত মুরুব্বী হযরত মাওলানা মাসীহুল্লা খান (রহ.) এক আলোচনা কালে বলেছিলেন–এক অসহায় বেচারা, যার আগা গোড়া কোন কিছুর ঠিক নেই আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বলতে তার কিছুই নেই। যদি এই ব্যক্তির ঘরে একটি বিছানা, আর আলাদা সামান্য আসবাবপত্র থাকে তাহলেই ব্যাস। কারণ এতটুকু সামানাই তার যথেষ্ট। এখন সে যদি চায় এর চাইতে বেশী সামানা জমা করতে, তাহলে তা হবে তার লোক দেখানো এবং অপচয়ের শামিল।

পক্ষান্তরে যার ঘরে নিয়মিত মেহমানের আসা যাওয়া চলে। মানুষের সাথে যার সম্পর্কের পরিধি বিস্তৃত, দোস্ত-আহবাব যার অনেক, তার প্রয়োজনেরসীমাও স্বতন্ত্র। এমন ব্যক্তির ঘরে যদি একশ সেট প্লেটও থাকে তাহলেও তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ এসব আসবাবপত্র সবগুলোই তো তার প্রয়োজনীয়।

এই মহলে খোদা– সন্ধানী লোক আহম্মক

অনেকে হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) এর ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন। যিনি ছিলেন বড়মাপের একজন বাদশাহ। তার ঘটনাটি ছিল এই–

একদিন রাতের বেলা হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) লক্ষ্য করলেন, একটি লোক তার মহলের ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) তাকে পাকড়াও করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– রাতের বেলা রাজপ্রাসাদের ছাদে তুমি কি করছো? লোকটি উত্তর দিলো– আমার একটি উট হারিয়ে গেছে সেটির সন্ধানে এখানে এসেছি। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) বললেন– আরে বেকুব, আহম্মক, রাতের বেলা প্রাসাদের চাদে উট খুঁজছ, এখানে উট আসবে কেন? লোকটি আশ্চর্য ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো, কী, এখানে উট পাওয়া যাবে না? ইবরাহীম ইবনে আদহাম বললেন– না, এখানে কীভাবে উট পাওয়া যাবে? এবার লোকটি বললো– যদি এই মহলের ছাদের উপর উট না পাওয়া যায়, এখানে উটের সন্ধানকারী যদি আহম্মক হয়, তাহলে আপনিও তো রাজপ্রাসাদে বসে আল্লাহকে সন্ধান করছেন, রাজপ্রাসাদে বসে তাকে পেতে চান। মনে রাখবেন, রাজপ্রাসাদে বসে আল্লাহ তা'আলাকে পাবেন না। যদি রাজপ্রাসাদের ছাদে উট তালাশ করার কারণে আমি আহম্মক হই, তাহলে আপনি আরো বড় আহম্মক।

লোকটির কথা ইবরাহীম ইবনে আদহামের অন্তর কাঁপিয়ে তুললো। তাই সাথে সাথে তিনি এই বিশাল রাজত্ব ছেড়ে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি ভাবলেন, এখন তো শুধু আল্লাহর স্মরণেই জীবন কাটাতে হবে। তাই তিনি জীবন যাপনের জন্য সঙ্গে করে নিলেন শুধুমাত্র একটি বালিশ আর একটি পেয়ালা। কারণ খাওয়া দাওয়ার জন্যে প্রয়োজন হবে পেয়ালার আর মাঝে মাঝে একটু আরাম নিদ্রার জন্যে প্রয়োজন হবে একটা বালিশের। এরপর তিনি দেখতে পেলেন নদীর পাড়ে এক ব্যক্তি হাতের তালুতে ভরে পানি পান করছে। তাই তিনি ভাবলেন, তাহলে তো পেয়ালাটা আমার অতিরিক্ত নেয়া হয়েছে। পানি তো দেখি শুধু হাতেই পান করা যায়। এই ভেবে তিনি পেয়ালাটি

ফেলে দিয়ে সামনে চলতে লাগলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি মাথার নীচে হাত রেখে ঘুমাচ্ছে। তাই তিনি এবারও ভাবলেন, তাহলে তো বালিশ না হলেও চলে। আল্লাহর দেয়া বালিশই তো যথেষ্ট দেখছি। তা দিয়েই কাজ চলবে। এ ভেবে বালিশটিও ফেলে দিলেন।

অসাধারণ আবেগের আতিশয্যের কারণে সংঘটিত কোনো কাজ অনুসরণ যোগ্য নয়

উল্লিখিত ঘটনাটির কারণে অনেকে ভুল ধারণার শিকার হয়। মনে করে, পেয়ালা, বালিশ রাখাটিও অপচয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত থানভী (রহ) কে সুউচ্চ মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন। আমীন! তিনি সাদাকে সাদা বলতেন, কালোকে বলতেন কালো। এ ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন– নিজেকে ইবরাহীম ইবনে আদহাম ভেবো না। এর একটি কারণ হলো, ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) থেকে সংঘটিত ঘটনাটি আবেগাবস্থার অসাধারণ আতিশয্যের কারণে ঘটেছিলো। যে অবস্থার কর্মকাণ্ড কখনো অনুকরণ করা যায় না। এর ব্যাখ্যা হলো, কোনো কোনো সময় মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির উপর একটি কথা এমন ভাবে চেপে বসে যে, অন্য কোনো কথা সেখানে আর কাজে আসে না। এমন ব্যক্তি এ অবস্থায় মাযুর বা ক্ষমারযোগ্য। এ অবস্থায় তার কোনো কাজ অনুসরণযোগ্য নয়। সুতরাং হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর এই বিশেষ অবস্থানও আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য নয়। অন্যথায় মাথায় তালগোল পাকিয়ে যাবে, ফেলে দিতে হবে বালিশ আর পেয়ালাও। ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-পরিজন সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে। কারণ আমাদের ধারণা অনুযায়ী এমনটি না করলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। অথচ ইসলামের দাবি এমনটি নয়। বরং বিশেষ পরিস্থিতির শিকার হয়ে ইবরাহীম ইবনে আদহাম এমনটি করেছেন। এটা শুধু তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আয় অনুযায়ী ব্যয় হওয়া চাই

প্রত্যেক মানুষের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। তাই প্রত্যেকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখেই চলতে হবে। প্রত্যেকের যখন জীবন আলাদা, তার জীবনধারা আয়-ব্যয়ও আলাদা। সুতরাং যে ব্যক্তির আয়-রোজগার সীমিত, তার ব্যয়ের পরিমাণও সে অনুপাতেই হবে। আর যার আমদানি মাধ্যম শ্রেণীর তার ব্যয়ের পরিমাপও হবে মাঝারি গোছের। আর যার আয় হয় প্রচুর পরিমাণের তার ব্যয়ও হবে সে অনুপাতেই।

তবে এটা উচিত নয় যে, ঘরের কর্তা হয়ত স্বল্প আয়ের অধিকারী আর স্ত্রী বায়না ধরে ধনীর বৌ এর মতো। ধনীর ঘরে যা দেখে তাই এনে দেয়ার জন্য বেচারা গরীবের সাথে পীড়াপীড়ি করে সে। এই ধরনের বায়না ধরা বৈধ নয় মোটেও। তবে হ্যাঁ, স্বামী তার আমদানির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রসন্ন মনে খরচ করা উচিত। যতটুকু সম্ভব ততটুকু খরচ স্ত্রীর জন্যে করা চাই। কৃপণতা বা কাঞ্জুসী স্বামী থেকে কাম্য নয়।

স্বামীদের প্রতি স্ত্রীদের অধিকার

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا إِذَا كَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ فِى الْبَيْتِ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ حَق المرأة على زوجها رقم الحديث ٢١٤٢)

হযরত মু'আবিয়া ইবনে হায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম–ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমাদের প্রতি আমাদের স্ত্রীদের কী অধিকার রয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–তোমরা যখন খাবে তাদেরকেও খাওয়াবে, যখন তোমরা কাপড় পরবে তাদেরকেও পরতে দিবে। তাদের চেহারায় মারধোর করবে না, গালমন্দ করবে না। তাদেরকে তোমাদের ঘরেই থাকতে দিবে অন্য কোথাও না।

তার বিছানা বর্জন করো

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, যদি স্ত্রীর মধ্যে অশালীন, আপত্তিকর কোনো কিছু দেখতে পাও, তাহলে প্রথমে তাকে বোঝাতে হবে। যদি তার বোধদয় না হয় তাহলে তার বিছানা ছেড়ে দিতে হবে এবং আলাদা বিছানায় শুতে হবে। এই হাদীসের মধ্যে বিছানা বর্জনের অর্থ বলা হয়েছে ঘর থেকে তাকে বের করে দেয়া উদ্দেশ্য নয় কিংবা নিজে ঘর থেকে চলে যাওয়াও উদ্দেশ্য নয়। বরং ঘরের ভিতরেই উভয়ের আলাদা শয্যাগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ ! এমনটি বলা হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদেই। স্ত্রীর জন্য এটা একটা মানসিক আঘাত বটে। যাতে সে পরিশীলিত হয়ে যায়, মার্জিতা নারীতে পরিণত হয়।

সম্পূর্ণ বয়কট জায়েয নেই

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম একথাও লিখেছেন–এমতাবস্থায় বিছানা তো পৃথক করে ফেলতে হবে তবে পুরোপুরি কথাবার্তা বয়কট করা যাবে না এবং একে অপরকে সালাম দেয়া-নেয়াও বন্ধ করা যাবে না। বরং সালাম কালাম চলবে, চলবে প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও। সম্পূর্ণ বয়কট করা জায়েয হবে না।

চারমাসের বেশী সফরে স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ

এমনকি আলোচ্য হাদীসটির আলোকে ফিকাহবিদগণ এও লিখেছেন–স্বামী যদি চার মাসের বেশী সময়ের জন্য সফরে যেতে চান তাহলে স্বামীকে স্ত্রী থেকে অনুমতি নিতে হবে। খুশী মনে সে অনুমতি দিলে সফর বৈধ হবে, অন্যথায় নয়। হযরত ওমর (রা.) তাঁর শাসনামলে এই আইন চালু করেছিলেন যে, যেসব মুজাহিদ বাড়ির বাইরে থাকেন তারা চার মাসের বেশি বাইরে থাকতে পারবে না। ফিকাহবিদগণ আরো লিখেছেন–কেউ যদি চার মাসের কম সময়ে সফরে থাকতে চায় তার জন্য স্ত্রীর অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু চার মাসেরও বেশী সময়ের সফরের জন্য স্ত্রীর অনুমতি অবশ্যই লাগবে, যতো মোবারক সফরই হোক না কেন, এমনকি যদি হজ্জের সফরও হয় আর তা যদি চার মাসের অধিক কালের জন্য হয় স্ত্রীর অনুমতি অত্যাবশ্যক। তাবলীগ, দাওয়াত, জিহাদের ক্ষেত্রেও এই একই বিধান প্রযোজ্য। সুতরাং যখন এসব মোবারক ক্ষেত্রেও স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ এতোটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে তো কোনো কথাই নেই। যদি নিছক পয়সা কামানোর লক্ষ্যে চার মাসের বেশী সময় স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী বাইরে থাকে, তাহলে স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করার শামিল বলে বিবেচিত হবে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও গুনাহ।

ভালো মানুষ কে?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ - (جَامِعُ التِّرْمِذِىْ، كِتَابُ الرَّضَاعِ، بَابُ مَاجَاءَ فِىْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلٰى زَوْجِهَا - ١١٦٢)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ মুমিন সেই যার চরিত্র সবচাইতে ভালো। আর তোমাদের মধ্যে সেই সবচাইতে চরিত্রবান যে নিজ স্ত্রীর দৃষ্টিতে চরিত্রবান।

অর্থাৎ ঈমানের পূর্ণতা চরিত্র ছাড়া হয় না। আর চরিত্রের বিচার হবে স্ত্রীর সাথে কৃতকর্মের মাপকাঠিতে। হাদীসটিতে এটাই বলা হয়েছে।

বর্তমান সমাজের 'ভালো স্বভাব'

আজ কাল পরিবর্তনের জোয়ার বইছে। নিত্যই উদ্ভব ঘটছে নতুন নতুন অর্থ-মতলবের। আমাদের মুরুব্বী আল্লামা ক্বারী তাইয়্যিব (রহ.) প্রায়ই বলতেন–আগের যুগের এখন সবকিছুই যেন উল্টো মনে হয়। এমনি আগের যুগে বাতির নীচে থাকতো অন্ধকার আর এখন বাতির উপরে থাকে অন্ধকার। তিনি আরো বলতেন– আজকাল সব জিনিসের কদরও পাল্টে গেছে। অর্থেরও পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। এমনকি আখলাক বা চরিত্রের অর্থও আজ অন্যরকম। লোক দেখানো কিছু সামাজিকতা বা আচরণকেই এখন চরিত্র বলা হয়। যেমন, মুচকি হেসে সাক্ষাত করা, সাক্ষাতের সময় কিছু মনোহর শব্দ উচ্চারণ করা কিংবা একথা বলে দেয়া 'আপনার সাক্ষাতে খুব আনন্দ লাগছে' 'আপনার সাথে মিলিত হতে পেরে ভালোই লাগছে' ইত্যাদি।

মুখে এসব শ্রুতিমধুর বুলি আওড়ানোর নামই বর্তমান সমাজের আখলাক। বর্তমানে এসব মুখরোচক আচরণ একটা স্বতন্ত্র বিদ্যায় পরিণত হয়েছে। চর্চা চলছে কিভাবে শৈল্পিক ভঙ্গিতে অন্যের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করা যায়। কিভাবে সম্মোহনী ভঙ্গিতে কথা বলে অন্যকে বাগানো যায়, কিংবা আকৃষ্ট করা যায়। এমনকি এ বিষয়ে বিভিন্ন বই-পুস্তক ও আজকাল রচিত হচ্ছে। কলা-কৌশল শেখানো হচ্ছে অন্যকে ভক্ত বানাবার, প্রভাবিত করার। এ ধরনের অভিনয়সুলভ মেকি আচরণকেই প্রচার করা হচ্ছে 'আখলাক' বা 'চরিত্র' বলে। ভালো করে বুঝে রাখুন, এসব মেকি আচরণের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত চরিত্রের। এটার নাম তো চরিত্র নয়। এটা বরং লোক দেখানো আচরণ বা উপরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট মার্কা চরিত্র। পদ ও প্রসিদ্ধির লোভের কারণেই মানুষ এমনটি করে থাকে। মূলতঃ এ গুলো চরিত্রহীনতা ও অসুস্থতা। প্রকৃত চরিত্রের সাথে এসব আকৃতিগত চরিত্রের কোনো সম্পর্ক নেই।

'উত্তম চরিত্র' অন্তরের অবস্থার নাম

অন্তরের অবস্থার নামই 'উত্তম চরিত্র'। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ ভঙ্গিতে যা প্রকাশ পায় মাত্র। আর অন্তরের সেই অবস্থা হবে, আল্লাহর সকল মাখলুকের প্রতি মঙ্গল কামনা করা। সকল সৃষ্টির প্রতি দরদ ও ভালোবাসা থাকা। শত্রু, বন্ধু, মুমিন, কাফের সকলেই এখানে একরকম। সকলের সাথে সম্পর্কের সূত্র মাত্র একটি। তা হলো এরা সকলেই আমার আল্লাহর সৃষ্টি। আমার মনিবের সৃষ্টির প্রতি আন্তরিকতা থাকতেই হবে। এ সম্পর্কের কারণেই সকল সৃষ্টির সাথে সদাচরণ আমাকে করতেই হবে। সত্যিকার অর্থে চরিত্রবান যারা, প্রথমে তাদের হৃদয়ে এই অনুভূতি এই মানসিকতার সৃষ্টি হয়। তারপর এ মানসিকতা থেকে সকলের প্রতি পরিশীলিত আচরণ উৎসারিত হয়। সে তখন সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করে, অন্যের কল্যাণকামীতায় সক্রিয় হয়। সাক্ষাতে হাসে অকৃত্রিম মুচকি হাসি। এসবই সেই প্রশস্ত অন্তরের উদার ভাবনার বাহ্যিক রূপ মাত্র। তার হাসিতে ভেজাল নেই, অন্যকে ভক্ত বানাবার নীচু মানসিকতা নেই। বরং মনিবের মাখলুকের প্রতি ভালোবাসার দাবিতেই এমন করে। এটাই মূলতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক শিখানো চরিত্র। অধুনা চারিত্রিক খোলসের সাথে এই নির্ভেজাল, লৌকিকতাহীন চরিত্রের ব্যবধান রাতদিনের ব্যবধানের মতো।

চরিত্র গঠনের পদ্ধতি

বলাবাহুল্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত চরিত্র শেখার জন্য দু'চারটি চরিত্র বিদ্যার বই পড়ে নেয়াই যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট নয় এ বিষয়ে কিছু ওয়াজ নসীহত শুনে নেয়া। এর জন্য বরং কোন পীর, বুযুর্গ, মুর্শিদ কিংবা মুরুব্বীর সোহবতে থাকা জরুরী। তাসাউফ, পীর- মুরীদীর যে বরকতময় ধারা চলে আসছে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো উত্তম চরিত্র গঠন করা। আর অসৎ চরিত্র দুরীভূত করা।

সারকথা হলো, পূর্ণাঙ্গ মুমিন সেই যার চরিত্র ভালো, যার আবেগ-উচ্ছ্বাস শুচিময়, চিন্তা-চেতনা পরিশীলিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আপন দয়ায় নিজ রহমতের ছায়াতলে আমাদের আশ্রয় দান করে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

আল্লাহর বান্দীদেরকে মেরোনা

عَنْ أَيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَبِىْ ذُبَابٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوْا اَمَاءَ اللّٰهِ، فَجَاءَ عُمَرُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلٰى أَزْوَاجِهِنَّ الخ . (سُنَنُ أَبِىْ دَاؤُدَ، كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ فِىْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، رقم الحديث ٢١٤٦)

হযরত আয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে মেরোনা' অর্থাৎ, নারীদেরকে মারধোর করো না। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আরয করলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) নারীরা তো তাদের স্বামীর উপর বাঘ বনে গেছে।

'হাদীসে যন্নী' এবং 'হাদীসে কতয়ী'

হাদীসের একটি প্রকার যা আমরা হাদীসের কিতাবে حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ এ পদ্ধতিতে দীর্ঘ সনদে পড়ি বা শ্রবণ করি। এ ধরনের হাদীসকে ظَنِّىْ 'যন্নী' বলা হয়। এ প্রকারের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের উপর আমল করা ওয়াজিব। আমল না করলে গুনাহ্ হবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সরাসরি যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবান থেকে শুনেছেন। সেই হাদীসকে 'যন্নী' বলা হয় না। বরং সেই হাদীসকে বলা হয় (قَطْعِىْ) 'কত্য়ী হাদীস'। আর এই 'কত্য়ী' হাদীসের হুকুম আরো কঠোর। এই 'কত্য়ী হাদীস অমান্যকারী কাফের হয়ে যায়। কারণ এ শ্রেণীর লোকেরা এই শ্রেণীর হাদীসকে অস্বীকার করার মাধ্যমে সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম অস্বীকার করা হয়। আর সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-ই এর যোগ্যতা রাখতেন

কখনো কখনো আমাদের মনে একটি বোকামীসুলভ ধারণার উদ্রেক হয়। আমরা ভেবে থাকি, আহা! আমরা যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এর যুগে পয়দা হতাম! যদি তাঁর যুগের বরকত লাভ করতে পারতাম! মূলতঃ এটা আমাদের স্থূল ধারণা মাত্র। আল্লাহ তা'আলা সকল হেকমত ও প্রজ্ঞার আধার। তিনি তার নিপুণ প্রজ্ঞা বলে সবকিছুর স্বরূপ নির্ণয় করেন। তিনি তাঁর অসীম ও উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞানুসারেই আমাদের পাঠিয়েছেন এই যুগে। যদি আমরা সেই কঠিন যুগে আসতাম, আমাদের কী যে অবস্থা হতো, অধঃ গতির কোন পর্যায়ে যেতাম তা আল্লাহই ভালো জানেন। কারণ সেকালের ঈমানের বিষয়টি এতটা নাযুক ছিল, একটু বৈপরীত্য দেখা দিলেই এদিক সেদিক হয়ে যাওয়া নিশ্চিত ছিলো।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্যে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আত্মত্যাগের যে নমুনা পেশ করেছেন তার একমাত্র উপযুক্ত তারাই। আজকের যুগে আমাদের ক্ষেত্রে এক কল্পনাতীত ব্যাপার। তাঁদের সেই অনুপম কুরবানী ও অভাবনীয় ত্যাগের বদৌলতেই তো আমরা এই দ্বীন পেয়েছি, ইসলামের সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এজন্যই তো তাঁরা মর্যাদার স্বর্ণ শিখরে পৌছেছেন। তাঁরা যদি আমাদের মতো আরামপ্রিয় হতেন, যদি তাঁরা বিলাসিতা বেছেনিতেন তাহলে পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে গোল্লায় যেতো। আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে সেই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করেননি। বরং তিনি আমাদেরকে এমন এক সময় পাঠিয়েছেন যখন আমাদের জন্য অনেক সহজতম পদ্ধতি রয়েছে। আজ আমরা কোনো 'হাদীস' সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারছি, এটি 'যন্নী' হাদীস। যার অস্বীকারকারী কাফের হয়না। তবে হ্যাঁ, গুনাহগার অবশ্যই হয়। অথচ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ব্যাপারটি আরো কতো কঠিন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পবিত্র জবান থেকে নিঃসৃত একটি কথা অস্বীকার করার সাথে সাথেই সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো কথা তাঁদের অস্বীকার করার উপায় ছিলোনা।

নারীরা তো বাঘ হয়ে গেলো

সুতরাং নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন- 'তোমরা নারীদেরকে মেরো না'। তখন আর তাদের গায়ে হাত তোলার আর কোনো পথ থাকলো না। কারণ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তো এমন ছিলেন না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কাজ করতে নিষেধ করবেন অথচ তারা তা অগ্রাহ্য করে পুনরায় করবেন। ফলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এর নিষেধ শোনার সাথে সাথেই নারীদের মারধোর করা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলো। তাই হযরত উমর (রা.) কয়েকদিন পর এসে আরয করলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'মেয়েরা তো স্বামীর উপর বাঘ হয়ে গেছে'। যেহেতু আপনি তাদেরকে মারধোর করতে নিষেধ করেছেন, এখন তো কোনো পুরুষ তাদের স্ত্রীকে মারা তো দূরের কথা, মারার কাছেও যেতে সাহস পায় না। আর মারধোর বন্ধ হওয়ার কারণে তারা এখন স্বামীদের উপর এমন খড়গহস্ত যেন তারা বাঘ হয়ে গেছে। তারা স্বামীদের অধিকারের তোয়াক্কা এখন আর করে না। বরং তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে শুরু করেছে। অতএব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই বলুন, এই পরিস্থিতিতে আমরা কী করতে পারি?

فَرَخَّصَ فِىْ ضَرْبِهِنَّ ـ

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মারধোর করার অনুমতি প্রদান করেন। অর্থাৎ নারীরা যদি স্বামীর অধিকার নষ্ট করে, তারা যদি স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তখন তাদেরকে পরিশীলিত করার লক্ষ্যে যদি মারধোর ছাড়া অন্য কোনো উপায় না থাকে, তবে তাদেরকে মারধোরের অনুমতি আছে। এভাবে যখন মারধোরের অনুমতি দেয়া হলো তখন অভিযোগের আওয়াজ উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি স্বামীদেরকে মারধোর করার অনুমতি দেয়ার কারণে তারা তো বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে। এখন তারা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে আমাদেরকে কেবল মারধোর করে।

তারা ভালো মানুষ নয়

উপরোক্ত অভিযোগ শোনার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أَطَافَ بِاٰلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ ـ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের নাম নিয়ে ইরশাদ করলেন-'মুহাম্মাদের ঘরে অনেক মহিলাই আসা যাওয়া করেছে, যারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে, স্বামীরা তাদের সাথে অশোভনীয় আচরণ করে, তাদেরকে মারধোর করে। তোমরা খুব ভালো করে স্মরণ রাখবে,যারা স্ত্রীদের সাথে এরূপ অসাদাচরণ করে, তারা তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ হতে পারেনা। কারণ মারধোর করা তো পূর্ণাঙ্গ মুমিন মুসলমানের কাজ নয়।

এই সকল আলোচনার মাধ্যমে নবীজী-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, নির্লজ্জ কর্মকাণ্ডের জন্য যদি কোনো স্ত্রীকে শাসন করার দরকার হয় এবং মারধোর ছাড়া যদি অন্য কোনো উপায় তখন না থাকে, তাহলে তাকে মৃদভাবে মারধোর করার অনুমতি আছে। তবে যাতে শরীরে দাগ না পড়ে। সর্বোপরি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত হলো, কোনো পরিস্থিতিতেই স্ত্রীকে মারধোর না করা। মুমিনদের মাতা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুণ্যময়ী স্ত্রীগণের স্পষ্ট ভাষ্য, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে কখনো তাঁর কোনো স্ত্রীর উপর হাত উঠান নি।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ সৎ স্ত্রী

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ . (صَحِيح مُسْلِم، كِتَابُ الرِّضَاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ١٤٦٧)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদ। আর এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো সৎকর্মপরায়ণ স্ত্রী।

আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টি মানুষের কল্যাণার্থেই। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا . (سورة البقرة : ٢٩)

তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। সূরা বাকারা ঃ ২৯। মানব জীবনের প্রয়োজন পূরণার্থে, আরাম-আয়েশের স্বার্থেই সৃষ্টিকূলের বিশাল এই নেয়ামত। তবে এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো একজন সতী-সাধ্বী, নেককার স্ত্রী। অন্য একটি হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

حَبِّبَ إِلَىَّ مِنْ دُنْيَا كُمُ النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ . (كَنْزُ الْعُمَّال، حديث : ١٨٩١٣)

'তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার প্রিয়। নারী ও সুগন্ধি। আর নামায আমার চোখের শান্তি।' তিনি আরো বলেছেন–

مَالِىَ وَالدُّنْيَا، مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا . (سنن الترمذى، كتاب الذهد، الحديث : ٢٣٧٨)

দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমিতো গাছের ছায়ায় বিশ্রামরত এক মুসাফিরের মতো। যে একটু পরেই বিশ্রামস্থল ছেড়ে চলে যাবে। [পূর্বের হাদীসের ভাষ্য, 'তোমাদের দুনিয়া' আর এখানে ইরশাদ হয়েছে 'আমি একজন মুসাফিরের মতো'। তবে এই মুসাফিরী জীবনে তিনটি বস্তু আমার কাছে প্রিয়। নারী, সুগন্ধি, আর ঠাণ্ডা পানি।

ঠাণ্ডা পানি একটি বড় নেয়ামত

হাদীস শরীফের বিশাল ভাণ্ডার সামনে রাখলে কোথাও পাওয়া যায়না যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো জীবনে কোনো খাবারের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এমন কি তিনি কোনো বিশেষ খাবারের নির্দেশ দিয়েছেন এমন প্রমাণও মিলে না। বরং যা কিছু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে আসতো, তিনি তা খেয়ে নিতেন। কিন্তু ঠাণ্ডা পানির প্রতি তিনি এতো আগ্রহী ছিলেন যে, 'গারস' নামক কূপ থেকে তাঁর জন্য পানি সংগ্রহ করা হতো। অথচ মসজিদে নববী থেকে দুই-আড়াই মাইল দূরত্বে কূপটির অবস্থান ছিলো। কূপটির পানি যেমন ঠাণ্ডা তেমন মিষ্টিও ছিল। মাহনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন তাকে যেন এই কূপের পানি দিয়েই গোসল দেয়া হয়।

ঠাণ্ডা পানি পান কর

আমাদের হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) এ সম্পর্কে একটি হিকমতও বর্ণনা করেছেন। তিনি একদিন হযরত থানভী (রহ.) কে বলেন– মিয়া আশরাফ আলী! যখন পানি পান করবে তখন ঠাণ্ডা পানি পান করবে। যেন প্রতিটি ধমনী থেকে আল্লাহর শোকর উৎসারিত হয়। কারণ ঠাণ্ডা পানির দ্বারা প্রতিটি ধমনীর তৃপ্তিবোধ হয় এবং সেখান থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়ে আসে আলহামদুলিল্লাহ।

মন্দ নারী থেকে পানাহ চাও

সারকথা, তিনটি পছন্দনীয় জিনিসের একটি হলো 'নারী'। এই নারী যদি আবার অসৎ হয়, তাহলে এই ধরনের অসৎ নারী থেকেও আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ عَنْ إِمْرَأَةٍ تَشِيْبُنِىْ قَبْلَ الْمَشِيْبِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ وَلَدٍيَكُوْنُ عَلَىَّ وَبَالاً -

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ওই নারী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে আমাকে বার্ধক্য আসার আগেই বুড়ো বানিয়ে দিবে। আর এমন সন্তান থেকেও পানাহ চাচ্ছি, যে আমার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

তাই নিজের জন্যে কিংবা ছেলের জন্যে পাত্রী খোঁজ করার সময় সবিশেষ লক্ষ্য রাখবে যে তার মাঝে দ্বীন আছে কি-না। আল্লাহ না করুন! যদি স্ত্রী অসৎ হয়, নেক স্বভাবী না হয়, তাহলে মহাবিপদ হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা প্রচুর।

পাশাপাশি কারো ভাগ্যে নেককার স্ত্রী জুটলে তাহলে তার কদর করতে হবে। আর তার কদর করা মানে তার অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং তার সাথে সদাচরণ করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকেই তাঁর করুণা দ্বারা তাঁর হুকুম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন! আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

স্বামীর মর্যাদা
ও
অধিকার

.... হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু পুরুষকে অভিভাবক বানিয়েছেন, সেহেতু তার সিদ্ধান্তই মেনে চলতে হবে। তবে নারীরা তাদের অভিমত ও পরামর্শ ব্যক্ত করতে পারবে, পাশাপাশি পুরুষদেরকেও বলা হয়েছে তারা নারীদের মন খুশী করার প্রতি সচেষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক পুরুষই, নারী নয়। নারী যদি এ কথাগুলোর প্রতি উদাসীনতা দেখায়, সে যদি মনে করে সব বিষয়ে আমার কথাই হবে একমাত্র কথা, আমিই হবো সংসারের অভিভাবক— পরিচালক, পুরুষ হবে আমার পরিচালনাধীন, তাহলে মনে রাখতে হবে এটা প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত বিধির পরিপন্থী, শরীয়তের খেলাফ। যুক্তি-তর্ক এবং ইনসাফও স্বীকার করে না এ সিদ্ধান্ত। নারী যদি এমনটি করে তাহলে সংসার বিরান হয়ে যাবে, নিশ্চিত ভেঙ্গে পড়বে পারিবারিক কাঠামো।

স্বামীর মর্যাদা ও অধিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ـ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ـ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ : ٣٤)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ـ

হাম্‌দ ও সালাতের পর–

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষেরা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং নেককার স্ত্রীগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক

চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। অর্থাৎ, স্বামীর অনুপস্থিতিতে সতীত্ব ও স্বামীর সব অধিকারের হেফাযত করে।

পূর্বে আলোচনা করা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেসব দায়িত্ব শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত হয় সেগুলো সম্পর্কে হয়েছে। সেখানে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, স্ত্রীদের সাথে স্বামীর আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত। মূলতঃ ইসলামী শরীয়ত হলো আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। এতে মানব সমাজের একাধিকারের আলোচনা করা হয়নি শুধুমাত্র। বরং মানব সমাজের উভয় শ্রেণীর কথা এতে আলোচিত হয়েছে সমভাবে। উভয় শ্রেণীর ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি এবং সফলতার পথ বাতলে দিয়েছে এই ইসলামী শরীয়াহ। তাই কুরআন ও হাদীসে যেমনিভাবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তার যথার্থ মূল্যায়নও করা হয়েছে তেমনিভাবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য ও অধিকার প্রসঙ্গেও আলোকপাত করা হয়েছে। বরং বলা চলে, উভয়ের অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি কুরআন-হাদীসে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে সকলেই অধিকার আদায়ে সোচ্চার

ইসলাম সকলের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। অধিকার চাওয়ার প্রতি ইসলাম তেমন জোর দেয়নি। আর অধুনা বিশ্বে অধিকারের দাবিতে সবাই সচেতন। প্রত্যেকেই অধিকারের দাবির্তে সবাক। সকলেরই দাবি-অধিকার আদায়ের দাবি। সেই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে চলছে আন্দোলন, বিক্ষোভ, সংগ্রাম, চলছে হরতালও বয়কট। দুনিয়া জুড়ে যেন অধিকার আদায়ের জন্য কোশেশ চলছে সর্বপর্যায়ে। অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে অসংখ্য দল ও অসংখ্য সংগঠন। যেমন নাম রাখা হচ্ছে .... 'অধিকার সংরক্ষণ দল' আরো কতো কী! কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় শিরোনামে কোনো দল নেই, সংগঠন নেই। এ নিয়ে যেন সবাই ভাবলেশহীন। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব কি আমি আদায় করছি? আমার দায়িত্ব পালনে আমি কতটুকু আন্তরিক? এই নিয়ে যেন কারো মাথা ব্যথা নেই। শ্রমিক শ্লোগান তুলছে অধিকার দাও। মালিকের দাবি হচ্ছে, আমার পূর্ণাঙ্গ অধিকার চাই। অথচ উভয় শ্রেণীর কেউ ভাবতে রাজী নয় যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি না তো?

পুরুষ চাচ্ছে তার অধিকার। নারীর দাবি হচ্ছে, আমার অধিকার দাও। এর জন্য চলছে নিয়মিত আন্দোলন। চেষ্টা-সাধনা চলছে দুর্বার গতিতে। পৃথিবীর

আকাশ বাতাস আজ ভারী হয়ে উঠছে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে। তবুও আল্লাহর কোনো বান্দা একথা ভাবতে চায়না, আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি যথাযথভাবে আদায় করছি তো, না-কি সে দায়িত্ব পালনে অবহেলা হচ্ছে, ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে?

সকলকেই হতে হবে দায়িত্ব সচেতন

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা ও আদর্শের সারকথা হলো, সকলকেই হতে হবে কর্তব্যপরায়ণ, আপন দায়িত্ব পালনে গভীর মনোযোগী। সকলেই যদি নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন হয় তাহলে কারো অধিকার ভূলুণ্ঠিত হবে না। বরং তখন সকলেই নিজ নিজ অধিকার বুঝে পাবে। মালিক যখন তার দায়িত্ব আদায়ে সক্রিয় হবে তখন শ্রমিকেরও অধিকার আদায় হবে যথাযথ ভাবে। স্বামী দায়িত্ব সচেতন হলে স্ত্রীর অধিকার বিনষ্ট হবে না। স্ত্রী কর্তব্যপরায়ণ হলে স্বামীর অধিকার বিধ্বস্ত হবে না। মূলতঃ শরীয়তের তাগীদ এটাই। ইসলামী শরীয়াহ মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করতে চায়, অধিকার সচেতন নয়।

সর্বপ্রথম নিজের কথা ভাবুন!

বর্তমানের স্রোত চলছে উল্টো দিকে। কেউই নিজের বিচ্যুতি দেখতে রাজী নয়। সংস্কার, সংশোধনের ঝাণ্ডা উঠাবেন তো শুরুতেই চেষ্টা চালাবেন অন্যকে শোধরাবার। নিজের সংশোধনের ব্যাপারে যেন কোনো মাথা ব্যথা নেই। ঘূর্ণ নয়নেও দেখতে রাজী নয় তার ভিতর ত্রুটি আছে। সে যেন ভাবতেও পারে না– আমিও তো ভুলের মধ্যে আছি। আমারও সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। অথচ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۔ (سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ۔ ١٠٥)

হে মুমিনগণ তোমরা নিজেদের কথা ভাবো তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কোনো পথভ্রষ্টই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। [সূরা মায়িদা, আয়াত : ১০৫]

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাকো। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের নিকট কী চায়? ইসলাম, শরীয়ত, দ্বীনদারী সততা ও মানবতার-দাবি কি? তোমরা সেই দাবি পালনে

আন্তরিক হও। কারণ তোমরা যখন কর্তব্যপরায়ণ হবে তখন অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা পদ্ধতি

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুনিপুণ শিক্ষা পদ্ধতি দেখুন, তার যুগে যখন সরকারী কর্মচারীগণ যাকাত আদায় করতে যেতেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে হিদায়াতনামা দিতেন– তোমরা যাকাত আদায় করতে গিয়ে মানুষের সাথে কেমন ব্যবহার করবে জানো? তোমাদের আচরণ পদ্ধতি হবে–

لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِىْ زَكَاةٍ وَلَا تُؤْخَذُ زَكَاتُهُمْ اِلَّافِىْ دُوْرِهِمْ ۔

(سنن أبى اؤد، كتاب الزكوة ۔ باب أين تصدق الاموال : ١٥٩١)

‘তোমরা তাদের ঘরে গিয়ে যাকাত উসুল করবে। এমনটি যেন না হয় যে, তোমরা কোথাও অবস্থান করবে আর তাদেরকে যাকাত পৌঁছে দিতে বাধ্য করবে।’ তিনি আরো বলেছেন–

اَلْمُعْتَدِىْ فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا ۔ (سنن أبى داؤد، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، ١٥٨٥)

যাকাত আদায়ে সীমালংঘনকারী যাকাত আদায়ে অস্বীকার কারীর মতো সমান অপরাধী। হাদীসের অংশ দুটিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোর তাগিদ দিয়ে বলেছেন– তোমরা যাকাত আদায় করতে গিয়ে মানুষকে কষ্ট দিতে পারবে না। তাদের উপর যেই পরিমাণ যাকাত ফরয হয়েছে তার চাইতে বেশীও নিতে পারবে না। যদি এর ব্যতিক্রম করো তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। পাশাপাশি যাকাত দাতাগণের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًى ۔ (جامع الترمذى، كتاب الزكوة، باب ماجاء فى رض المصدق ۔ ٦٤٧)

যাকাত আদায়কারীগণ যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন যেন তারা সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যায়। কারণ তারা তো আমার মুখপাত্র বা প্রতিনিধি।

তোমাদের কোনো অসদাচরণে তাদের মনে ব্যথা দেয়া আমাকে দুঃখ দেয়ার শামিল। তাই যাকাতদাতারা তাদের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

কি অনুপম শিক্ষা! একদিকে উসুলকারীদের বলেছেন– যাকাতদাতাদের সাথে বাড়াবাড়ি করতে পারবে না। একটু বেশী নেয়াও সম্পূর্ণ নিষেধ। অন্যদিকে যাকাতদাতাদেরকে বলছেন– আদায়কারীদের সন্তুষ্টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। তারা যেন তোমাদের কাছ থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে না আসে। বরং তাদেরকে খুশী করেই বিদায় দেবে। মূলতঃ এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়পক্ষ তথা যাকাত আদায়কারী ও যাকাতদাতাকে স্ব স্ব দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। চেয়েছেন উভয়পক্ষকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে। তিনি যাকাতদাতাদেরকে বলেননি, তোমরা অধিকার আদায়ের দাবিতে সংগ্রাম করো। বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা কর– যারা আমাদের যাকাত আদায় করতে আসবে তারা আমাদের অধিকার ভূলুণ্ঠিত করতে পারবে না। এবং এই অধিকার আদায়ের দাবিতে তোমরা সংগঠন গড়ে তোল। তিনি এমনটি বলেননি কারণ এতে লাঠালাঠি সৃষ্টি হয়ে যেতো।

ইসলামের জোরালো বক্তব্য, সকলেই নিজ দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হতে হবে। কর্তব্য পালনে কেউ যেন গড়িমসি না করে। প্রত্যেকেই যেন ভাবে, আমার দায়িত্বের আওতাধীন প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসিত হবো। তখন প্রভুর সামনে আমার কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে পারবো তো? পারবো তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ দিতে? এটাই ইসলামী দর্শন। একে অন্যের প্রতি অধিকার আদায়ের দাবি তুলে ধরবে এটা ইসলামের দর্শন ও নীতি নয়।

জীবন গঠনের পদ্ধতি

উল্লিখিত দর্শন দাম্পত্যজীবনের ক্ষেত্রে প্রাণতুল্য। দাম্পত্যজীবনকে সুখময় করে তুলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিকা এটি। উভয়কে উৎসাহিত করেছেন স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের প্রতি। স্বামীকে বলা হয়েছে স্বীয় দায়িত্ব পালনের কথা। স্ত্রীকেও বলা হয়েছে, তোমাকে হতে হবে কর্তব্যপরায়ণা। সুতরাং উভয়ে নিজ নিজ কর্তব্য আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন সংসার পরিচালিত হয় এভাবেই। স্বামী -স্ত্রীর উভয়ের মাঝেই থাকতে হয় দায়িত্ববোধ। আন্তরিক হতে হয় একে অন্যের অধিকার সম্পর্কে। নিজ অধিকারের চাইতে অন্যের অধিকারকে অগ্রাধিকার

দেয়ার মানসিকতা থাকতে হয়। উভয়ই যদি এই মানসিকতাসম্পন্ন হতে পারে তাহলে গড়ে উঠে প্রাণবন্ত এক জীবন।.আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আমাদের জীবন সম্পর্কে দরদ নিয়ে ভাবতেন, ভাবতেন কিভাবে সুন্দর হয় একজন মুসলমানের সার্বিক জীবন। তাই কুরআন ও হাদীসে বারবার আলোচিত হয়েছে নারী-পুরুষের দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী যদি ভুলে যান নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা, যদি বিচ্যুতি দেখা দেয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ পালনে, তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্টতম কাজ হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ।

ইবলিসের দরবার

একটি হাদীসে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– শয়তান মাঝে মধ্যে সমুদ্রের পানির উপর দরবার জমায়। তখন তার চেলাচামুণ্ডা যারা তাঁর নির্দেশ পালনে সদা তৎপর তারা এসে সেখানে জমায়েত হয়। তারা সকলে তাদের নিজ নিজ কার্যবিবরণী পেশ করে। জিজ্ঞাসাবাদ চলে, প্রত্যেকের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে। তখন সকল শিষ্যই নিজ নিজ কারগুজারি উপস্থাপন করে। সিংসাহনে উপবিষ্ট ইবলিস সকলের কারগুজারি শুনে। দরবার চলাকালীন সময়ে এক শিষ্য এসে বললো– অমুক ব্যক্তি নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে আমি তাকে এমন এক কাজে জড়িয়ে দিয়েছি, যার কারণে তার আর নামায পড়া হলোনা,তার বক্তব্য শুনে ইবলিস খুশী হয়। বলা হয় তুমি খুব ভালো কাজ করেছ। তবে খুশীটা খুব একটা বেশী প্রকাশ করা হলো না। আর আরেক শিষ্য এসে রিপোর্ট পেশ করল– অমুক লোক ইবাদত করার উদ্দেশ্যে কোথাও রওয়ানা হয়েছিল, আমি তাকে ইবাদত করা থেকে বিরত রেখেছি। একথাও শুনে ইবলিস আনন্দ প্রকাশ করে। এভাবে একেক শিষ্য এসে একেক বক্তব্য পেশ করে। ইবলিস ও আনন্দ আহলাদ প্রকাশ করে।

এক পর্যায়ে এক চেলা এসে বলতে শুরু করল, এক দম্পতির বড় ভালোবাসা ও পারস্পরিক হৃদ্যতার সাথে সংসার চলছিলো, তাদের দিন-কাল সুখ ও স্বাচ্ছন্দের সাথেই যাচ্ছিলো। একদিন আমি উপস্থিত হলাম তাদের সুখের সংসারে। আর এমন এক কাণ্ড ঘটালাম,যার পারিণামে পরস্পর ঝগড়া বেঁধে গেলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো তাদের স্বপ্নের সংসার। অবশেষে পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

তার এই ভাষণ শুনে ইবলিস সিংহাসন থেকে দাঁড়িয়ে যায়। তাকে জড়িয়ে ধরে এবং বলতে থাকে, তুমিই আমার যোগ্য প্রতিনিধি। তুমি যা করেছ তা সত্যিই তুলনাহীণ। [মুসলিম শরীফ, কিতাবু সিফাতিল মুনাফেক্বীন, বাবু তাহরিশিশ শায়তান, হাদীস নং -৩৮৩১]

এই হাদীসটি থেকেই অনুমান করুন, স্বামী -স্ত্রীর পারস্পরিক ঝগড়া - বিবাদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কতখানি নিন্দিত ও ঘৃণিত, পক্ষান্তরে তা শয়তানের নিকট কতখানি নন্দিত ও প্রিয়। এই কারণে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন ও হাদীসের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথা সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন। মানুষ যদি তার উপর আমল করে তাহলে দুনিয়াতেও সফল, আখেরাতেও সফল।

পুরুষ নারীর অভিভাবক

আল্লামা ইমাম নববী (রহ.) এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শিরোনাম দিয়েছেন 'স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার'। এ অধ্যায়ে তিনি অনেকগুলো আয়াত এবং হাদীসের উদ্বৃতি দিয়েছেন। সর্বপ্রথম এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন–

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۔ (سُوْرَةُ النِّسَآءِ : ٣٤)

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল বা অভিভাবক। এই জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।' কেউ কেউ এর তরজমা করেছেন পুরুষেরা নারীদের শাসক ।' কারণ قوام আরবীতে ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কাঁধে কোনো কাজ করার বা পরিচালনা করার দায়িত্ব বর্তায়। আর পুরুষও নারীর সমূহ কাজ কর্মের পরিচালক বা ব্যবস্থাপক। এ সুবাদে পুরুষ নারীর তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক।

এটা একটা মূলনীতি। ইমাম নববী (রহ.) এই মূলনীতিটি তুলে ধরেছেন। কারণ, এই মূলনীতিটির অপব্যাখ্যা করলে যেহেতু হাজারো জট লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই তিনি সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করতে চেয়েছেন এই মূলনীতির দিকে। সবিশেষ মা-বোনদের বোঝাতে চেয়েছেন– 'তোমাদের কাজ-কর্মের পরিচালক বা অভিভাবক তোমরা নও, ওই দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে।'

অধুনা বিশ্বের প্রোপাগাণ্ডা

অধুনা বিশ্বের সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছে নারী পুরুষের সমান অধিকারের শ্লোগান। সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার নাদ। বিশ্বের এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনেকে এ কথা বলতে লজ্জাবোধ করছেন যে, পুরুষই নারীর অভিভাবক। আর নারী পুরুষের কর্তৃত্বাধীন। কারণ বিশ্বজুড়ে প্রোপাগাণ্ডার ঝড় বইছে। বলা হচ্ছে, সকল কর্তৃত্বের মালিক পুরুষ। পুরুষের হাতে নারী আজ চার দেয়ালে বন্দী। নারীকে সমাজে হীন ও তুচ্ছ করে রাখা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণহীন প্রোপাগাণ্ডার এই স্রোত বাধা দেয়ার মতো যেন কেউ আজ নেই।

সফরকালে একজন আমীর বানিয়ে নাও!

বাস্তবতা হলো, নারী-পুরুষ জীবন নামক গাড়ির দুই প্রান্তের চাকা। জীবনের গাড়ি এক প্রান্তের চাকা বাদ দিয়েও চলতে পারেনা, আগ-পিছ হলেও চলতে অক্ষম। বরং একই তালে একই গতিতে চলতে হয় উভয়কে। তবে জীবনের এ দীর্ঘ সফরটি যেন অনায়াসগম্য ও সুশৃংখল হয় সেই লক্ষ্যে একজন অবশ্যই দায়িত্বশীল বা আমীর হতে হবে। হাদীস শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– দুই ব্যক্তি সফর করতে হলে একজনকে সফরের আমীর বানিয়ে নিবে। সফর ছোট হোক বা দীর্ঘ হোক একজনকে আমীর বা দায়িত্বশীল বানিয়ে নিতে হবে যেন সফরে যাবতীয় ব্যবস্থাপনা এবং কর্ম- কৌশল আমীরের সিদ্ধান্ত মতে সুন্দরভাবে হয়। অন্যথায় অনিয়ম ও বিপত্তি দেখা দেয়া স্বাভাবিক।

[আবুদাউদ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ, বাবুল ফিল-কাওমি য়াসাফিরুনা .... হাদীস-২৬৮]

সুতরাং জীবন চলার পথে এ ছোট্ট সফরে যখন আমীর দায়িত্বশীল বানানোর প্রতি এতটা জোর দেয়া হয়েছে, তাহলে দাম্পত্যজীবনের এ সুদীর্ঘ সফরে আমীর বা অভিভাবক নিযুক্ত করার গুরুত্ব অবশ্যই প্রয়োজন। যেন দাম্পত্য জীবনে দ্বন্দ্ব-কলহ, অনিয়ম-বিশৃংখলা দেখা দিতে না পারে। সবকিছুই যেন পরিচালিত হয় সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে।

জীবন সফরে আমীর হবে কে?

পথ দুটি। জীবনের এ দীর্ঘ সফরে পুরুষকে আমীর নিযুক্ত করা কিংবা নারীর কাঁধে তুলে দেয়া জীবনের যাবতীয় কার্যক্রমের দায়িত্ব। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো পথ নেই। মানুষ যদি তার সৃষ্টিগত স্বভাব-প্রকৃতির শক্তি-সামর্থ্য, মন-মানস, যোগ্যতা-কর্মদক্ষতার প্রতি লক্ষ্য করে, যদি বিবেক-বুদ্ধি খরচ করে,

তাহলে অনায়াসেই বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে যে যোগ্যতা ও দক্ষতা দান করেছেন, পৃথিবীর দুঃসাধ্য অনেক বিশাল কাজ সমাধা দেয়ার যে যোগ্যতা পুরুষকে দিয়েছেন তা নারীকে দেননি। সর্বোপরি যদি বিবেক-বুদ্ধির আশ্রয় না নিয়ে সেই মহান সত্তার নিকট সমাধান চাওয়া হয়, যিনি নারী পুরুষ উভয়ের স্রষ্টা, এবং যিনি উভয়কে দাম্পত্যের মালায় গেথে দিয়েছেন, যার ফয়সালা সকল প্রকার সংশয়মুক্ত, যার ফয়সালার বিরুদ্ধে সকল যুক্তি প্রমাণ অকেজো অনর্থক। তাহলে দেখা যাবে তিনিও বলেছেন– পুরুষই তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক, শাসক, অভিভাবক। জীবন সংসার পরিচালনার দায়িত্ব পুরুষের কাঁধেই অর্পিত। যারা এই সিদ্ধান্ত বিনাবাক্যে মেনে নিবে তাদের সংসারে বইবে সুখ ও প্রশান্তির সুবাতাস, তারা হবে সফলকাম ও ভাগ্যবান। আর যারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। উম্মাহর করণীয় হলো যারা আল্লাহর ফয়সালার বিরোধিতা করছে তাদের ধ্বংস ও অশুভ পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ।

ইসলামের দৃষ্টিতে আমীরের মূল্যায়ন

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা এখানে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেননি, পুরুষ নারীর 'শাসক' কিংবা 'বাদশাহ' প্রভৃতি। ইরশাদ হয়েছে– পুরুষ নারীর 'কাওয়াম'। আর 'কাওয়াম' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'দায়িত্বশীল ব্যক্তি'। দায়িত্বশীল হওয়ার অর্থ হলো, দাম্পত্যজীবনের সকল কর্ম কৌশল পরিচালনা করবে পুরুষ। পুরুষের পরিকল্পনা মাফিকই জীবন সংসার পরিচালিত হবে। তবে 'কাওয়াম' অর্থ এই নয় যে, স্বামী স্ত্রীর প্রভু আর স্ত্রী স্বামীর দাস বা কাজের মেয়ে। বরং উভয়ের মাঝে সম্পর্ক হলো শাসক শাসিতের। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হওয়া মানে এই নয় যে, তিনি চেয়ারে বসে হুকুম চালাবেন আর স্ত্রী শুধু তা মেনে চলবে। বরং শাসক বা আমীরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ . كَنْزُ الْعُمَّال، الحديث : ١٧٥١٧-

জাতির নেতা তাদের খাদেম।

একেই তো বলে আমীর!

আমার মুহতারাম আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) প্রায়ই একটি ঘটনা শুনাতেন। তিনি বলতেন– একবার আমি দেওবন্দ থেকে কোথাও সফরে

যাচ্ছিলাম। আমাদের সাথে আমাদের উস্তাদ মাওলানা ইজাজ আলী (রহ.) ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দে শাইখুল আদব হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমরা ষ্টেশনে পৌছার পর জানতে পারলাম ট্রেন একটু দেরীতে আসবে। তখন হযরত মাওলানা ইজাজ আলী (রহ.) বললেন– হাদীস শরীফে এসেছে, যখন তোমরা কখনো সফরে বের হবে তখন একজনকে আমীর নির্বাচিত করে নিবে। সেমতে আমাদেরও একজন আমীর ঠিক করে নেয়া উচিত। হযরত আব্বাজান বলেন– আমরা যেহেতু তাঁর ছাত্র ছিলাম, তিনি হচ্ছেন আমাদের উস্তাদ, তাই বিনয়ের সাথে আরয করলাম– হুযুর! নতুন করে আমীর ঠিক করার কী দরকার? আমীর তো আমাদের মাঝে আছেনই। হযরত প্রশ্ন করলেন, আমীর কে? আমরা উত্তরে বললাম, আপনি ! যেহেতু আপনি হচ্ছেন আমাদের উস্তাদ আর আমরা আপনার ছাত্র। হযরত বললেন– তাহলে আপনারা কি আমাকে আমীর বানাতে চান? আমরা বললাম– জ্বী হুযূর! আপনি ছাড়া আর কেই বা আমীর হবে? হযরত বললেন– আচ্ছা ভালো কথা! তাহলে আমীরের মানেই তো যার প্রতিটি হুকুম মান্য করতে হয়। আমরা বললাম জ্বী! আমীর যখন মেনেছি তখন 'ইনশাআল্লাহ' সব কথাই মেনে চলবো। হযরত বললেন– ঠিক আছে আমিই আমীর সুতরাং তোমরা আমার হুকুম মেনে চলবে।

তারপর যখন ট্রেন আসলো, হযরত সাথীদের কিছু সামান নিজের মাথায় তুলে নিলেন। কিছু নিজের হাতে নিলেন এবং ট্রেন অভিমুখে হাঁটা শুরু করলেন। আমরা বললাম– হুযূর, আপনি এ কি সর্বনাশ করছেন! সামান-পত্র আমাদের কাছে দিন। তখন মাওলানা বললেন– না, আমি যখন আমীর হয়েছি আমার কথা তোমাদের মানতেই হবে। তোমরা আমাকে বোঝা উঠাতে দাও।

শেষ পর্যন্ত তিনি সকল সামানপত্র নিজেই ট্রেনে উঠালেন। পুরো সফরের বড় বড় কাজগুলো নিজ হাতে করেছেন তিনি। আর আমরা যখন কিছু বলতে চেয়েছি, তখনই তিনি বলেছেন– তোমরাই তো আমাকে আমীর বানিয়েছ। আমীরের নির্দেশ মেনে চলা কর্তব্য। তাই আমার কথা শোন। আব্বাজান বলতেন– আমরা তাকে আমীর বানিয়ে যেন কেয়ামত ডেকে আনলাম। মূলতঃ একেই তো বলে আমীর।

আমীর হবেন একজন খাদেম

এই যুগে আমীর শব্দটি মুখে নিতেই মানসপটে ভেসে উঠে এক প্রতাপশালী ব্যক্তি কিংবা রাজা-বাদশাহর অহংকারী চেহারা। যে নেতা কিংবা বাদশাহ

সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলাটা ও মান হানি মনে করে। সকলকেই মনে করে হুকুমের দাস। কিন্তু কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আমীর তাঁর অধীনস্থদের একজন খাদেম ও সেবক মাত্র। ইসলামের দৃষ্টিতে আমীর অর্থ আদৌ এটা নয় যে, আমীর মানে বাদশাহ। আর জনসাধারণ তাঁর আজ্ঞাবহ গোলাম, তাঁর যা ইচ্ছা সেটাই হুকুম করবেন আর অন্যরা তা মেনে চলবে। বরং আমীর শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো, অবশ্যই আমীরের সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত; তবে সে সিদ্ধান্ত হতে হবে জনগণের সেবার উদ্দেশ্যে, অধীনস্থদের সুখ-শান্তি, উন্নতি-সমৃদ্ধির জন্যই নিবেদিত হবে তাঁর সকল ফয়সালা।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক হতে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী (রহ.) আল্লাহ তাঁর দরজা বুলন্দ করুন। তিনি বলেন– পুরুষরা তো এই আয়াত খুব মনে রাখেন– اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَا. পুরুষরা নারীদের উপর কতৃত্ব করবে। আর এই ভাবনা বশতঃ নারীদের উপর শাসন চালায়। আরো মনে মনে ভাবে, নারীরা সর্বদাই পুরুষদের মতানুবর্তী, বিনম্র, অনুগত হওয়া উচিত। আমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক হবে মালিক চাকরের সম্পর্ক। আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। কিন্তু কুরআনে কারীমে তো আরেকটি আয়াত রয়েছে। যে আয়াতটির প্রতি আমরা পুরুষরা ভ্রূক্ষেপ করতে প্রস্তুত নই। আয়াতটি হচ্ছে–

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً. (سُوْرَةُ الرُّوْمِ: ٢١)

'আল্লাহ তা'আলার নির্দশনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি- ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। [সূরা রুম, আয়াত ঃ ২১]

হযরত থানভী (রহ.) বলেন– নিশ্চয়ই স্বামী স্ত্রীর শাসকও অভিভাবক। কিন্তু পাশাপাশি ভালোবাসা ও বন্ধুত্বও থাকা চাই। কাজ- কর্মের শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে তো সে নারীর উপর আধিপত্য করবে। তবে পারস্পরিক সম্পর্ক হবে হৃদ্যতাপূর্ণ, ঠিক বন্ধুর মতো। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মতো নয়। কথাটি একটি উপমা দিয়ে এভাবে বলা যেতে পারে।

দুই বন্ধু মিলে কোথাও সফরে যাচ্ছে। সফরের সুবিধার্থে এক বন্ধু অপর বন্ধুকে আমীর বানাল। তাই বলে এক বন্ধু প্রভু আর অপর বন্ধু ভৃত্য হয়ে যায়নি। বরং সফরের কার্যাদি সুষ্ঠ ও আরামদায়ক হওয়ার স্বার্থে এ ব্যবস্থা। অনুরূপ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের বন্ধু। তাদের দাম্পত্যজীবন সুখময় হওয়ার জন্যে স্বামীকে বানানো হলো 'আমীর'। কাজ-কর্মে ফয়সালা দিবে সে। সেই সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক। তাই বলে সে স্ত্রীর সাথে চাকরসুলভ আচরণ করতে পারবে না। বরং বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার দাবি বজায় রেখে স্ত্রীর সাথে আচরণ করতে হবে। তাকে মনে রাখতে হবে সে শুধু অভিভাবক বা শাসক নয় বরং স্ত্রী তার জীবন সঙ্গিনী বা প্রেয়সীও বটে।

এমন প্রভাব কাম্য নয়

হযরত থানভী (রহ.) আরো বলেন– এখনকার কিছু কিছু ভদ্রলোক মনে করেন, আমরা নারীদের শাসক। তাই আমাদের এতটা প্রভাব থাকা দরকার যেন আমাদের কথা শুনতেই তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। আমাদের সাথে যেন খোলামেলা আলোচনা করার সাহস না পায়।

আমার এক ক্লাশমেটের কথা। সে একবার আমার সাথে আলাপ করছিল। খুব গর্ব নিয়েই বলছিল ঃ 'কয়েকমাস পর যখন আমি বাড়িতে যাই তখন স্ত্রী-সন্তানরা আমার কাছে আসারও সাহস পায় না। কথা বলাতো দূরের কথা'। সে এ কথা বলে খুব গর্ববোধ করছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি যখন ঘরে যান তখন বাঘ-ভল্লুক জাতীয় কিছু বনে যান না কি? নইলে ওরা এতো সন্ত্রস্ত থাকবে কেন? তিনি উত্তর দিলেন ঃ না, তবে আমরা অভিভাবক, শাসক। তাই আমাদের দাপট থাকা উচিত।

মনে রাখবেন, প্রকৃতপক্ষে পুরুষরা নারীদের শাসক এর অর্থ এই নয়, স্ত্রী সন্তান কাছে আসতে ভয় পায়, কথা-বার্তা বলার সাহস পর্যন্ত না পায়। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হতে হবে আন্তরিকতাপূর্ণ, বন্ধুত্বসুলভ। আর সেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত (?) সে কথাই শুনুন–

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হযরত আয়েশা (রা.) কে বললেন– আয়েশা, কখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট আর কখন অসন্তুষ্ট থাক আমি তা বুঝতে পারি। আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বুঝতে পারেন কিভাবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক তখন 'মুহাম্মাদের রব' এই শব্দে কসম খাও। আর যখন তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক তখন 'ইবরাহীমের রব' এই শব্দে কসম খাও। তখন তুমি আমার নাম উচ্চারণ কর না বরং সেই স্থলে ইবরাহীমের (আ.) নাম নাও। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন–

إِنِّيْ لَاأَهْجُرُ إِلَّا إِسْمَكَ - (صحيح البخاري، كتاب الأدب، رقم الحديث ٦٧٧٨)

হে রাসূল ! তখন আমি শুধু আপনার নাম নেই না। এ ছাড়া তো অন্য কিছু তো করি না।

একটু লক্ষ্য করুন! এখানে গোস্বা হচ্ছে কে? হযরত আয়েশা (রা.)। কার প্রতি গোস্বা হচ্ছেন? স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি। অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) মাঝে মধ্যে অভিমান করতেন। আর অভিমান সুলভ এমন কিছু বলতেন যা সহজে বোঝা যেতো যে, তার মনে অভিমান আছে। তবে তাঁর অভিমানকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কর্তৃত্ব পরিপন্থী, শাসনবিরোধী মনে করতেন না। বরং হযরত আয়েশাকে বড় কৌতুক করে বলেছেন যে, তোমার অভিমানী মনোভাব আমার কাছে ধরা পড়ে যায়।

স্ত্রীর অভিমান বরদাশ্‌ত করতে হবে

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এর সম্পর্কে যখন অপবাদ রটানো হলো আল্লাহ মাফ করুন, তখন হযরত আয়েশা (রা.) প্রতিটি মুহূর্ত যাচ্ছিল কিয়ামতসম। উৎকণ্ঠিত ছিলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কথাটি নিয়ে মানুষের মাঝে কানাঘুষা চলছে। উত্তেজনাকর এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হযরত আয়েশাকে বললেন– আয়েশা! দেখো, কথা হচ্ছে, তোমাকে এতো উৎকণ্ঠিত ও চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। তুমি যদি বে-কসুর, নির্দোষ হও তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমার পবিত্রতার কথা জানিয়ে দিবেন। 'আল্লাহ না করুন' তোমার অসাবধানতায় কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আল্লাহর দরবারে তাওবা কর, ক্ষমা প্রার্থনা কর! আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিবেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.) কে শান্তনা

দেয়ার লক্ষ্যে সম্ভাব্য দুটি দিক তাঁর কাছে তুলে ধরেছেন। কিন্তু কেন তিনি সম্ভাব্য দুটি দিকের বর্ণনা দিলেন, এটা ছিল হযরত আয়েশা (রা.) এর জন্য বড়ই কষ্টকর, অসহ্য কারণ। এতে বোঝা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মনেও ক্ষীণ সন্দেহের আভাসের উদ্রেক ঘটেছে। তিনিও মনে করেন, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এ ধরনের বিচ্যুতি ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই ক্ষীন সন্দেহ হযরত আয়েশাকে দারুণভাবে মর্মাহত করে। তাই তিনি বিধ্বস্ত মনের আর্তি সহ্য করতে না পেরে শুয়ে পড়েন। ঠিক তখনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়। এতে হযরত আয়েশা (রা.) কে নির্দোষ নিস্পাপ ঘোষণা দেয়া হয়। তখন হযরত আবু বকর (রা.)ও ঘরে উপস্থিত ছিলেন। আয়াত শ্রবণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রা.) খুবই প্রফুল্লিত হন এবং মন্তব্য করেন,'ইনশাআল্লাহ আজ থেকে এই অপবাদ সম্পূর্ণ মিটে যাবে এ সময়ে আবু বকর (রা.) আয়েশা (রা.) কে ডেকে বললেন– আয়েশা! শোন, শুভসংবাদ শোন, আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতার বর্ণনা দিয়ে আয়াত নাযিল করেছেন। এবার ওঠো! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম কর! কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) উঠছেন না। চোখ বুজে আছেন বিছানায় নির্বাক হয়ে। তিনি তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত শুনলেন যাতে তাঁর পবিত্রতার কথা আলোচনা করা হয়েছে এবং শুয়ে শুয়েই বললেন– এতো আল্লাহ তা'আলার দয়া ও আনুকম্পা যে তিনি আমাকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করেছেন। তাই আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না। কৃতজ্ঞতা জানাতে হলে তাকেই জানাবো। যেহেতু আপনাদের ধারণা তো ছিলো, আমি ভুল করে বসে আছি।

[সহীহ বুখারী, কিতাবুত-তাফসীর, হাদীস -৭০৫]

উল্লেখ্য, হযরত আয়েশা (রা.) দৃশ্যত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে দাঁড়াতে অস্বীকার করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে কিছু মনে করেননি। কারণ এ ছিল জীবন সঙ্গিনী হযরত আয়েশা (রা.) এর অভিমান, দাম্পত্যজীবনের এই মান-অভিমান আন্তরিকতারই বহিঃপ্রকাশ। নবী জীবনের এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে, দাম্পত্যজীবন শুধুই শাসক শাসিতের জীবন নয় ; বরং প্রেমময় বন্ধুত্বের অনস্বীকার্য অংশও বটে। আর ভালোবাসার দাবিতে স্বামীদেরকেও সইতে হবে স্ত্রীদের মান অভিমান। হ্যাঁ, একান্ত স্পষ্ট কোনো বিচ্যুতি ঘটে গেলে সে ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগও হতেন, তাই বলে শাসকীয় ভঙ্গিতে চটে যেতেন না।

স্ত্রীর মন খুশী করা সুন্নাত

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে একান্ত মধুর, বন্ধুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের নমুনা কেমন ছিলো? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রথমে চোখ রাখতে হবে তাঁর মর্যাদার প্রতি। তিনি মানবতার মহান মুক্তির দূত, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তাঁর সম্পর্ক ছিলো আল্লাহর সাথে সুনিবিড়। নির্মল ও নিরলস সম্পর্ক। আল্লাহর সাথে সরাসরি আলোচনা ও কথাবার্তা হয় তাঁর। মর্যাদার এই চূড়ান্ত আসনে আসীন হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় জীবন সঙ্গিনীদের সাথে আন্তরিকতার কমতি নেই। বরং তাদের মনখুশী করার প্রতি তিনি সদা সচেষ্ট। স্ত্রীর মনখুশী করার জন্যে রাতের বেলা হযরত আয়েশা (রা.) কে প্রাচীন আরবের এগার রমণীর গল্প শুনিয়েছেন। বলেছেন–

আয়েশা, শোন ইয়ামানে এগার জন মহিলা ছিলো। একবার তারা সিদ্ধান্ত করলো, তারা সবাই নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করবে। তাদের স্বামী বাস্তবে কেমন, তাই বলবে খোলামেলা ভাবে। তারপর তারা নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা তুলে ধরে সুন্দর উপস্থাপনায়। তাদের কথায় ভাষার অলংকার ছিলো, সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ ছিলো, ছিল বর্ণনার সুনিপুণ ভঙ্গি। এভাবে তিনি বিশাল কিচ্ছাটি হযরত আয়েশা (রা.)-কে শুনিয়েছিলেন। একেই তো বলে আদর্শ দাম্পত্যজীবন!

[শামায়েলে তিরমিযী, বাবু মা-জা-আ ফী কালামি রাসূলিল্লাহি (সা.) ফিস সামার, হাদীসু উম্মিযারা]

স্ত্রীর সাথে হাসি-ঠাট্টা করা সুন্নাত

হযরত সাওদা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনসঙ্গিনী। সকল মুমিনের জননী। আজ তাঁর ঘরেই অবস্থান করছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সেদিন হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য কিছু হালুয়া পাকিয়েছিলেন। তাই নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন হযরত সাওদা (রা.) এর ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে। যত্নসহকারে তা পরিবেশন করলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে। পাশেই বসা ছিলেন হযরত সাওদা (রা.)। তাই তাঁকে বললেন– আপনিও খান। ব্যাপারটি হযরত সাওদা (রা.) ভাবলেন, আজ তো হুযূর আমার ঘরে থাকার পালা। আজকে আয়েশা হালুয়া রান্না করে এখানে নিয়ে আসবে কেন? একথা ভেবে হযরত সাওদা (রা.) স্পষ্টভাবে বলে দিলেন ঃ না, আমি খাবো না। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন– খান, নইলে কিন্তু মুখে মাখিয়ে দেব। হযরত সাওদা বললেন– না, আমি খাবো না। আর তখনই

হযরত আয়েশা সামান্য একটু হালুয়া নিয়ে সাওদার মুখে লেপে দিলেন। এবার হযরত সাওদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট অভিযোগ পেশ করলেন, বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আয়েশা আমার চেহারায় হালুয়া মাখিয়ে দিয়েছে। অভিযোগ শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন–

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا .

অর্থাৎ, কেউ যদি তোমার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে তুমিও তার সাথে সেরূপ আচরণ করতে পার। সুতরাং সে যখন তোমার মুখে হালুয়ার প্রলেপ মাখিয়েছে তুমিও তার সাথে সেরূপ হালুয়া মাখিয়ে দিতে পার। তার পর সাওদা একটু হালুয়া হাতে নিয়ে হযরত আয়েশার চেহারায় মাখিয়ে দেন। কী অদ্ভুত দৃশ্য! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুই জীবন সঙ্গিনী! একে অন্যের চেহারায় হালুয়া মাখামাখি করছেন, আর এসব ঘটছে স্বয়ং প্রিয়নবীর সামনে। আর তিনি তা দেখছেন আনন্দের সাথে!

ইতোমধ্যে দরজায় কোনো আগন্তুকের কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেলো। জিজ্ঞেস করা হলো কে? উত্তর এলো, আমি উমর (রা.) উমরের আগমন সংবাদ শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– তোমরা মুখ পরিস্কার করে এসো উমর (রা.) আসছেন। তাঁরা বাইরে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলেন (দ্রঃ সম্ভবত তখনও পর্দার বিধান নাযিল হয়নি। [মাজমাউয- যাওয়াইদ, হায়ছামী, খণ্ড ৪ পৃ. ৩১৬]

সেই মহান ব্যক্তিত্ব যিনি আল্লাহর সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখেন। সর্বদা বাক বিনিময় হয় আল্লাহর সাথে। যাঁর কাছে নিয়মিত ওহীর আগমন হয়। আল্লাহর কাছে যার চাইতে শ্রেষ্ঠ সত্তা এই জমিনের বুকে নেই। যিনি সৃষ্টির সর্বসেরা তিনিও তাঁর স্ত্রীদের সাথে এতটা সাদামাটা আচরণ করেন। তাদেরকে খুশী করতে তিনিও এতটা যত্নবান, সচেষ্ট।

মাক্বামে হুযূরী

'হুযূরী' বা আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তিনি সবসময় আমাকে দেখতে পাচ্ছেন এই শব্দগুলো আমরা প্রায়ই বলে থাকি। অথচ তার রহস্য বা হাকীকত আমাদের কিন্তু জানা নেই। যে জীবনে এক বার এর স্বাদ পেয়েছে সেই শুধু বলতে পারবে এটা কী জিনিস! হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) প্রায়ই বলতেন– কখনো কখনো আল্লাহর উপস্থিতির ফিকির তীব্র হয়ে উঠে। যার ফলে

আল্লাহর কোনো কোনো বান্দাহ পা ছড়িয়ে পর্যন্ত শয়ন করেন না, সোজা হয়ে শয্যা গ্রহণ করে না। কারণ, তার মনে হয়, সর্বক্ষণ আল্লাহ তার সম্মুখে বিরাজমান; সে তাকে দেখছেন। আর দুনিয়াতে কোনো বড় মানুষের সামনে তো কেউ পা ছড়িয়ে শোয়না, তাহলে আল্লাহর সামনে কী ভাবে পা ছড়িয়ে রাখবে?

আমাদের প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো ছিলেন 'মাক্বামে হুযূরী' র সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। রাব্বুল আলামীনের উপস্থিতির খেয়াল যার হৃদয় মানসে সর্বদা অনুভূত হত। এতদসত্ত্বেও স্বীয় জীবনসঙ্গিনীদের সাথে কত সহজভাবে চলেছেন তিনি, হাস্যরস করছেন কতো খোলামেলাভাবে উদারচিত্তে। সত্যিই এ শুধু নবীর মতো কোনো মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব।

অন্যথায় সংসার উজাড় হয়ে যাবে

হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু পুরুষকে অভিভাবক বানিয়েছেন। সুতরাং তার সিদ্ধান্তই মেনে চলতে হবে। তবে নারীরা তাদের অভিমত ও পরামর্শ ব্যক্ত করতে পারবে, পাশাপাশি পুরুষদেরকেও বলা হয়েছে তারা নারীদের মনখুশী করার প্রতি সচেষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক পুরুষই, নারী নয়। নারী যদি একথাগুলোর প্রতি উদাসীনতা দেখায়, সে যদি মনে করে,সব বিষয়ে আমার কথাই হবে একমাত্র কথা, আমিই হবো সংসারের অভিভাবক, পরিচালক,পুরুষ হবে আমার পরিচালনাধীন তাহলে মনে রাখতে হবে এটা প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত বিধির পরিপন্থী, শরীয়তের খেলাফ এটি। আর যুক্তি তর্ক এবং ইনসাফ ও স্বীকার করে না এ সিদ্ধান্ত। নারী যদি এমনটি করে, তাহলে সংসার বিরান হয়ে যাবে। নিশ্চিত ভেঙ্গে পড়বে পারিবারিক কাঠামো।

নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

এ সুবাদে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল্লামা নববী (রহ.) বলেছেন–

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ .

.... নেককার স্ত্রীরা হন অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তা হেফাযত করে।

এই আয়াতটিতে সৎ নারীদের আচরণ কেমন, তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে। সৎ নারীদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা আল্লাহর অনুগত হয়। তাদের

স্বামীদের বেলায় তাদের উপর যে দায়- দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা তারা সঠিক ভাবে পালন করে। সর্বোপরি স্বামীর অনুপুস্থিতিতে তার ঘরের মাল-পত্র সংরক্ষণ করে এ নারীরাই। পবিত্র কুরআন মতে এগুলো একজন সৎ নারীর অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ এক অলংঘনীয় বিধান।

স্বামীর অবর্তমানে তার ঘর সংসারের হেফাযত করবে স্ত্রী। ঘর সংসার হেফাযত করার অর্থ হলো, প্রথমতঃ সে নিজেকে হেফাযত করবে, কোনো প্রকার পাপ কাজে জড়িত হবে না সে। দ্বিতীয়তঃ স্বামীর আসবাবপত্রের সংরক্ষণ করবে। হাদীস শরীফে এসেছে–

اَلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا (صَحِيْحُ الْبُخَارِىُ، كِتَابُ الجمعة، بَابُ الجمعة فى القرى والمدلن ـ (رقم الحديث ٧٩٣)

অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামীর ঘরের রক্ষক। স্বামীর মালপত্রের দেখাশোনা ও সংরক্ষণ করার দায়িত্ব স্ত্রীর কর্তব্য নয়। তবে স্বামীর ধনসম্পদ যেন অযথা খরচ না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা স্ত্রীর দায়িত্ব। এটা পরিস্কার কুরআন শরীফের বক্তব্য।

আইনের রুক্ষ বাঁধনে জীবন চলতে পারে না

একটু পূর্বে বলেছিলাম, রান্না-বান্নার দায়িত্ব স্ত্রীর নয়। এ হলো একটি আইনের কথা। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, আইনের রুক্ষ বাঁধনের উপর নির্ভর করে তো জীবন চলা কঠিন। তাই আইনের দৃষ্টিতে যেমনিভাবে একথা বলা যায়, বাড়ির রান্না-বান্নার দায়িত্ব স্ত্রীর নয়, তেমনি একথাও বলা যায়, স্ত্রীর অসুস্থতায় তার চিকিৎসা সেবা, মেডিকেল খরচাদান স্বামীর অপরিহার্য কর্তব্য নয়। স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে বেড়াতে কিংবা মা-বাবার সাক্ষাতের জন্যে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব স্বামীর নয়। স্ত্রীর মা-বাবা তাদের মেয়েকে দেখতে এলে তাদের অতিথি সেবা, আপ্যায়ন করাও স্বামীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুলত ঃ এসবই হলো আইনের উত্তাপ নির্দেশ। বরং ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ এ পর্যন্তও বলেছেন ঃ স্ত্রীর মা-বাবা সপ্তাহে মাত্র একবার আসতে পারবে। তাও দূর থেকে সাক্ষাত করে চলে যাবে। তাদেরকে ঘরে বসিয়ে সাক্ষাত করতে দেয়া স্বামীর অপরিহার্য দায়িত্ব নয়।

এসব আইনের বিস্বাদ মার-প্যাচের উপর ভিত্তি করে জীবন সংসার টিকে থাকতে পারে না। বরং সুখ-শান্তি তখনই আসবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যখন আইনের চৌহদ্দি অতিক্রম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

সুন্নাতের উপর চলতে সচেষ্ট হবে। স্বামীরা যখন অনুসরণ করবেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত, আর স্ত্রীরা যখন চলবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন সঙ্গিনী উম্মত জননীগণের পথে, তখন আসবে সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি।

স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর অর্থের প্রতি দরদ থাকতে হবে

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেছেন– স্বামীর ধন সম্পদের প্রতি দরদ থাকা স্ত্রীর দায়িত্বের শামিল। স্ত্রীকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, স্বামীর টাকা পয়সা যেন অযথা খরচ না হয়। অপচয় যেন না হয় তার ধন-সম্পদ। স্বামীর অর্থ কড়ি যথেচ্ছা খরচ করা মোটেই উচিত হবে না। তদ্রূপ ঘরের সব দায়-দায়িত্ব চাকর বাকরদের উপরও ছেড়ে দেয়া যাবে না। যদি কোনো স্ত্রী এমনটি করে তবে সে আইনের খেয়ানত করলো।

এমন নারীর উপর ফেরেশতাদের লা'নত

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَئَتَهُ إِلٰى فِرَاشِهٖ فَأَبَتْ اَنْ تَجِيْئَ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَ ئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ ـ (صَحِيْحُ الْبُخَارِىُ، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ إِذَا بَاتَتْ إِمْرَأَةٌ مهَا جِرَة فراش زوجها ـ رقم الحديث : ٥١٩٣)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যখন কোনে স্বামী তার স্ত্রীকে তার বিছানার প্রতি ডাকে আর স্ত্রী যদি তাতে অসম্মতি জানায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা লা'নত করতে থাকে।

স্বামী স্ত্রীকে স্বীয় বিছানার প্রতি ডাকা' এটি একটি পরোক্ষ কথা। যার অর্থ হলো, স্বামী স্ত্রীকে বিশেষ কাজের প্রতি আহবান করা। কিন্তু স্ত্রী যদি সে আহবানে সাড়া না দেয়, কিংবা এমন কোনো আচরণ করে যা দ্বারা স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত লা'নত দিতে থাকে। আর লা'নত দেয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকার দু'আ করা।

যেহেতু স্বামী স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে ইসলামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাদের দাম্পত্যজীবন যেন সুখ ও শান্তিময় হয় সেজন্যই স্বামী স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্কের প্রতি এতটা গুরুত্ব। যার উপর ভিত্তি করে যেন স্বামী পবিত্র থাকতে পারে, রক্ষা করতে পারে তার চারিত্রিক সততা, আর চারিত্রিক এ পবিত্রতা বিবাহের একটি অন্যতম লক্ষ্য। যেন বিয়ের পর স্বামীকে অন্যদিকে অন্যায় দৃষ্টিতে তাকাতে না হয়। তাই স্ত্রীদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা এমন অযত্ন ও খামখেয়ালীপনা দেখাবেনা যাতে তাদের এ বৈবাহিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তাহলে ফেরেশতাগণ এ নারীর প্রতি সারা রাত অভিসম্পাত করবেন। এটাই আলোচ্য হাদীসটির সারমর্ম। অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে–

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ ـ (صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ، كِتَابُ النِّكَاحِ ـ حديث : ٥١٩٤)

যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে অন্যত্র রাত কাটায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত তার প্রতি লা'নত করতে থাকে।

গভীরভাবে একটু লক্ষ্য করুন, এখানে ছোট্ট একটি কথা বলা হয়েছে। স্বামী তার স্ত্রীকে মানবিক চাহিদা পূরণের জন্যে ডাকলো, সে ডাকে সাড়া দিলো না অথবা এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করল যাতে স্বামীর চাহিদা অপূর্ণ রয়ে গেলো। তাহলে পুরো রাত এই মহিলার প্রতি বর্ষিত হবে অভিশম্পাত। অনুরূপভাবে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যদি কোনো মহিলা বাইরে যায় তাহলে যতক্ষণ সে ঘরের বাইরে থাকবে ততক্ষণ তার উপর লা'নত বর্ষিত হতে থাকবে। আর এসব আচরণবিধি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। মূলতঃ এসব ছোট-খাটো বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিবারে ঝগড়া কলহ সৃষ্টি হয়। জ্বলে উঠে অশান্তির দাবানল।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা যাবেনা

وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَايَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِىْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ لَاتَأْذَن الْمَرْأَة فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا ـ الحديث : ٥١٩٥)

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– স্বামী বাড়িতে থাকাবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে (নফল) রোযা রাখা হালাল নয়। তার অনুমতি ছাড়া অন্য লোককে তার ঘরে আসার অনুমতি দেয়া তার জন্য হালাল নয়।

হাদীসটির সারমর্ম হলো, যদি কোনে মহিলা নফল রোযা রাখতে চায় তাহলে স্বামীর অনুমতি লাগবে। যদিও নফল রোযা সম্পর্কে হাদীস শরীফে অনেক ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এখানে সে নফল রোযা নিষিদ্ধ করার কারণ হলো, হয়তো এই নফল রোযা দ্বারা স্বামীর কষ্ট হবে। তাই রোযা রাখতে চাইলে প্রথমে স্বামীর অনুমতি চেয়ে নিতে হবে। তবে হ্যাঁ, বিনা কারণে স্ত্রীকে নফল রোযা রাখতে বাধা দেয়া ঠিক হবে না। তাই কোনো কারণ না থাকলে অনুমতি দেয়াটাই উচিত। মাঝেমধ্যে এ নিয়ে স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করে বসে। স্ত্রী বলে– আমি রোযা রাখব, আর স্বামী বলে– না, আমি তোমাকে রোযা রাখার অনুমতি দেবো না। তাই স্বামীর জন্যে উচিত হবে, স্ত্রীকে এ রোযা রাখতে বাধা না দেয়া। পাশাপাশি স্ত্রীকেও লক্ষ্য রাখতে হবে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা না রাখা। কারণ নফল রোযার চাইতে স্বামীর নির্দেশ পালন করাই তার জন্য অধিক ফযীলতপূর্ণ।

স্বামীর আনুগত্য করা নফল রোযার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং রোযা রাখার মাধ্যমে স্ত্রী যে সাওয়াবের অধিকারিনী হতো, স্বামীর আনুগত্যের মাধ্যমে সে তার চাইতে অধিক সাওয়াব লাভ করবে। স্ত্রী এ ধারণা করা অনুচিত হবে যে, আমি রোযা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। বরং তাকে মনে রাখতে হবে, সে রোযা পালন করছে কার জন্য? তার রোযার উদ্দেশ্য তো সাওয়াব অর্জন করা এবং আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা, আর সে আল্লাহর সন্তুষ্টিতো এখানে স্বামীর কথা মানার মাঝেই। তাই যে সাওয়াব তার অনাহারের মাধ্যমে অর্জিত হতো সেই সাওয়াব খোদা চাহে তো অর্জিত হবে এখন পানাহারের মাধ্যমে।

সাংসারিক কাজের বিনিময় সাওয়াব

আমরা মনে করি, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের কর্মকাণ্ড দুনিয়াবী ব্যাপার। নফসের চাহিদা পূরণই এর মূলকথা। বাস্তবে কিন্তু এমনটি নয়। বরং

এটা দ্বীনী ব্যাপারও বটে। কারণ কোনো স্ত্রী যদি মনে করে স্বামীর ব্যাপারে আমার উপর আরোপিত এই হুকুম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য হলো, স্বামীকে খুশী করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা। এ ফিকিরের মাধ্যমে যদি কোনো স্ত্রী দাম্পত্যজীবনের সকল দায়িত্ব পালন করে যায়, তাহলে এ সংশ্লিষ্ট সব কাজই ইবাদতে পরিণত হবে। মেয়েরা সংসারের যেসব কাজ-কর্ম করে, তারা যদি এগুলো স্বামীর সন্তুষ্টির জন্যে করে তাহলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কৃত সমস্ত কাজ সাওয়াবের কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে এবং আল্লাহর দরবারে এর প্রতিদানও মিলবে। ঘরকন্নার কাজ, ঘরবাড়ি তত্ত্বাবধায়ন, সন্তানের লালন-পালন এবং স্বামীর সাথে হাসি কৌতুক ও মিষ্টভাষণেও তখন সাওয়াবের যোগ্য হয়ে যায়। বিশুদ্ধ নিয়তের বরকতে এসব কাজেরও প্রতিদান পাওয়া যায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে।

জৈবিক চাহিদা পূরণেও তখন সাওয়াব পাওয়া যাবে

স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পূরণেও সাওয়াব পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে হাদীসে বলেছেন– স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে পারস্পরিক মেলামেশা হয়, আল্লাহ তা'আলা এতেও সাওয়াব দান করেন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সব তো মানুষ তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য করে থাকে। তাদের কামতাড়িত এসব কাজেও কি আবার সাওয়াব আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– দেখ, তারা তাদের এই চাহিদা যদি হারাম উপায়ে পূরণ করে তাহলে তাতে গুনাহ হয় কি? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই হয়! এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন– স্বামী- স্ত্রী যেহেতু হারাম পথ পরিত্যাগ করে আমার নির্দেশিত হালাল পন্থায় প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করে আমার নির্দেশ পালনার্থেই ; তাই তাদের এ কাজের ও প্রতিদান পাবে। [মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল]

আল্লাহ তা'আলা উভয়কে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন

একটি হাদীসে আছে, হাদীসটি অবশ্য আমি হাদীসের কিতাবে পড়িনি তবে হযরত থানভী (রহ.) এর মাওয়ায়ে পড়েছি। হাদীসটি হলো, কোনো স্বামী ঘরে প্রবেশ করে তার স্ত্রীর প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকালো আর স্ত্রীও তার প্রতি তাকালো ভালোবাসার দৃষ্টিতে, তখন আল্লাহ তা'আলাও তাদের উভয়ের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। অতএব জেনে রাখা উচিত, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু

দুনিয়াবী কোনো বিষয় নয়, বরং এটি পরকালে জান্নাত ও জাহান্নাম প্রাপ্তির অন্যতম মাধ্যমও বটে।

রোযা কাযা করার সময়ও স্বামীর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে

প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ তিরমিযী শরীফের একটি হাদীস। যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)। তিনি বলেন– স্বভাবজাত অপারগতার কারণে রমযানের যেসব রোযা ছুটে যেত সেগুলো সাধারণত পরবর্তী শা'বান মাসেই আমি পালন করতাম। অর্থাৎ প্রায় এগার মাস পর। আমি এমনটি করার কারণ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বান মাসে খুব রোযা রাখতেন, তাই আমিও রোযা রাখতাম। কারণ, হুযুর বেরোযা অবস্থায় আমি রোযা রাখবো– এর চাইতে হুযূরের রোযা অবস্থায় রোযা রাখাটি উত্তম। লক্ষনীয় বিষয় হলো, হযরত আয়েশা কোনো নফল রোযার কথা বলছেন না, বরং রমযানের রোযার কথা বলছেন। আর কাযা রোযার বিধান হলো,যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায় করতে হয়। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কষ্ট হবে ভেবে এতটা বিলম্ব করে কাযা রাখতেন।

[মুসলিম শরীফ, কিতাবুস সাওম, বাবু ক্বাযাই রামাযান ফী শা'বান, হাদীস নং ১১৬৬]

স্ত্রী স্বামীর ঘরে কাউকে প্রবেশের সুযোগ দিতে পারবে না ইতোপূর্বে যে হাদীসটি আলোচনা করেছিলাম তার দ্বিতীয় অংশ হলো–

وَلَا تَأْذَنُ فِىْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

স্ত্রীর এটাও একটা দায়িত্ব, স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ঘরে অন্য কাউকে প্রবেশের সুযোগ দিতে পারবে না কিংবা স্বামী অপছন্দ করে এমন ব্যক্তিকে ঘরে আসার অনুমতি দিতে পারবে না। এমন ব্যক্তিকে আসার অনুমতি দেয়া স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ অবৈধ বা হারাম। অন্য হাদীসে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আরো সবিস্তারে–

اَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلَا يَأْذَنَّ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ (جَامِعُ التِّرْمِذِىْ، كِتَابُ الرِّضَاعِ، بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمَرْأَةِ عَلٰى زَوْجِهَا حديث : ١١٦٣)

'জেনে রেখো! তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের কিছু অধিকার আছে,আর তাদেরও তোমাদের প্রতি কিছু অধিকার আছে। অর্থাৎ, উভয় শ্রেণীরই একের উপর অন্যের অধিকার আছে। যে অধিকারের প্রতি যত্ন নেয়া উভয়েরই কর্তব্য। আর সে অধিকার কি? এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসটিতে বলেছেন– 'হে পুরুষ জাতি! তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের অধিকার হলো, তারা তোমাদের শয্যা এমন লোককে ব্যবহার করতে না দেয়া যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর। আর তোমাদের ঘরে এমন লোককে আসতে না দেয়া যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর না।' সুতরাং আলোচ্য হাদীসটিতে দুটি অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

(এক) স্ত্রীর অবশ্যপালনীয়ও দায়িত্ব কর্তব্য হলো, স্বামী পছন্দ করে না এমন কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে দিবে না। এমনকি স্ত্রীর কোনো স্বজনও যদি স্বামীর নিকট অপছন্দনীয় হয় তাকেও ঘরে আসার অনুমতি স্ত্রী দিতে পারবে না। স্ত্রীর মা-বাবাই শুধু সপ্তাহে একবার এসে মেয়েকে দেখে যেতে পারবেন। এতটুকুতে স্বামী বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু তার অনুমতির প্রয়োজন, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী তার মা-বাবাকেও ঘরে থাকতে দেয়া জায়েয নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবেই বলেছেন– যাকে স্বামী পছন্দ করে না সে যে কেউই হোক না কেন, ঘরে আসার অনুমতি নেই।

হাদীসের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, স্ত্রীরা যেন তোমাদের বিছানা এমন কাউকে ব্যবহার করতে না দেয় যাকে তোমরা দেখতে পারো না। বিছানা ব্যবহার নিষিদ্ধ মানে সবরকমের ব্যবহারই এর অন্তর্ভুক্ত। এতে তারা বসতে পারবে না, শুতে পারবে না এবং ঘুমোতেও পারবে না।

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনসঙ্গিনী। বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী। আর সাহাবায়ে কেরামের জীবনী তো এমনিতেই নূরে ভরপুর। হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) ছিলেন আবু সুফিয়ানের আদুরে কন্যা। যে আবু সুফিয়ান প্রায় একুশ বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে লড়েছেন। তিনি ছিলেন মক্কার শীর্ষস্থানীয় নেতা। সবশেষে তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। এটা আল্লাহর কুদরতের আজব খেলা যে, এত বড় কাফেরের মেয়ে উম্মে হাবীবাহ ও তাঁর স্বামী উভয় ইসলাম গ্রহণ করেন। কন্যা ও জামাতার ইসলাম গ্রহণ নেতা আবু

সুফিয়ানের জন্যে ছিল ভীষণ অসহ্য ও কষ্টকর। তাঁর হৃদয়ে যেন আগুন জ্বলছিলো, কোনোভাবেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, কন্যা জামাতার ইসলাম গ্রহণ। তাই আবু সুফিয়ান সর্বদা তাদেরকে কষ্ট দেয়ার ফিকিরে থাকতেন। তাদেরকে নির্যাতন করার ব্যাপারে ছিলো সে সদা সচেষ্ট, এক পায়ে খাড়া। সেই সময়ে অনেক মুসলমান কাফেরদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। সেই হাবশায় হিজরতকারীদের মধ্যে উম্মে হাবীবাহ (রা.)ও তাঁর স্বামীও ছিলেন। তাই তারা হাবশাতেই বসবাস করছিলেন।

কিন্তু আল্লাহর কী আশ্চর্য মর্জি! কুদরতের কী আজব কাণ্ড। হাবশাতে বসবাসকালীন সময় হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) একটি খাব দেখলেন। আজব খাব। তিনি দেখলেন, তাঁর স্বামীর আকৃতি বদলে গেছে সম্পূর্ণভাবে। বিকৃতি ঘটেছে তার সর্বাঙ্গে। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন খুবই শংকা বোধ করতে লাগলেন উম্মে হাবীবাহ (রা.)। তিনি ভাবনায় পড়ে গেলেন, আমার স্বামী ধর্ম বিশ্বাসে ক্রটি-বিচ্যুতি আসেনি তো? কিছু দিন না যেতেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বাস্তবে রূপ নিলো। দেখাগেল, তার স্বামী আসা-যাওয়া করে এক খ্রিষ্টান পাদ্রীর কাছে। যার অনিবার্য-ফলস্বরূপ তার হৃদয় থেকে নিভে গেছে ইসলামের প্রদীপ। মনে-প্রাণে সে এখন একজন পাক্কা খ্রিস্টান।

একথা শুনতেই বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.)-এর। কারণ যে ইসলামের জন্য মা-বাবা, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছেন, নির্বাসিত হয়েছেন, যে ইসলামের খাতিরে অজানা-অচেনা এক নতুন দেশে, অবশেষে যে স্বামীই ছিলো তার একমাত্র সুখ-দুঃখের সাথী, ব্যথা-বেদনার অংশীদার-আজ কি-না সেও কাফের হয়ে গেলো।

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) এর উপর দিয়ে কিয়ামত গুজরে গেলো। এভাবে কিছু দিন যেতে না যেতেই তাঁর স্বামী মারা গেলো। বড় অসহায় হয়ে গেলেন হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) তাঁর সুখ-দুঃখ জিজ্ঞেস করার মতো আর কেউ নেই।

হুযূর (সা.)-এর সাথে বিবাহ

এদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন তখন সংবাদ পেলেন উম্মে হাবীবার এই শোকাবহ ঘটনার। জানতে পারলেন, তাঁর অসহায়ত্বের কথা। তাই তিনি হাবশার তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান নাজাশাদে এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন, যেহেতু হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.)

সেথায় নিঃসঙ্গ অসহায়, তাই আমার পক্ষ থেকে তাঁকে বিয়ের পয়গাম দাও। অতঃপর নাজাশীর বাদশা তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে।

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) নিজেই তাঁর ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে। চরম অসহায়ত্বের এই সময়ে একদিন বসে আছি আমার ঘরে। পরদেশী ঘর। হঠাৎ দরজায় কোনো আগন্তুকের শব্দ শুনতে পেলাম। দরজা খুললাম। দেখলাম এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। জানতে চাইলাম, সে কোত্থেকে এসেছে? সে জবাব দিলো, আমাকে হাবশার বাদশাহ নাজাশী পাঠিয়েছেন। (এই সেই নাজাশী যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়ে গিয়ে ছিলেন) উম্মে হাবীবাহ আবার জানতে চাইলেন, কেন পাঠিয়েছেন? সে বললো– আমাকে এই জন্য পাঠিয়েছেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাবশার বাদশাহ নাজাশীর মাধ্যমে আপনার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। হযরত উম্মে হাবীবাহ বলেন– এই শব্দগুলো যখন আমার কর্ণগোচর হচ্ছিলো তখন আমি এতটা আনন্দিত-উৎফুল্ল ও আবেগাপ্লুত হয়েছিলাম, আমার কাছে উপস্থিত যা ছিল আমি সে বার্তাবাহক মহিলাটির হাতে তাই তুলে দিলাম। বললাম, তুমি আমার মহা আনন্দের সংবাদ বয়ে এনেছো। তাই তোমাকে এই উপহার। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আর উম্মে হাবীবাহ (রা.) হাবশায় এ অবস্থায়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়ে গেলো। কিছুদিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মদীনায় নেয়ার ব্যবস্থা করেন।

[আল ইসাবাহ, ফী তাময়ীযিস্ সাহাবাহ, খণ্ড ৪, পৃ. ২৯৮]

রাসূল (সা.)-এর বহু বিবাহের কারণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিক বিয়ে করেছিললেন। তাঁর এই বহু বিবাহকে কেন্দ্র করে ইসলাম বিদ্বেষীদের নানা রকম মন্তব্য। অবশ্যই তাদের জানা নেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিটি বিবাহের পিছনে কত বড় বড় রহস্য লুক্কায়িত ছিলো। আমরা শুধু হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.)-এর বিয়ের ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে অনুমান করতে পারি যে, হযরত উম্মে হাবীবার (রা.) কত অসহায়ত্বে জীবন যাচ্ছিল। এক নিঃসঙ্গ অসহায় ছিল তাঁর জীবন যাত্রা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাকে বিয়ে না করে তার অসহায়ত্ব ও বিধবা জীবনের অবসান না ঘটাতেন তাহলে কী ঘটতো

তার জীবনে কে জানে? তাঁর চরম এ দুর্যোগের মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। তাকে ঠিকানা করে দিলেন নিজের পাশে, ডেকে আনলেন পবিত্র শহর মদীনায়।

অমুসলিমের মুখে আমাদের প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রশংসা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষত্ব ও মুজিয়া, তিনি হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) কে বিয়ে করার সাথে সাথেই এই খবর মক্কায় ছড়িয়ে পড়লো। হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.)-এর পিতা আবু সুফিয়ান ও তখন তো বদ্ধ কাফের এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘোরবিরোধী। যখন তিনি এসংবাদ শুনলেন, তখন মনের অজান্তেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো একটি অদ্ভুত ধ্বনি, তিনি বলে উঠলেন, এতো আনন্দের সংবাদ। কারণ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এমন ব্যক্তি নন যাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যায়। কাজেই এটা খুশীর বিষয় যে, উম্মে হাবীবাহ (রা.) সেখানে চলে গেছে।

ভঙ্গ করলো অঙ্গীকার

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু সুফিয়ানের সাথে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক চুক্তির কথা সীরাতগ্রন্থগুলোতে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এক বছর পর্যন্ত আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কাফেররা এ চুক্তি রক্ষা করে চলেছিলো, কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই তারা চুক্তি ভঙ্গ করতে শুরু করে, যে কারণে শেষ পর্যন্ত নবীজী (সা.) ঘোষণা দেন, আমরা এখন থেকে আর এই চুক্তির প্রতি সম্মান দেখাবো না। আমাদের শত্রুরা যখন অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী চলছেনা, তখন আমরা অঙ্গীকার নামা অুনযায়ী চলবো কোন যুক্তিতে? এই ঘোষণা প্রচারিত হবার পর আবু সুফিয়ানের মনে ভীতি দেখা দিলো যে কোনো মুহূতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে মক্কা আক্রান্ত হতে পারে।

আপনি এই বিছানার উপযুক্ত নন

একবার আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরছিলেন। মুসলমানরা জানতে পেরে তাদের কাফেলাকে আক্রমণ করলো। আবু সুফিয়ান অবস্থা বেগতিক দেখে গোপনে রাতের অন্ধকারে এই মনে করে মদীনায় ঢুকে পড়লো যে, আমার মেয়ে তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘরেই আছেন,

কাজেই তাঁর সাথে কথা বললে আমি বেঁচে যাবো। এই ভেবে তিনি গোপনে হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। মেয়ে উম্মে হাবীবাহ (রা.) তাকে স্বাগত জানালেন। বাবা আবু সুফিয়ান যখন ঘরে প্রবেশ করলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিছানা বিছানো ছিলো। ঘরে প্রবেশ করে আবু সুফিয়ান সেই বিছানায় বসতে চাইলেন। ঠিক তখনি হযরত উম্মে হাবীবাহ তড়িৎগতিতে এগিয়ে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানা ভাঁজ করে এক পার্শ্বে রেখে দিলেন। বিষয়টি আবু সুফিয়ানের কাছে বিস্ময়কর মনে হল। তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললেন–

মা এই বিছানা আমার উপযুক্ত নয়, না কি আমি এই বিছানার উপযুক্ত নই?

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) উত্তর দিলেন–

বাবা! আসলে আপনি এ বিছানার উপযুক্ত নন। কারণ, এটি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিছানা। আমি আমার জীবন থাকতে কোনো মুশরিককে এই বিছানায় বসতে দিতে পারি না।

একথা শুনে আবু সুফিয়ান বললেন–

রামলাহ! আমার ধারণা ছিল না তুমি এতটা পাল্টে যাবে। তোমার বাবাকেও তুমি বসতে দিবে না এটা আমি ভাবতেও পারিনি।

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) এ কাজটা তথা নিজের পিতাকে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিছানায় বসতে না দেয়া, মূলতঃ এটা স্ত্রীরা যেন তোমাদের অপছন্দের কাউকে তোমাদের বিছানায় বসতে না দেয়' হাদীসের এই অংশেরই বাস্তব নমুনা

[আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস্ সাহাবাহ্ খণ্ড, ৪ পৃ. ২৯৮ রামলাহ' শব্দ দ্রষ্টব্য]

স্ত্রী সাথে সাথে উপস্থিত হতে হবে

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ . (جَامِعُ التِّرْمِذِيْ كِتَابُ الرِّضَاعِ، بَابُ مَاجَاءَ فِيْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ . حديث ١١٢

হযরত ত্বলক ইব্‌নে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– স্বামী যখন তার স্ত্রীকে প্রয়োজনে ডাকে তখন যদি সে চুলার কাছেও থাকে তবুও স্বামীর আহ্বানে ইপস্থিত হওয়া জরুরী। অর্থাৎ স্বামীর ডাকের সময় স্ত্রী যদি রান্নাবান্নাতেও ব্যস্ত থাকে তবুও স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে হবে। স্বামীর প্রয়োজনে এ ব্যস্ততার মুহূর্তেও অনীহা প্রদর্শন কিংবা উপেক্ষা করা উচিত হবে না।

বিবাহ যৌন-চাহিদা পূরণের সুস্থ পন্থা

এই সকল হুকুমের মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা স্বভাবজাতভাবেই প্রতিটি নারী ও পুরুষের মাঝে যৌন-চাহিদা রেখেছেন। রেখেছেন সৃষ্টিগতভাবে কিছু আবেগ-উচ্ছ্বাস ও চাওয়া-পাওয়া। আর এই স্বভাবজাত কামনা পূরণের একমাত্র বৈধ পথ হলো বিবাহ-শাদী। দাম্পত্যজীবনে এটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত এই চাহিদা ও কামনা পূরণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যেন কোনো নারী-পুরুষ অবৈধ উপায়ে যৌন-চাহিদা পূরণের কল্পনাও করতে না পারে। যেন স্ত্রী স্বামীর স্পর্শে তৃপ্তি খুঁজে পায় এবং পরপুরুষের প্রতি চোখ উঠাবারও প্রয়োজন না পড়ে। আর স্বামীও যেন স্ত্রীর সকাশে শান্তি খুঁজে পায় এবং পর-নারীর প্রতি চোখ তুলেও না তাকায়।

বিয়ে করা সহজ

যেহেতু বিয়ে করার চাহিদা একটি সহজাত ব্যাপার তাই আল্লাহ্ তা'আলা বিয়ে-শাদীর ব্যাপারটিও খুব সহজ করে দিয়েছেন। স্বামী স্ত্রী দু'জন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুল করে নিলেই বিয়ে হয়ে গেলো। এমনকি বিয়ের মাঝে খুতবা পড়াও জরুরী নয়, সুন্নাত। কাজী ডেকে আনা কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে বিয়ে পড়ানোও জরুরী নয়, বরং অন্যকে দিয়ে বিয়ে পড়ানো সুন্নাত। এসব ঝক্কি-ঝামেলায় না গিয়ে যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে একজন আরেকজনকে ইজাব-কবুল-এর মাধ্যমে বরণ করে নেয়, তাহলেও বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

বিবাহের জন্য মসজিদে যাওয়াও জরুরী নয়। তৃতীয় কাউকে মাধ্যম বানানো, তারও প্রয়োজন হয় না। শুধু একজন বলবে, আমি তোমাকে বিয়ে করলাম। আর অপরজন বলবে, আমি কবুল করলাম, দুজন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে একথা বিনিময়কেই বিবাহ বলে। শরীয়ত এই সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে খুব সহজতর করার উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছে।

বরকতপূর্ণ বিবাহ

অন্যদিকে বিবাহের সম্পূর্ণ বিষয়টি সাদাসিধে হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কোনো রুসম রেওয়াজ, শর্ত-শারায়েত কিংবা লম্বা চওড়া আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই। হাদীস শরীফে এসেছে, সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাদের বিয়ে শাদীর চিন্তা ভাবনা করো, যাতে হারাম পথে পা বাড়াবার সুযোগ না পায়। একটি হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً ـ (مسند احمد ـ ٨٢٦)

যে বিবাহে খরচ কম সে বিবাহই অধিক বরকতময়। তাই বিবাহ অনুষ্ঠান খুব সাদামাঠা হওয়াই ভালো। বিয়ে শাদীতে যতো জাকজমক হবে ততো বরকত হ্রাস পাবে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এর বিবাহ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) একজন বিশিষ্ট সাহাবী। আশারায়ে মুবাশশারা তথা বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের একজন তিনি। তিনি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাযির হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টি দিলেন প্রিয় এই সাহাবীর প্রতি। দেখলেন তাঁর জামায় কিছুটা হলুদ রং ঝকঝক করছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে চাইলেন, আব্দুর রহমান! তোমার গায়ে এ কিসের রং? হযরত আব্দুর রহমান আরয করলেন– আমি বিয়ে করেছি। বিয়ের সময় সামান্য সুগন্ধি মাখিয়েছি। এটা সেই সুগন্ধির চিহ্ন। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَعَلَيْكَ؛ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ـ (صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ، كِتَابُ الْبُيُوْعِ، بَابُ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا، رقم الحديث ٢٠٤٨)

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন, ওলীমা কর একটি বকরী দিয়ে হলেও।

এখানে গভীরভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) একজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী। বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর একজন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খুব স্বজন তিনি। অথচ এমন একজন নিকটতম সাহাবীও তার বিবাহ অনুষ্ঠানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত করেননি। এমনকি একটু অবহিতও করেননি। অতঃপর রং দেখে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে চাইলেন, এটা কিসের রং? তাঁর জবাব দিতে গিয়ে বলে দিয়েছেন। আমি বিবাহ করেছি। আর তার জাবব শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিযোগ তুলেননি। বলেননি, তুমি একাই বিয়ে করে ফেললে, আমাদেরকে একটু বললেও না। কারণ, ইসলামে বিবাহ অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম-নীতি নেই, সবিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই।

বর্তমানে বিবাহ এক জটিল বিষয়

সাহাবী হযরত জাবির (রা.)। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি।

[বুখারী শরীফ কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৫০৭৯]

লক্ষ্য করুন, হযরত জাবির (রা.) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন ঘনিষ্ঠতম সাহাবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাঁর ওঠা-বসা ছিলো প্রতিনিয়ত। কিন্তু বিবাহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দাওয়াত দেননি। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে বিবাহ শাদীতে আনুষ্ঠানিকতার কোনো গুরুত্ব ছিল না। আজকাল যেমন বিবাহ শাদী মানেই আনুষ্ঠানিকতার ঝড়-তুফান সেকালে কিন্তু এমন ছিলো না। আর বর্তমানে তো বিবাহ শাদীতে এক মাস পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। গোত্রের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মাঝে অপূর্ব আনন্দ-উত্তেজনার জোয়ার বয়ে যায়। কেমন যেন এসব উপেক্ষা করে কোনো বিবাহ হতে পারে না।

শরীয়ত তো বিবাহ শাদীর ব্যাপারটি খুব সহজ করেছিলো। কিন্তু আমরা অপসংস্কৃতির বেড়াজালে আটকে পড়ে এক দুঃসাধ্য বিষয়ে পরিণত করে ফেলেছি। যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে আমাদের মেয়েরা অবিবাহিতা হয়ে ঘরে পড়ে আছে। কারণ তাকে বিয়ে দেয়ার মতো যৌতুকের টাকা নেই। অভিজাত্যতা অনুযায়ী ভুড়িভোজের সামর্থ্য নেই।

এসব কিছু করতে গিয়ে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। মূলতঃ হিন্দু ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে আমরা এসব রীতি-নীতি ধার করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রদর্শিত পথ আমরা বর্জন করেছি। যার ফলে হালাল ও সততার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আজ হালাল পদ্ধতিতে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে গেলে বহু অর্থ কড়ির মালিক হতে হয়। হতে হয় লাখপতি কিংবা শিল্পপতি। তবেই যেন বিয়ে করা সম্ভব অন্যথায় নয়।

পক্ষান্তরে হারাম ও অবৈধতার সকল পথ আজ উন্মুক্ত। যখন খুশী যেভাবে খুশী অবৈধ পন্থায় মানুষ তার কামনা মিটাতে পারছে। রাত দিন ঘরে টি. ভি চলছে। চলছে নানা রঙ্গের ছবি। আর সেগুলো দেখে প্রবৃত্তির যৌন চাহিদাকে আরো উত্তেজিত করা হচ্ছে। হাট-বাজারে দোকান-পাটে গেলে তো চোখ বাচানোই মুশকিল! ফলে অশ্লীলতা উলঙ্গপনা, নির্লজ্জতা এবং বেপর্দার অভিশাপ দ্রুত এগিয়ে আসছে আমাদের প্রতি। এসব অপসংস্কৃতির ছোবলে আমাদের সমাজ আজ মৃত প্রায়।

যৌতুক একটি সামাজিক অভিশাপ

এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশী দায়ী সমাজের ধনাঢ্য শ্রেণী। যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিত্তবানরা উদ্যোগ না নিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। সমাজের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা যতদিন পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত না নিবে যে, আমরা আমাদের বিবাহ শাদীতে রুসম-রেওয়াজের আশ্রয় নেব না, অনাড়ম্বর আয়োজনের মাধ্যমেই সম্পাদন করবো, আমাদের বিয়ে-শাদী ততদিন পর্যন্ত আমাদেরকে এই অভিশাপ যাতনা দিবে।

আমাদের বর্তমান সমাজের একজন সাধারণ গরীব লোকও ভাবে, আমার মান ইজ্জত, আমার সামাজিক কোয়ালিটি রাখতে হলে আমাকে যৌতুক দিতেই হবে। কারণ, মেয়ের বিয়েতে যৌতুক না দিলে শ্বশুরালয়ে আমার মেয়েকে তিরস্কার করা হবে, আমার নাক কাটা যাবে। এসব কারণে বর্তমান সমাজে যৌতুককে বিবাহের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হয়। ঘর গৃহস্থালীর আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা যেখানে স্বামীর দায়িত্ব ছিলো, আজ তা স্ত্রীর বাপের কাঁধে তুলে দেয়া হয়। কেমন যেন বাপের একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, নিজের কলিজার টুকরা মেয়েকে জামাতার হাতে তুলে দিবে আবার তার সাথে লাখ লাখ টাকাও দিবে। আরো দিতে হবে ফার্নিচারসহ সংসারের প্রয়োজনীয় সবকিছু। পুরো ঘরটি সাজিয়ে দেয়া যেন স্ত্রীর পিতার কর্তব্য। অথচ ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই।

হ্যাঁ, কোনো পিতা তার কন্যাকে কিছু দিতে চাইলে তা এমনিতেই দিবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের বিত্তবানরা যতক্ষণ পর্যন্ত সরলতা গ্রহণ না করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা যৌতুক বিরোধী সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে না তুলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যৌতুক নামক এই অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদেরকে কথাগুলো বুঝার তাওফীক দিন। আমীন।

স্ত্রীদের নির্দেশ দিতাম স্বামীদেরকে সেজদা করার

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْكُنْتُ اٰمُرُ أَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ـ (جَامِعُ التِّرْمِذِىْ، كِتَابُ الرِّضَاعِ، بَابُ مَاجَاءَ فِىْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْاَةِ، رقم الحديث : ١١٥٩)

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– আমি যদি কোনো মানুষকে কোনো মানুষের সম্মুখে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীর সামনে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো সামনে সেজদা করা জায়েয নেই, সেহেতু আমি কাউকে কারো সামনে সেজদা করার নির্দেশ দেইনি। আর যদি কোনো মানুষকে সেজদা করা জায়েয হতো, তাহলে স্ত্রীদের জন্য বৈধ হতো তাদের স্বামীকে সেজদা করার।

এহলো হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক

এ জীবন সংসারে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সফর সঙ্গী, জীবনসঙ্গী। জীবন সংসারের এই সফরে আল্লাহ তা'আলা আমীর নির্বাচন করেছেন পুরুষকে। জীবন সংসারে এই অভিভাবকত্ব ছাড়া অন্যসব অভিবাবকত্ব আকস্মিক কিংবা ক্ষণস্থায়ী। সমাজ বা দেশ যদি কাউকে আমীর বা রাষ্ট্র পরিচালক নির্বাচন করে তবে তা নির্দিষ্ট একটি মেয়াদকাল পর্যন্ত টিকে থাকে। বহুকাল যিনি শাসক বা নেতা ছিলেন, আজ তিনি জেল খাটছেন। গতকাল পর্যন্ত যাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সবাই সালাম স্যালুট করতো, আজ তাকে ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করার মত কেউ নেই। সুতরাং বলা যায়, পার্থিব সমাজে বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের কোনো গ্যারান্টি নেই, স্থায়ীত্ব নেই। আজ আছে কাল নেই।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সংসারে নেতৃত্ব ক্ষণস্থায়ী নয় বরং তাদের সম্পর্ক স্থায়ী। প্রতিটি মুহূর্তে তারা একে অন্যের সাথী, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে। হৃদয়ের হৃদয়ের স্পর্শে সর্বদা স্পন্দিত হয় তাদের দুটো মন, দুটি প্রাণ। তাই জীবনের এ বিরামহীন সফরে স্বামী যে নেতৃত্ব দেন সেই নেতৃত্বও স্থায়ী, সর্বদাই অটুট থাকে সেই নেতৃত্ব। অন্যভাবে বলা যায়, যতদিন পর্যন্ত এ দুটি হৃদয় বিবাহ সূত্রে গাঁথা থাকবে ততদিন পর্যন্তই স্বামীর নেতৃত্ব থাকবে অনড় মজবুত।

অতএব, স্বামীর এই অভিভাবকত্ব ও নেতৃত্ব সমাজের অন্যসব নেতৃত্বের মত নয়। নেতৃত্বের অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পর্কের সূত্রে হয় ধরাবাধা কিছু আইন কিংবা শাসক আর শাসিতের জন্য একটা গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে, যা নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার একটা মাধ্যম। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু আইনের সম্পর্ক নয়, কোন গঠনতন্ত্রও তাদের সম্পর্কের মাধ্যম নয়, বরং তাদের সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের, আত্মার সাথে আত্মার। যার দরুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আমি যদি কোনো মানুষকে কোনো মানুষের সামনে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীদেরকে বলতাম তারা যেন তাদের স্বামীকে সেজদা করে।

সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তিত্ব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত হলো, প্রত্যেকটি মানুষকে দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। তিনি স্বামীকে লক্ষ্য করে স্ত্রীর অধিকারের কথা বলেছেন, স্ত্রীকে বলেছেন স্বামীর অধিকারের কথা। উভয়কেই স্ব স্ব দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্ত্রীকে বলেছেন- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর তোমাদের নিকট সবচাইতে সম্মানিত ও প্রিয় ব্যক্তি হলেন তোমাদের স্বামী। মেয়েরা যতক্ষণ পর্যন্ত একথা অনুধাবন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বামীদের হক আদায় করবে। তবে সর্বদাই খেয়াল রাখতে হবে, সকল হুকুমের উপরে আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর হুকুমের সামনে মা-বাবা, স্বামী কিংবা অন্য কারো হুকুম কিছুই নয়। একথাও মনে রাখতে হবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরই স্বামীর মর্যাদা। তাই স্ত্রীদেরকে সর্বদাই স্বামীর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের হক আদায়ে সক্রিয় হতে হবে। তাদের নির্ভেজাল আনুগত্য থাকবে স্বীয় স্বামীর প্রতি।

আধুনিক সভ্যতার সবকিছুই উল্টো

আজকাল সর্ব ক্ষেত্রেই স্রোত উল্টো দিকে বইছে। হাকীমুল ইসলাম হযরত ক্বারী তাইয়্যিব (রহ.) প্রায়ই বলতেন- বর্তমান সভ্যতার সবকিছুই উল্টো দিকে চলছে। এমনকি আগেকার যুগে বাতির নিচে থাকতো অন্ধকার, আর এখন লাইটের উপরে থাকে অন্ধকার। উল্টো স্রোতের এ প্রভাব বাইরেও লেগেছে, ঘরেও লেগেছে। ঘরোয়া কাজ কর্ম মেয়েদের উপর ওয়াজিব নয়, তবে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর আদর্শ অবশ্যই।

নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা (রা.) নিজের হাতে ঘরের সকল কাজ-কর্ম করতেন। তাছাড়া নারীদেরকে স্বামীর অনুগত হওয়ার জন্যও বলা হয়েছে। যদি কোনো মহিলা ঘরের কাজ কর্ম করে, রান্না বান্না করে, স্বামী এবং সন্তান সন্ততির দেখা শোনা করে তার জন্য সাওয়াব ও প্রতিদানেরও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান নব্য সভ্যতার দাবি হলো, নারীদের ঘরে বসে থাকা, সাংসারিক কাজ কর্ম করা এগুলো হলো রক্ষণশীলতা ও সেকেলে চিন্তা ভাবনার নিদর্শন। বরং এসবের মাধ্যমে নারীদেরকে চার দেয়ালে বন্দী করে রাখা হচ্ছে। অথচ এই নারীই যদি এয়ার-হোস্টেস হয়ে চারশ' মানুষের রান্নাবান্না করে, ট্রেতে খাবার সাজিয়ে চারশ মানুষকে পরিবেশন করে আর চারশ মানুষের কুদৃষ্টির লক্ষ্যবস্তু হয়, বিভিন্ন জন বিভিন্ন সেবার প্রয়োজনে ডাকে। কখনও বা কোনো প্রয়োজন ছাড়াই ডাকে। কেউ বা অযথাই বেল টিপে কাছে ডেকে বলছে, এই সিটটি উঠিয়ে দাও, নামিয়ে দাও! এভাবে যে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে ফরমায়েশ করে, সেভাবেই ব্যবহৃত হয়, তখন তথাকথিত সভ্যরা বলছে, নারীরা এখন স্বাধীন। আর এ নারীই যখন নিজ ছেলে, মেয়ে, স্বামী ও ভাই বোনের কাজ করে তখন তাকে বলা হয়, বন্দী। বলা হয়, এসব প্রগতিবিরোধী, সভ্যতার পথে বাধা। প্রাচীন যুগের সংস্কৃতি, আরো কত কী!

আর এই নারীই যখন ওয়েটার্স হয়ে হোটেলে রাতদিন মানুষের সেবা করে তাদেরকে খাবার পরিবেশন করে তখন ওটাকে নারী স্বাধীনতার মহা অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই নারীকে যখন কারো ব্যক্তিগত সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয় তখন তাকে স্বাধীন নারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আর সে কিনা পরিবারের ছেলে-সন্তান ও স্বামীর কাজে হাত দিলেই হয়ে যায় রক্ষণশীলা, প্রগতিবিরোধী। কবির ভাষায়-

خرد کا نام جنون رکھ دیا جنون کا نام خرد

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

বিবেক বুদ্ধি হলো পাগলামি আর পাগল হলো বুদ্ধিজীবী, এগুলো সব তোমারই কারিশমা!

নারীর দায়িত্ব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- পৃথিবীর কারো সেবা করার দায়িত্ব নারীর নয়। সে অন্য কারো খেদমত করতে বাধ্য নয়। বরং নারী মুক্ত ও স্বাধীন। বরং একটি মাত্র বিষয়ের প্রতি নারী জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। তাহলো- তোমরা নিজেদের গৃহে প্রশান্তিতে থাকো, স্বামীর আনুগত্য করো, নিজের সন্তানদের দেখাশোনা করো, তোমাদের একমাত্র দায়িত্ব এটাই। তোমরা এরই মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে অনেক বড় অবদান রাখবে। এটাই জাতির সেবা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে এ মহান মর্যাদা দান করেছেন। এখন যার খুশী মর্যাদার পথ গ্রহণ করতে পার আর যার খুশী লাঞ্ছনার পথ অবলম্বন করতে পার। আজকের সমাজে এরূপ দৃশ্য অহরহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

সেই মহিলা সোজা বেহেশতে চলে যাবে

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضِيَةٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ (تِرْمِذِىْ، كِتَابُ الرِّضَاعِ، بَابُ مَاجَاءَ فِىْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ، رقم الحديث : ١١٦١)

হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে মহিলা এমতাবস্থায় মারা গেলো যে, তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট তাহলে সে সোজা জান্নাতে চলে যাবে।

সে তোমাদের নিকট কয়েকদিনের মেহমান মাত্র

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُؤْذِيْ اِمْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا اِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ ! فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ اِلَيْنَا . (جَامِعُ التِّرْمِذِىْ، كِتَابُ الرِّضَاعِ، باب : ١٩ حديث : ١١٧٤)

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যখন কোনো মহিলা তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, (কারণ সাধারণতঃ অধিকাংশ সময়ে মেয়েদের খিটখিটে মেজায হয়। এটা তাদের স্বভাবজাত। যার কারণে স্বামীদেরকে পীড়া দিয়ে থাকে।) তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্বামীদের স্ত্রী হিসেবে নির্ধারিত বেহেশতের ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা রমণীগণ দুনিয়ার স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে, "তুমি একে কষ্ট দিওনা! কারণ, এতো তোমার কাছে কয়েকদিনের মেহমান মাত্র। বরং বেশী দেরী নয় সে তোমাদেরকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে।

বদমেজাযী নারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাগুলো বলেছেন। কারণ তাদের কষ্ট দেয়ার ফলে স্বামীর তেমন ক্ষতি হয় না। বরং সে দুনিয়াতে হয়ত নিজের ইচ্ছে মত কিছু কষ্ট পৌছাতে পারবে, কিন্তু পরকালে এই স্বামীকে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হুর দান করবেন। আর তারা তাদের স্বামীদের এত বেশী ভালোবাসবে যে, এখন থেকেই তারা স্বামীর দুনিয়ার কষ্টে ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত।

পুরুষের জন্য কঠিন পরীক্ষা

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَاتَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً هِىَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ . (صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ، كِتَابُ النِّكَاحِ، باب مايتقى من شوم المرأة، حديث : ٥٠٩٦)

"হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- আমার যুগের পর আমি পুরুষদের জন্য সর্বাধিক ভয়াবহ ফেতনা রেখে যাচ্ছি তা হলো নারী জাতি।" নারী সংক্রান্ত পরীক্ষাই পুরুষদের জন্য সবচাইতে কঠিন পরীক্ষা। এই হাদীসটির বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে একটি বিশাল গ্রন্থের প্রয়োজন। কারণ নারীদের দ্বারা পুরুষদের পরীক্ষা হওয়ার দিক অসংখ্য।

নারী কিভাবে পরীক্ষার বিষয় হয়

হাদীস শরীফে নারী জাতিকে ফেতনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ফেতনা শব্দের অর্থ পরীক্ষা। সুতরাং অর্থ দাঁড়ালো নারীরা পুরুষদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। নারীরা পুরুষদের জন্য কিভাবে পরীক্ষার বিষয়, তা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা অসম্ভব প্রায়। নারীরা পরীক্ষার বিষয় হওয়ার একটি বড় দিক হলো, পুরুষদের মনে নারী জাতির প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ রাখা হয়েছে। যে কায়দায় পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.)।

নারীর এ আকর্ষণ পূরণেরও পথ দু'টি। একটি হালাল অন্যটি হারাম। পরীক্ষার বিষয় হলো, পুরুষ নারীকে পাওয়ার কোন পথ অবলম্বন করবে, হারাম পথ না হালাল পথ? একজন পুরুষের এটা এক কঠিন পরীক্ষা!

হালাল স্ত্রীর বেলায়ও পুরুষ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারে। আর তা এভাবে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে কেমন ব্যবহার করবে? সে কি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তক প্রদর্শিত পন্থায় স্ত্রীর সাথে আচরণ করবে না কি স্ত্রীর হক নষ্ট করবে?

তৃতীয় ধরনের পরীক্ষা হলো, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখতে গিয়ে তার সাথে নির্ভেজাল ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না তো? স্ত্রীর ভালোবাসার কারণে ইসলামের বিধি নিষেধ লংঘিত হচ্ছে না তো? স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ দেখানোর নামে অবৈধ পন্থায় তার বিনোদনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা, তাও দেখতে হবে। কারণ, স্বামীকে দু'টি দিক লক্ষ্য রাখতে হয়। স্ত্রীর ভালোবাসার দাবি হলো, তাকে কোনো বিষয়ে বাধা না দেয়া। আর দ্বীন ধর্মের দাবি হলো, স্ত্রী যেন অবৈধ পথে পা বাড়াতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

মোটকথা, এই জীবনে যেন পরীক্ষার শেষ নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহের মাধ্যমেই একটি মানুষ খুব সহজভাবে এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে

পারে এবং যথাযথ স্ত্রীর হকগুলোও আদায় করতে পারে। তার শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে পারে, লক্ষ্য রাখতে পারে যেন স্ত্রী কোনো অবৈধ পথে পরিচালিত না হয়। আর এসব কিছু আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করলেই সম্ভব। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে একটি দু'আ শিখিয়েছেন। যে দু'আটি মাছনূন দু'আসমূহের মধ্য থেকে একটি। দু'আটি হলো-

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে নারীদের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এখানে নারীদের ফেতনা বলতে নারী সংক্রান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত করেছেন, যা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। তাই সকলকে সর্বদা আল্লাহর দরবারে নারীর ফেতনা থেকে আশ্রয় কামনা করা উচিত। দু'আ করতে হবে- হে আল্লাহ! এই কঠিন পরীক্ষায় তুমি আমাকে সাহায্য করো! এ পথে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি, ধোঁকা-ভ্রান্তি থেকে আমাকে রক্ষা কর। তাই এ দু'আটি নিয়মিত পাঠ করা উচিত।

সকলেই দায়িত্বশীল

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ، كِتَابُ الجمعة، باب الجمعة فى القرى والمدن، حديث : ٨٩٣)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল বা অভিভাবক এবং তোমরা সকলেই তোমাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

হাদীসটি অপূর্ব ও সারগর্ভ, হাদীসটিতে (راعي) রাঈ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার প্রকৃত অর্থ হলো, রাখাল। বকরীর রাখালের ক্ষেত্রে শব্দটি অধিক প্রসিদ্ধ। (راعي) রাঈ এর আরেকটি অর্থ হলো, শাসক। আর শাসকের শাসিতদেরকে رعيت 'রাঈয়্যাত, বলা হয়। রাখালকে যেভাবে তার দায়িত্বে

রাখা ছাগল বকরী সম্পর্কে মালিকের কাছে হিসেব দিতে হয়, পবিত্র হাদীসটির ভাষ্য মতে তেমনিভাবে প্রতিটি মানুষকে এমনকি শাসককেও তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কিভাবে এদের অভিভাবকত্ব করেছো।

শাসক অধীনস্থদের অভিভাবক

وَالْأَمِيرُ رَاعٍ

সকল শাসকই অভিভাবক এবং সকল শাসকই তার অধীনস্থ সদস্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রশ্ন করা হবে, অধীনস্থদের সাথে তোমাদের আচরণবিধি কেমন ছিলো?

ইসলামের দৃষ্টিতে আমীর বা শাসককে একথা ধারণা করার সুযোগই নেই যে, শাসক হয়ে রাজত্বের তাজ মাথায় দিয়ে নিজেকে একটা কিছু ভাববে কিংবা একটা কিছু হয়ে বসবে। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে আমীর বা শাসক মানে জনগণের অভিভাবক। এজন্যই দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেছেন– সুদূর ফুরাত নদীর তীরেও যদি একটি কুকুর বুভুক্ষ মারা যায়। তাহলে আমার মনে হয় কিয়ামতের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে– হে উমর! তোমার শাসনকালে একটি কুকুর না খেয়ে মারা গিয়েছিলো, তুমি তার জবাব দাও।

খেলাফত বা রাষ্ট্র পরিচালনা দায়িত্বের একটি বোঝা

খেলাফত মানে দায়িত্বের একটি বোঝা। এ কারণেই হযরত উমর (রা.) শাহাদাত বরণ করার পূর্বে যখন গুরুতর আহত হন, তখন লোকজন এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পর খলীফা হবেন কে? আপনি তার নাম বলে দিন। কেউ কেউ হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহর নাম প্রস্তাব করে বললেন– আপনি আপনার পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র নাম ঘোষণা করে যান।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ছিলেন নিসন্দেহে একজন জালীলুল কদর সাহাবী। তার-জ্ঞান বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, তাকওয়া, আল্লাহভীতি, ইখলাস কোনো কিছুর মাঝে কমতি ছিলো না। সেই হিসেবে খলীফা উমর (রা.)-এর একজন সুযোগ্য পুত্রও বটে। অথচ যখন তার নাম ঘোষণা করার প্রস্তাব করা হলো, তখন হযরত উমর (রা.) একটি আশ্চর্য কথা বললেন। তিনি বললেন– তোমরা কি আমার পর এমন এক ব্যক্তিকে খলীফা শাসক বানাতে চাও যে তার স্ত্রীকে পর্যন্ত তালাক দিতে জানে না।

একথা বলার পিছনে একটি ঘটনা ছিলো। ঘটনাটি হলো– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় একবার তার স্ত্রীকে মাসিক চলাকালীন সময়ে তালাক দিয়েছিলো। অথচ মাসিক অবস্থায় তালাক দেয়া না জায়েয। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর মাসআলটি জানা ছিল না, তাই তিনি এমনটি করলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ দেন, তুমি তালাক প্রত্যাহার কর। নির্দেশ মত তিনিও তালাক প্রত্যাহার করে নিলেন।

এই ঘটনাটির প্রতিই ইঙ্গিত করে উমর (রা.) বলেন– তোমরা এমন ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করতে চাচ্ছো কি যে তার স্ত্রীকে পর্যন্ত তালাক দিতে জানে না? এমন লোককে আমি খলীফা নির্বাচন করবো কিভাবে?

তবুও লোকজন পুনরায় অনুরোধ জানালেন এবং বললেন– হযরত! ওটা তো একটি অতীত ঘটনা। মাসআলা না জানা থাকার কারণে তিনি এমনটি করেছেন। কিন্তু এ ঘটনার কারণে তো খলীফা হওয়ার জন্য অযোগ্য বলা যায় না। বরং তিনি তো খলীফা হওয়ার যোগ্য, আপনি তাকে খলীফা বানিয়ে দিন। একথার জবাবে হযরত উমর (রা.) এমন একটি কথা বললেন– যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। তিনি বলেন– দেখো, শাসক হওয়ার ফাঁদে খাত্তাবের (হযরত উমর (রা.)-এর পিতা) এক সন্তান পা দিয়েছে এটাই যথেষ্ট। এ বংশের অন্য কেউ আবার এ ফাঁদে পড়ুক তা আমি চাই না। কারণ রাজ্যশাসন এটা দায়িত্বের বিশাল এক বোঝা। আখেরাতে যখন আল্লাহ্‌র দরবারে এর হিসাব শুরু হবে। তখন কোনো মতে সমান সমান বেঁচে যেতে পারলেও গনীমত মনে করবো।

মূলতঃ শাসক সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই, ইসলামে শাসক বলতে একজন দায়িত্বশীল অভিভাবককেই বুঝায়।

স্বামী-স্ত্রী সন্তানের অভিভাবক

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ .

পুরুষ তার পরিবারের অভিবাভক। স্ত্রী-সন্তানসহ পরিবারের সকল বিষয়ের দায়িত্বশীল হচ্ছে পুরুষ। আর প্রতিটি পুরুষকেই তার এই অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। কেয়ামতের দিন তাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি যে পরিবারের কর্তা ও অভিভাবক ছিলে সে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কেমন

আচরণ করেছো? তাদের সম্পর্কে তোমার উপর আরোপিত দায়িত্ব কি ছিলো এবং তা আদায় করেছো কিভাবে? তারা দ্বীনের উপর চলছে কি-না, এ খোঁজ খবর নিয়েছ কি? তোমার পরিবারের কেউ জাহান্নামের পথে যাচ্ছে নাতো? এ সব বিষয় তুমি লক্ষ্য রেখেছ তো? এগুলো কি তোমার মনে ছিল? কিয়ামতের দিবসে পুরুষকে এ জাতীয় প্রশ্ন করা হবে। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (سُورَةُ التَّحْرِيمِ : ٦)

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! [সূরা তাহরীম, আয়াত ঃ ৬]

অর্থাৎ তুমি নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যাবে, নিজে নামায পড়বে, রোযা রাখবে, ফরয, ওয়াজিব, নফল, তাসবীহ সবকিছুই আদায় করবে অথচ ছেলে-সন্তানেরা বদদ্বীনের পথে চলবে তোমার মনে এদের কোনো ভাবনা নেই– এটা উচিত নয়। এমনটি করলে কেয়ামতের দিন বাঁচতে পারবে না; বরং কর্তব্য পালন না করার কারণে জবাবদিহি করতে হবে। শাস্তি ভোগ করতে হবে। যে কারণে পুরুষকে তার ঘরের অভিবাবক বা কর্তা বলা হয়েছে। আর আরেকটু অগ্রসর হয়ে স্ত্রীকে বলা হয়েছে–

স্ত্রী স্বামীর ঘর সংসারের অভিভাবক

اَلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ.

স্ত্রী তার স্বামীর ঘর সংসার ও ছেলে সন্তানের অভিভাবক। অর্থাৎ দুইটি বিষয় দেখা শোনার দায়িত্ব স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে, এক, স্বামীর ঘর সংসার। দুই, ছেলে সন্তান। দ্বীন এবং দুনিয়ার উভয় ক্ষেত্রেই ঘর-সংসার এবং ছেলে-সন্তান দেখা শোনা করার দায়িত্ব স্ত্রীর কাঁধেই। স্ত্রীর এ প্রবিত্র দায়িত্বের কথাই আলোচ্য হাদীসটিতে বলা হয়েছ।

মেয়েদেরকে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে

নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) বেহেশতী নারীদের নেত্রী। তিনি বিয়ের পর হযরত আলী (রা.) এর ঘরে চলে আসেন। তাঁরা উভয়ে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, হযরত আলী (রা.) ঘরের বাইরের সকল কাজ আঞ্জাম দিবেন, আর গৃহস্থালী সমস্ত কাজ করবেন হযরত ফাতেমা (রা.)। দেখা গেছে, হযরত ফাতেমা (রা.) ঘরের কাজ করতে গিয়ে অনেক কষ্ট-ক্লেশ করতেন এবং অত্যান্ত

আন্তরিকতার সাথেই করতেন। কিন্তু তবুও স্বামীর খেদমতে কোনো অলসতা দেখাতেন না। তার কাজগুলো খুব মেহনতের ছিলো। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে তো কাজ কর্ম করা কোনো কষ্টের বিষয়-ই নয়। সুইচ টিপ দিল আর খানা রেডি হয়ে গেলো। আর সকালে নিজ হাতে আটা পিষতে হতো, রুটি বানিয়ে তন্দুরে সেঁকতে হতো, তারপর তৈরি হতো রুটি, এই রুটি প্রস্তুত আর চাক্কি ঘুরাতে গিয়ে হযরত ফাতেমা (রা.)-কে হাড়বাঙ্গা পরিশ্রম উঠাতে হতো।

যখন খাইবার এর যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল আসলো, আসলো প্রচুর পরিমাণে গোলাম বান্দীও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এগুলো বণ্টন করে দিতে লাগলেন। তখন এক সাহাবী এসে হযরত ফাতেমা (রা.) বললেন– আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আবেদন করুন, একজন কাজের বাঁদী দেয়ার জন্যে। তাই হযরত ফাতেমা (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) এর ঘরে আসলেন এবং আয়েশা (রা.)-কে অনুরোধ করলেন, আপনি আব্বাজন (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলুন, আটার চাক্কি ঘুরাতে ঘুরাতে আমার হাতে দাগ পড়ে গেছে। পানির মশক টানতে টানতে আমার বুকেও দাগ পড়ে গেছে। এখন তো গনীমতের প্রচুর গোলাম-বাঁদী এসেছে। যদি একটা গোলাম বা বাঁদী আমাকে দেন তাহলে এই কষ্ট পরিশ্রম থেকে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারি। একথা বলে হযরত ফাতেমা (রা.) চলে গেলেন।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘরে তাশরীফ আনলেন। হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আরজ করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রা.) এসেছিলেন এবং এ কথাগুলো আপনাকে বলার জন্য আমাকে বলেছেন।

দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সর্বোপরি ফাতেমার বাবা। হযরত ফাতেমা তাঁর একান্ত আদরের নন্দিনী, কলিজার টুকরা। তার সম্মুখে বলা হচ্ছে তার কলিজার টুকরার দুঃখ-দুর্দশার কথা যে, চাক্কি চালাতে চালাতে আর মশক টানতে টানতে হাতে ও বুকে দাগ পড়ে গেছে। একজন আদরের কন্যার এই কষ্টের কথা শুনে একজন হৃদয়বান বাবাকে কতখানি অস্থির করেছে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করলেন, তা চিরদিন হৃদয়ের গভীরে গেঁথে রাখার মতো। তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)-কে ডাকলেন এবং বললেন–

ফাতেমা! তুমি আমার কাছে একজন গোলাম কিংবা বাঁদী চেয়েছ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মদীনার প্রতিটি ঘরে গোলাম এবং বাঁদী না পৌঁছবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যাকে গোলাম অথবা বাঁদী দেয়াটা পছন্দ করি না।

মেয়েদের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র তাসবীহে ফাতেমী

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– তবে মা! আমি তোমাকে একটি আমল বাতলে দিব, যে আমলটি গোলাম-বাঁদীর চাইতেও উত্তম হবে। রাতের বেলা যখন তুমি ঘুমোতে যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ; ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। এটা তোমার জন্যে গোলাম বাঁদির চাইতে উত্তম হবে। হযরত ফাতেমা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যা। তাই প্রতি উত্তরে টু শব্দও করেননি। প্রশান্তচিত্তে মেনে নিয়েছেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা। যে কারণে এই তাসবীহকে তাসবীহ ফাতেমী বলা হয়। [জামেউল উসূল, খণ্ড ৬, পৃ ৫০১]

ছেলে-মেয়ে মানুষ করা মায়ের কর্তব্য

নারী শুধু ঘরের অভিভাবক নন, বরং ছেলে সন্তানকে মানুষ করার দায়িত্বও তার কাঁধেই। ছেলে-মেয়েদের সেবা-যত্ন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নারীর কাঁধেই অর্পণ করেছেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ছেলে মেয়ে যদি সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা না পায়, ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা থেকে যদি তারা ছিটকে পড়ে, তাহলে নারীকেই সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে জিজ্ঞসাবাদ করা হবে। তারপর পুরুষকে। তাই এসব কাজের প্রধান দায়িত্বশীল হলো নারী।

নারীকে জেনে রাখতে হবে, তাকে প্রশ্ন করা হবে, তোমাদের কোলে লালিত সন্তানরা ঈমানদার হয়নি কেন? কেন তারা দ্বীন অনুরাগী হয়নি? এজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমণীদেরকে তাদের স্বামীর ঘর সংসার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় বলেছেন– اَلَاكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ ـ

তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল। তোমরা সকলেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা দ্বারা আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য অনুধাবন করার ও পালন করার তাওফীক দান করুন ! আমীন!

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

হজ্জ. কুরবানী এবং দশই জিলহজ্জ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ـ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ ـ (سُوْرَةُ الْفَجْرِ : ١-٥)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ـ

শপথ উষার, শপথ দশ রজনীর, শপথ জোড় ও বেজোড়ের এবং শপথ রজনীর যখন তা গত হতে থাকে।

এই স্থানটি ছিলো আলোর মিনার

আজ অনেকদিন পর আমরা ইজতেমার সুবাদে পুনরায় এখানে হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) খানকায় সমবেত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

মূলতঃ এখানে এলে কিছুটা হৃদয়ের আকর্ষণ অনুভূত হয়। খুঁজে পাই যেন সাহস ও আত্মবিশ্বাস। এক সময় ছিলো আমরা এখানে আসতাম একজন শ্রোতা হিসেবে, উপকার লাভের প্রত্যাশায়। স্থানটিকে তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য এক আলোর মিনার হিসেবে দান করেছিলেন। দ্বীনের আলো, তার নিগূঢ়তত্ত্ব এবং পরিচিতি আমরা এখান থেকে হাসিল করতাম হযরতওয়ালা ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.)-এর জবান থেকে, অর্জন করতাম দ্বীনের অজানা কতো বিষয়! এ জন্যই বলছিলাম এক সময় যেখানে আমার উপস্থিতি ছিলো একজন শ্রোতা হিসেবে কিংবা ছাত্রের পরিচয়ে, আজ সেখানে উপস্থিত হয়েছি একজন আলোচক বা ওয়ায়েজ হিসেবে যা আমাকে সত্যিকারেই সম্মোহিত করেছে। আবেগাপ্লুত হয়েছি আমি। তাই বলতে হয়, আমাদের নিকট অল্প স্বল্প যা কিছুই আছে তা মূলতঃ ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) এরই ফয়েজ-বরকত। আমাদের অন্তরে যে কথাগুলো জাগে কিংবা মুখ দিয়ে যা বের হয় সবই তার স্নেহ, মায়া-মমতা ও অনুগ্রহের ফলাফল। তাঁর অশেষ মেহেরবানী ছিলো আমাদের উপর। যেসব কথা শোনার আগ্রহ অনেক সময় আমাদের ছিলো না, যা আমরা প্রয়োজনীয় মনে করতাম না কিংবা যেমন কথা শোনার উপযুক্তও আমরা নই, সেসব কথাও তিনি আমাদেরকে শুনিয়েছেন বারবার। প্রয়োজনীয় কথাগুলো তিনি প্রবেশ করে দিয়েছেন আমাদের কর্ণকুহরে, গেঁথে দিয়েছেন হৃদয়ের গহীনে। খোদা চাহে তো আজীবন কথাগুলো আমাদের স্মরণে থাকবে। তাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি মুহতারাম ভাই হাসান আব্বাস সাহেব (দা. বা.)-কে। যেহেতু তাঁরই হুকুম পালনার্থে একটি জরুরী দায়িত্ব আদায় করছি। শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী (দা. বা.)-এর। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফয়েজ আরো বিস্তৃত করুন। তিনি প্রতি মাসের প্রথম জুমআয় এখানে তাশরীফ আনেন এবং বয়ানও করেন। মাশাআল্লাহ তিনি এর যোগ্যও বটে। এবার তিনি হজ্জে গিয়েছেন। ভাই হাসান আব্বাস বললেন, এ সুবাদে আপনি কিছু আলোচনা রাখুন। সেহেতু তার হুকুম পালনার্থে এই কারগুজারি পেশ করছি। আল্লাহ তা'আলা ইখলাসের সহিত বলার, শোনার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ইবাদতের মাঝে বিন্যাস পদ্ধতি

১লা জিলহজ্জ থেকে ১০ই জিলহজ্জ পর্যন্ত জিলহজ্জ মাসের এই দশদিনের আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিশেষ ফযীলত ও বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যময় হিসাবে এ দশটি দিন আমাদেরকে দান করেছেন আল্লাহ তা'আলা। বরং লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ফযীলতের এই ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে পবিত্র রমযান থেকেই। এমনিতে আল্লাহ তা'আলা সকল ইবাদতকে বিন্যস্ত করেছেন সুনিপুণভাবে, বিস্ময়কর পদ্ধতিতে। যেমন প্রথমে আগমন পবিত্র রমযানের যে মাসে রোযা পালন করা ফরয।

রমযানের ইতি টানতেই শুরু হয়ে যায় হজ্জ নামক ইবাদতের ভূমিকা। কারণ, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– হজ্জের মাস তিনটি। শাওয়াল, জিলক্বদ এবং জিলহজ্জ। অবশ্য যদিও হজ্জের নির্ধারিত বিধি-বিধান আদায় করতে হয় জিলহজ্জ মাসেই। কিন্তু শাওয়াল মাস থেকেই হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হওয়া জায়েয; বরং মুস্তাহাব। কেউ যদি চায় ইহরাম বেঁধে শাওয়াল মাসের শুরুতেই হজ্জের উদ্দেশ্য বের হবে সে, তাহলে এটা তার জন্যে নাজায়েয হবে না মোটেও। তবে হ্যাঁ, শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের ইহরাম পরতে পারবে না সে। আগেকার দিনে হজ্জে যেতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হতো। কখনো বা দুই তিন মাসও চলে যেতো। তাই তারা শাওয়াল মাস আসলেই আরম্ভ করতো হজ্জের সফর প্রস্তুতি। সুতরাং বলা চলে, রোযার ইবাদতের যবনিকার পরেই হজ্জের ইবাদতের প্রারম্ভিকতা। আর সেই হজ্জের সকল ইবাদত সম্পাদন করতে হয় জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের ভিতরে। কারণ হজ্জের সবচাইতে বড় রুকন উকুফে আরাফাহ, সংঘটিত হয় জিলহজ্জ মাসের নবম তারিখে। আল্লাহ চাহে তো, সেদিনটি হচ্ছে আজকের দিন।

কৃতজ্ঞতার নযরানা হলো কুরবানী

এভাবে আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহে দু'টি আজীমুশ্বান ইবাদত অর্থাৎ রমযানের রোযা পালন ও হজ্জ সম্পাদন যখন হয়ে যায়। তখন একজন মুসলমান হিসেবে জরুরী হয়ে পড়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তার দরবারে কিছু নযরানা পেশ করার। যেই নযরানার নাম কুরবানী। সুতরাং কুরবানী মানে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে জিলহজ্জের ১০, ১১ ১২ তারিখের ভিতরে তার দরবারে নযরানা পেশ করা। এতো রাব্বুল আলামীনেরই মেহেরবানী যে, তিনি দু' দুটি আজীমুশ্বান ইবাদত করার তাওফীক দিয়েছেন! লক্ষ্য করুন, রমযানের রোযার পরিসমাপ্তির পর আসে ঈদুল ফিতর আর হজ্জ সমাপ্তিকরণের পরে আগমন ঘটে ঈদুল আযহার। ঈদুল ফিতরে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করতে হয় সদকায়ে ফিতরের মাধ্যমে। আর ঈদুল আযহার আনন্দ উদযাপন করতে হয় কুরবানীর মাধ্যমে।

দশ রাতের শপথ

এখন চলছে জিলহজ্জ মাস। আজ জিলহজ্জের দশ তারিখ। তাই এই সুবাদে কিছু আলোচনা করার আশা রাখি। জিলহজ্জের প্রথম দশকের সূচনা মূলতঃ পহেলা তারিখ থেকেই তথা ১ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত দিনগুলোর সমষ্টিগত নাম জিলহজ্জের প্রথম দশক। বছরের বার মাসের মাঝে এই দশটি দিনের গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি। যার গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআন শরীফের ত্রিশতম পারার 'সূরায়ে ফাজ্‌রের' মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۔

অর্থাৎ, শপথ উষার। শপথ দশ রাতের। আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা দশ রাতের কসম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার নিকট কোনো কিছু বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য শপথ করার প্রয়োজন হয় না। তাই তাঁর শপথ করার অর্থ শপথকৃত বস্তুটির সম্মান মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানো। আর এখানে আল্লাহ তা'আলা যেই দশ রাতের শপথ করেছেন সেই দশ রাতকে চিহ্নিত করতে গিয়ে মুফাসসিরীনে কেরামের বড় একটি দল বলেছেন– সেই দশরাত হচ্ছে, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে। তাফসীর বিশারদগণের এই উক্তির মাধ্যমে জিলহজ্জের এই প্রথম দশরাতের সম্মান মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

ফযীলতময় দশটি দিন

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের ফযীলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে স্বয়ং নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার নিকট এই দশদিনের ইবাদত অন্যান্য দিনের ইবাদতের চাইতে অত্যাধিক প্রিয়। যদিও সেই ইবাদত নফল নামায, যিকির, তাসবীহ কিংবা সদকা হোক না কেন। [সহীহ বুখরী, কিতাবুল ঈদাইন, বাবু ফাযলিল আমালি ফী আইয়্যামিত তাশরীক হাদীসঃ ৯৬৯]

অন্য হাদীসে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন– এই দিনগুলোর এককেটি রোযা এক বছরের রোযার সমতুল্য। অর্থাৎ এই দিনগুলোতে পালনকৃত প্রতিটি রোযার সাওয়াব উন্নীত করে এক বছরের রোযার সাওয়াবের সমপরিমাণ করে দেয়া হবে।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন– এই দশরাতের প্রতিটি রাতের ইবাদত ক্বদর রাতের ইবাদতের সমতুল্য। অর্থাৎ, এই দশরাতের যে কোনো একটি রাতে ইবাদত করতে পারলে কেমন যেন সে লাইলাতুল কদরে ইবাদত করল। জিলহজ্জের প্রথম দশক এতো অধিক ফযীলতময় করেছেন আল্লাহ তা'আলা ! [তিরমিযী শরীফ, কিতাবুস সাওম বাবু মা-জা-আ ফিল আমালি ফী আইয়্যামিল আশরি, হাদীসঃ ৭৫৮]

এই দিনগুলোতে বিশেষ দু'টি ইবাদত

সর্বোপরি এই দিনগুলোর জন্য সব চাইতে বড় ফযীলত তো এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু ইবাদত দিনগুলোতে করার জন্য বলেছেন যেসব ইবাদত বছরের অন্য দিনে করা যায় না। মনে করুন হজ্জের কথাই বলছি, যা পালন করতে হলে এই দিনগুলোতেই করতে হয়। অথচ অন্যান্য ইবাদত মানুষ যখন ইচ্ছে তখন করতে পারে। যথা নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। আর নফল নামায? নফল নামায যে কোনো সময় আদায় করা যায়, তেমনি রমযান মাসে রোযা ফরয। আর নফল রোযা রমযান ছাড়া যে কোনো সময় রাখা যায়। যাকাত বছরে একবার ফরয হয় আর নফল সদকা যে কোনো সময় দেয়া যায়। কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে দু'টো ইবাদত। যে দুটো ইবাদতের জন্যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা সেই নিদিষ্ট সময়ের ভিতরে এই দুটো ইবাদত সম্পন্ন না করে অন্য সময় করলে চলবে না। পরিগণিত হবে না তা ইবাদতের মাঝে। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম হজ্জ। হজ্জের আরকান, বিধি-বিধান সম্পাদন করতে হয় নিদিষ্ট দিনগুলোর ভিতরেই। যথা ঃ আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফায় রাত যাপন, জামারাতে পাথর নিক্ষেপণ ইত্যাদিসহ হজ্জের যাবতীয় বিধি-বিধান ঐ নির্দিষ্ট সময় না করলে আদায় হবে না মোটেও। কেউ যদি আরাফাতের দিনে না গিয়ে অন্য কোনোদিন উকুফে আরাফাহ করে তাহলে তা ইবাদত হবে না। কিংবা জামারা তো সারা বছরেই আছে, এখন যদি জামারাতের সময় রামী বা কংকর নিক্ষেপ না করে অন্য কোনো দিনে রামী করে তাহলে তাকে ইবাদত মনে করা হবে না। সুতরাং প্রতীয়মান হলো, হজ্জ নামক ইবাদতের যাবতীয় বিধি-বিধান আদায় করতে হয় নির্দিষ্ট সময়ে। অন্যথায় তা ইবাদতের শামিল হয় না।

ব্যতিক্রম দ্বিতীয় ইবাদতটির নাম কুরবানী। কুরবানীর জন্যে আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করেছেন তিন দিন অর্থাৎ জিলহজ্জের দশ, এগ্যার ও বার

তারিখ। এই তিন দিন ব্যতীত অন্য কোনো দিন কুরবানী করতে চাইলেও করা যায় না। হ্যাঁ কেউ যদি চায় বকরী জবাই করে গোশত সদকা করে দেয়ার তা পারবে। কিন্তু তা কুরবানী হবে না, হবে সদকা।

উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেলো আল্লাহ তা'আলা জিলহজ্জ মাসের এই প্রথম দশককে আলাদা মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন হাদীসের আলোকে লিখেছেন– রমযযানুল মোবারকের পর সবচাইতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও ফযীলতময় দিন হচ্ছে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন। যে দিনগুলো ইবাদতের সাওয়াব বৃদ্ধি লাভ করে এবং আল্লাহ তা'আলা এই দিনগুলোতে বিশেষ রহমত নাযিল করেন। উপরন্তু আরো এমন কিছু আমল রয়েছে এই দিনগুলোতে যা আলোচনা করা আমি জরুরী মনে করছি।

চুল এবং নখ না কাটার দির্দেশ

জিলহজ্জের চাঁদ দেখার সাথে সাথে আমাদের উপর সর্বপ্রথম যে হুকুমটি আরোপিত হয় তাও এক বিস্ময়কর ও বিরল হুকুম। তা হচ্ছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কুরবানী করতে হয়, তাহলে চাঁদ দেখার পর তার জন্য চুল-নখ কাটা ঠিক নয়। এ নির্দেশটি যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তাই কুরবানী করা পর্যন্ত চুল-নখ না কাটা মুস্তাহাব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

[ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আযাহী, হাদীস নং – ৩১৮৭]

কিছুটা তাদের মতো হত

চাঁদ দেখার পর চুল নখ না কাটার হুকুমটি খুবই আশ্চর্যজনক মনে হলেও মূলতঃ এই দিনগুলোতেই আল্লাহ তা'আলা হজ্জের মতো শানওয়ালা একটি বড় ইবাদত নির্দিষ্ট করেছে। মুসলমানদের বড় একটি দল আলহামদুলিল্লাহ এই সময়ে ইবাদতটি করার সৌভাগ্য লাভ করে। এই সময়ে ওখানের পরিবেশই অন্যরকম, ভিন্ন এক আমেজ অনুভূত হয় তখন। বাইতুল্লাহ শরীফের আকর্ষণ তাওহীদের সন্তানদের টেনে নিয়ে যায় নিজের নিকট। কেমন যেন সেখানে ফিট করা হয়েছে কোনো সম্মোহনী যন্ত্র। হজারো মুমিন বাইতুল্লাহর আশপাশে জমায়েত হয় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিটি মুহূর্তে। আল্লাহ পাক তাদেরকে হজ্জ করার সৌভাগ্য দান করেন। তাই তাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ হলো, বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতীক তথা ইহরাম পরে সেখানে যাওয়ার, ইহরামের ক্ষেত্রেও রয়েছে

আবার নানা রকম বিধি-নিষেধ। যেমন– ইহরামের সময় সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করতে পারবে না, খুশবু লাগানো নিষেধ, মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা যাবেনা ইত্যাদি। ইহরামের এসব বিধি-নিষেধের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান হলো চুল-নখ কাটা যাবে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এবং যারা বাইতুল্লাহ শরীফে যেতে পারেনি তাদেরকে এবং যারা হজ্জের ইবাদতে অংশ নিতে পারেনি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার রহম ও করমের ভাগী করার লক্ষ্যে ইরশাদ করেন, তোমরা বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ পালনকারীদের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যতা অবলম্বন কর। কিছুটা তাদের মতো হও। তারা যেমনি চুল কাটে না তোমরাও তেমন কর। তারা যে ভাবে নখ কাটে না তোমরাও সেভাবে কেটো না। এভাবে হজ্জ পালনকারীদের মতো সৌভাগ্যের অংশীদার বানিয়ে দিলেন।

আল্লাহ তা'আলার রহমত বাহানা খোঁজে

আমাদের হযরত ডাক্তার মুহাম্মদ আব্দুল হাই (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তা'আলার রহমত বাহানা খোঁজে। আমাদেরকে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে হাজীদের জন্য যেসব রহমত মঞ্জুর হয়েছে সেসব রহমতের কিছু অংশ আমাদেরকে দান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর রহমতের যে বারিধারা আরাফাতের ময়দানে বর্ষণ করেন সে রহমতের কিছু ভাগ আমাদেরকেও দেয়া হবে এটাই তার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই সাদৃশ্যতা তৈরি করাও মহান আল্লাহ তা'আলার এক বড় নেয়ামত। হযরত মাযজুব সাহেব (রহ.) এই কবিতাটি প্রায় সময় আবৃতি করতেন।

تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں
حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں

তোমার প্রিয়তমের সাদৃশ্যতা নিয়ে এসেছি প্রভু!
তাকে তুমি হাকীকতে রূপান্তর করে দাও,
আমি এসেছি সুরত নিয়ে।

আশা করি, আল্লাহ তা'আলা সুরতের বরকতে হাকীকতে পরিণত করবেন। রহমতের যে ঝর্নাধারা তিনি সেথায় বর্ষন করে থাকেন হতে পারে তা এখানেও বর্ষণ করবেন।

প্রয়োজন কিছুটা একাগ্রতা ও মনোযোগের

এমনটিই ছিলো আমাদের হযরত ওয়ালা (রহ.)-এর কৌতুক। তিনি বলতেন, এক ব্যক্তির কাছে টাকা-পয়সা নেই, তাই বলে কি আল্লাহ তা'আলা তাকে বঞ্চিত করবেন? টাকা-পয়সা নেই বলে সে আরাফাহ যেতে পারেনি এজন্য আরাফারসমূহ রহমত থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাহরূম করবেন কি? এমনটি হতে পারে না। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে স্থান দিতে চান। সুতরাং প্রয়োজন শুধু একটু মনোযোগের, একটু একাগ্রতার। ব্যাস! স্রেফ একটু মনোযোগ দাও, সামান্য ফিকির কর, কিছুটা হাকীকতের রূপ ধারণ কর। যদি এরূপ করতে পার তাহলে আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদেরকেও তার রহমতে অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন।

আরাফাহর দিনের রোযা

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই দিনগুলো এতই ফযীলতের যে, এই দিনের একেকটি রোযা সাওয়াব অর্জনের দিক থেকে এক বছরের রোযার মতো। আর একেকটি রাতের ইবাদত শবে ক্বদরের রাতের ইবাদততুল্য। এর মাধ্যমে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে একজন মুসলমান এই দিনগুলোতে যত বেশি সম্ভব ইবাদত-নেক আমল অবশ্যই করবে। পাশাপাশি ৯ই জিলহজ্জ হচ্ছে আরাফার দিন।

হজ্জের বড় একটি রুকন উকুফে আরাফাহ, যা হাজীদের এ দিনটিতে আদায় করতে হয়। আর আমাদের জন্য বিশেষভাবে এই নবম তারিখকেই নফল রোযার জন্য নিধারির্ত করা হয়েছে। এই রোযার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আরাফার দিন রোযা রাখবে তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই আশা করা যায় যে, তার পূর্ববতী এক বছরের এবং পরর্বতী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে উক্ত রোযা পরিগণিত হবে।

[ইবনে মাজাহ কিতাবুস সিয়াম, বাবু সিয়ামি ইয়াওমি আরাফাহ, হাদীস নং-১৭৩৪]

শুধুমাত্র সগীরা গুনাহ মাফ হয়

এখানে একটি কথা আরয করতে চাই, দ্বীনের বিষয়ে কাঁচা এমন অনেকেই এ ধরনের হাদীস এলে কল্পনা প্রসূত ধারণা করে বলে থাকে, পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহ যখন মাফ-ই করে দেয়া হয়, তাহলে তার অর্থ হচ্ছে পুরো বছরের জন্য আমাদের ছুটি। সব গুনাহ মাফ হয় বিধায় যে কোনো কিছু আমরা করতে পারবো।

ভালভাবে বুঝে নিন, গুনাহ মাফ হয় বলে যেসব আমলের বর্ণনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন, যেমন বলা হয় ওযু করার সময় প্রত্যেক অঙ্গের গুনাহ ধৌতকালীন সময়ে মাফ হয়ে যায়। নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যখন মানুষ মসজিদে গমন করে তখন প্রতিটি কদমে একটি গুনাহ মাফ হয় ও একটি মর্তবা বুলন্দ হয়।

রমযানের রোযার ব্যাপারে বলা হয়েছে রোযাদারের পূর্ববতী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। জেনে রাখুন, এ ধরনের সকল হাদীসে গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য সগীরা গুনাহ। আর কবীরা গুনাহর ব্যাপারে বিধান হলো, কবীরা গুনাহ তাওবা ব্যতীত মাফ হয় না। হ্যাঁ আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে তাওবা ছাড়াও ক্ষমা করতে চান সেটা অবশ্য ভিন্ন কথা। কিন্তু বিধানগত কথা হলো, কবীরা গুনাহের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করা হবে না ততক্ষন পর্যন্ত মাফ হবে না। তাও তখন যখন গুনাহটি হুকুকুল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার হকের ক্ষেত্রে হয়। যদি গুনাহটির সম্পর্ক হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হকের সাথে হয়, যেমন মনে করুন, কারো হক বলপূর্বক নিয়ে নিয়েছে, কারো অধিকার হরণ করে নিয়েছে এরূপ যদি হয় তাহলে বিধান হচ্ছে, হক্বদারের হক ফিরিয়ে দেয়া পর্যন্ত কিংবা তার থেকে মাফ নেয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র তাওবা দ্বারা গুনাহ মাফ হবে না। সুতরাং ফযীলতের হাদীসগুলোতে যে জাতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়ার কথা এসেছে সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সগীরা গুনাহ।

তাকবীরে তাশরীক

এই দিনগুলোর তৃতীয় আমলটি হচ্ছে তাকবীরে তাশরীক, যা করতে হয় আরাফাহর দিন ফজরের নামায থেকে শুরু করে ১৩ ই জিলহজ্জ আসরের নামায পর্যন্ত। প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই তাকবীরটি একবার পড়া ওয়াজিব। তাকবীরটি হচ্ছে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

এই তাকবীর পুরুষরা মধ্যম আওয়াজে পড়া ওয়াজিব নিম্নস্বরে পড়া সুন্নাত পরিপন্থী। [মুসন্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ,খণ্ড ঃ ৪, পৃষ্ঠা ১৭ ১ শামী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৮]

স্রোত চলছে উল্টো দিকে

আমাদের সমাজে আজকাল স্রোত চলছে উল্টো দিকে। যেসব বিষয় নিম্নস্বরে পড়ার জন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে সেসব বিষয় আজকাল শোরগোল করে পড়া হয়। যেমন দু'আ করার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে এসেছে–

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ـ (سُوْرَةُ الْاَعْرَاف : ٥٥)

অর্থাৎ, নিচু ও মিনতিস্বরে তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ কর। এ জন্যই সাধারণতঃ উঁচু গলায় দু'আ করার পরিবর্তে নিচু গলায় দু'আ করা উত্তম। অবশ্য যেখানে উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করার কথা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত সেখানে সেভাবেই দু'আ করা উত্তম। এই দু'আরই একটি অংশ দুরূদ শরীফ। তাকেও নিম্নস্বরে পড়া উত্তম। যেসব বিষয় সম্পর্কে উঁচু গলায় পড়ার জন্য বলা হয়েছে যেমন তাকবীরে তাশরীক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক নামাযের পর উচ্চস্বরে পাঠ করবে। অথচ আজ তাকবীর তাশরীক বলার সময় যেন আওয়াজই বের হতে চায় না। বর্তমানে তা পাঠ করা হয় খুবই নিম্নস্বরে।

ইসলামের মহত্ত্ব প্রকাশ

আমার মুহতারাম পিতা প্রায়ই বলতেন, ইসলামের এই তাকবীরে তাশরীক এভাবে উচ্চারণ করার জন্য বলা হয়েছে, যেন ইসলামের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। এ জন্য তার দাবি হচ্ছে সালাম ফেরানোর পর এই তাকবীর ধ্বনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠতে হবে। তাকে উঁচু গলায় বলতে হবে।

তেমনিভাবে ঈদুল আযহায় নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়ও সুন্নাত হচ্ছে এই তাকবীর উচ্চ ধ্বনির সাথে বলা। অবশ্য ঈদুল ফিতরের সময় বলতে হবে নিচু স্বরে।

নারীদের উপরও তাকবীরে তাশরীক ওয়াজিব

তাকবীরের তাশরীক নারীরাও পড়তে হবে– এটাই শরীয়তের বিধান। অথচ এ ব্যাপারে সাধারণতঃ অনেক উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। এই তাকবীর পড়তে নারীরা সাধরণতঃ ভুলে যায়। পুরুষরা যেহেতু জামাতের সাথে মসজিদে নামায পড়ে আর মসজিদে সালাম ফেরানোর পর এই তাকবীর যেহেতু পড়াও হয়, তাই সাধারণতঃ তাদের স্মরণ পড়ে যায় এবং এই তাকবীর উচ্চারণ করে নেয়। কিন্তু নারীদের মধ্যে এরূপ খুব একটা দেখা যায় না। সুতরাং তাদের তেমন পড়াও হয় না। হ্যাঁ এই তাকবীর নারীদের ওয়াজিব কি-না, এ ব্যাপারে যদিও ওলামায়ে কেরামের মত দু'রকম পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেন, ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। তবুও স্পষ্ট কথা হচ্ছে সতর্কতা স্বরূপ নারীরা পাঁচ দিন অর্থাৎ আরাফার দিন ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীক পড়তে হবে। তবে হ্যাঁ, পুরুষরা তো পড়তে হবে জোর গলায় আর নারীরা পড়তে হবে নিম্নস্বরে।

অতএব নারীদেরকেও এ সম্পর্কে ভাবতে হবে তারেদকে এসব মাসআলা বলতে হবে। এই তাকবীরটি পড়তে যেহেতু তারা ভুলে যায়। তাই আমার পরার্মশ হচ্ছে, তারা যেখানে নামায পড়ে সেখানে যেন এটি লিখে ঝুলিয়ে রাখে। যেন এই তাকবীরটি পড়তে তাদের মনে থাকে এবং সালামের পর পড়তে পারে।

[মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯০; শাফী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৯]

অন্যদিনে কুরবানী হয় না

অতঃপর চতুর্থ এবং সবচাইতে বড় আমল যা আল্লাহ তা'আলা জিলহজ্জের এ দিনগুলোর জন্য নির্ধারিত করেছেন, তা হচ্ছে কুরবানীর আমল। আমি পূর্বেও বলেছি এ আমলটি অন্য কোন দিনে করা যায় না। করতে হয় জিলহজ্জের ১০, ১১, ১২ তারিখের ভিতরেই। এই দিনগুলো ছাড়া অন্য যে কোনো দিনে যত হাজার পশুই জবাই করা হোক না কেন, কুরবানী হবে না।

দ্বীনের হাকীকতঃ হুকুম পালন করা

সুতরাং এ দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় আমলের নাম হচ্ছে হজ্জ এবং কুরবানী। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীন বোঝাতে চাচ্ছেন, দ্বীনের হাকীকত এই যে, সত্তাগতভাবে কোনো আমলই গুরুত্বের দাবি রাখে না। বিশেষ কোনো স্থানেও কিছু রাখা হয়নি। কোনো আমল, কোনো সময়ের ভিতরেও কিছু নেই। এসব কিছুর মাধ্যমে যে ফযীলত অর্জন হয় তা আমার (আল্লাহর) বলার কারণে হয়। যদি আমি বলে দেই যে, অমুক কাজ করো তাহলে কাজটি সাওয়াবের হয়ে যায়। আমি যদি সেই কাজটি নিষেধ করে দেই তখন আর কাজটির মাঝে কোনো সাওয়াব থাকে না। আরাফার ময়দানের কথাই ধর, ৯ই জিলহজ্জ ব্যতীত অবশিষ্ট ৩৫৯ দিনে সেখানে গেলে কোনো সাওয়াব পাবে না। অথচ আরাফার ময়দান তো ওই একটিই, জাবালে রহমতও ওটাই। এর কারণ যেহেতু আমি ৯ই জিলহজ্জ ছাড়া অন্য কোনো দিনে সেখানে অবস্থানের কথা বলিনি। আমি যখন বলেছি, ৯ই জিলহজ্জে আরাফার ময়দানে এসো তখন এই ৯ই জিলহজ্জ এই ময়দানে আসাই ইবাদত হয়েছে। এখন এর প্রতিদান স্বরূপ সে সাওয়াব পাবে। মূলকথা হচ্ছে, ময়দানে আরাফার ভিতরেও কিছু নেই। সময়ের মধ্যেও নেই। আমলের মাঝেও নেই। বরং আমি বলার করণে আমলের ফযীলত সৃষ্টি হয়। স্থান ও সময় হয়ে যায় দামী ও ফযীলতপূর্ণ।

এখন মসজিদে হারাম থেকে মার্চ কর

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন মসজিদে হারামের ফযীলত আল্লাহ তা'আলা এত বেশি দান করেছেন যে, সেখানে এক রাক'আত নামায পড়লে এক লাখ রাক'আত নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়। হাজী সাহেবগণ প্রতি ওয়াক্ত নামাযে এক লাখ ওয়াক্ত নামাযের সাওয়াব অর্জন করে থাকেন। কিন্তু ৮ই জিলহজ্জ আসার সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এসে যায়, মসজিদে হারাম এখন ছেড়ে দাও। প্রতি রাক'আতে যে এক লাখ রাক'আতের সাওয়াব পেতে তাও এখন রেখে দাও। এখন মীনাতে গিয়ে তাবু কর। ৮ই জিলহজ্জ জোহর থেকে শুরু করে ৯ই জিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত মীনাতে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মীনাতে অবস্থানকালে হাজীদের কোনো কাজ নেই। পাথর নিক্ষেপণ, ওকুফ কিছুই নেই। ব্যাস! মীনাতে একমাত্র হুকুম হলো, অবস্থান ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায সম্পাদন। হারামের প্রতি রাক'আতে লাখ রাক'আতের সাওয়াব ছেড়ে মীনার মাঠে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে নাও। এ ছাড়া অন্য কোনো হুকুম নেই। হুকুমটির মাধ্যমে একথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদর্শন উদ্দেশ্য যে, সাওয়াবের যেসব কথা দ্বীনের মাঝে রয়েছে তা আমার (আল্লাহর তা'আলার) বলার কারণে রয়েছে। এখন যখন বলা হয়েছে হারাম ছেড়ে মীনা প্রান্তরে নামায পড়। তখন এ হুকুম পালনের মাধ্যমে যে সাওয়াব পাওয়া যাবে তা হারামে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কেউ যদি মনে করে, মীনাতে যেহেতু বিশেষ কোনো আমল নেই। সুতরাং মীনাতে অবস্থান করে কী লাভ! যাই মসজিদে হারামে। সেখানে গিয়ে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে রাক'আত প্রতি লাখ রাক'আতের সাওয়াব অর্জন করে নেই। এরূপ কেউ ধারণা করলে এক লাখ রাক'আতের সাওয়াব তো দূরে থাক, এক রাক'আতের সাওয়াবও সে পাবে না। যেহেতু সে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের খেলাফ করেছে। মানাসিকে হজের কিছু অংশ নিজ থেকে কমিয়ে ফেলেছে।

আমল ও স্থানের মাঝে মূলতঃ কিছু নেই

হজ্জ নামক ইবাদতের প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি ধাপে এই একটি কথা পরিলক্ষিত হয় যে, হজ্জ নামক এই ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা' আলা মানুষের বুকে লালিত এই মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছেন যে, মূলতঃ কোনো আমল, কোনো স্থানের মাঝে কিছু রাখা হয়নি। যা কিছু রয়েছে আল্লাহর হুকুম পালনের

মধ্যে রয়েছে। তার হুকুম হয়েছে তো আমলটি আকড়ে ধরা সাওয়াবের হয়ে গিয়েছে। হুকুম হয়নি তো আমলটি বর্জন করার মাধ্যমে-ই সাওয়াব পাবে।

যৌক্তিকতার মাপকাঠিতে এটি এক পাগলামী

হজ্জের পুরো ব্যাপারটিতে এই হেকমতটিই দেখা যায়। দেখুন, একটি পাথর মীনাতে দণ্ডায়মান, আর লাখো মানুষ তাকে কংকর নিক্ষেপ করছে। কেউ যদি যুক্তি প্রদর্শন করে বলে, এই পাথরটির এমন কী কসুর হয়েছে যে, তাকে হাজার হাজার কংকর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এটা আবার কেমন পাগলামি। বুদ্ধির বিচারে এরূপ কেউ বললেও বলতে পারে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, কাজটি কর। তাই তার কথাই মানতে হবে। এতে সাওয়াব ও প্রতিদান মিলবে। এর পিছনে কোনো যুক্তি বা দর্শন খোঁজ করা যাবে না। কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি তো মানার মধ্যেই।

হজ্জের ইবাদতে ধাপে ধাপে এই কথা শিক্ষা দেয়া হয় যে, তুমি তোমার যুক্তির মাপকাঠিতে যা মাপতে চাইছো, অন্তরে যুক্তির যে ভূত পুষছো এসব ভেঙ্গে ফেল এবং এটা উপলব্ধি কর যে, যা কিছু রয়েছে সব আল্লাহ তা'আলার হুকুম মানার মধ্যেই রয়েছে।

কুরবানী কী শিক্ষা দেয়?

অনুরূপ কুরবানীও। কুরবানী নামক ইবাদতটির মাঝে সকল ফালসাফা এটাই। কারণ, কুরবানী অর্থ যে জিনিস দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা যায়। আর কুরবান শব্দটি 'কুরবুন' শব্দ থেকে উৎসারিত। অতএব কুরবানী অর্থ হলো যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা যায়। কুরবানীর পুরো আমলটিতে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, দ্বীন হচ্ছে আমার হুকুম মানার নাম। আমার হুকুমের মাঝে যুক্তির ঘোড়া দৌড়ানো যাবে না। হেকমত ও সুযোগ খোঁজ করার কোনো অবকাশ নেই। আমার হুকুম পালনে টালবাহানাও করা যাবে না। একজন মুমিনের কাজ শুধু আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে নিজের মাথা ঝুকিয়ে দেয়া এবং হুকুমের অনুসরণ করা।

ছেলে হত্যা যৌক্তিক হতে পারে না

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট যখন হুকুম এসে গেলো সন্তান জবেহ করে দাও। হুকুমটিও এসেছে স্বপ্নের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা যদি চাইতেন ওহীর মাধ্যমেও হুকুমটি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এরূপ করলেন না। বরং

স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি ইবরাহীম (আ.)-কে দেখালেন যে, তিনি তাঁর সন্তানকে জবেহ করছেন। আমাদের মতে কোনো সুযোগসন্ধানী ব্যাখ্যাকার হলে তো বলে দিতো এটিতো স্বপ্নের কথা। তার উপর আমল করার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু মূলতঃ এটিও ছিলো একটি পরীক্ষা। নবীদের স্বপ্ন যেহেতু ওহী হয় তাই ইবরাহীম (আ.) এই ওহীর উপর আমল করছেন কি না? এই পরীক্ষা নেয়ার লক্ষ্যে স্বপ্নটি দেখানো হলো।

এরপর যখন ইবরাহীম (আ.) জানতে পারলেন আল্লাহর হুকুমের কথা তখন তিনি আর পাল্টা প্রশ্নে করেননি। বলেননি অবশেষে হুকুম কেন দেয়া হচ্ছে? কী কারণ বা রহস্য এর মাঝে লুকায়িত? একজন পিতা নিজ সন্তানকে হত্যা করার কথা দুনিয়ার কোনো ইজম কোনো সংবিধান অবশ্যই মেনে নিবে না। বুদ্ধির নিরিখেও এ হুকুমটি সঠিক বলে কখনো বিবেচিত হবে না।

বাপ কা বেটা

যাক, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে হুকুমটির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেননি। তবে হ্যাঁ ছেলেকে পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করেছেন–

يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى ۔
(سُوْرَةُ الصَّافَّاتِ ۔ ١٠٢)

হে আমার আদরের ছেলে! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে জবেহ করছি। এখন বলো তোমার রায় কি? হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় আদরের সন্তান ইসমাঈল (আ.) এর রায় এজন্য চাননি যে, রায় পেলে জবেহ করা হবে আর রায় না পেলে জবেহ করা হবে না। বরং রায় চাওয়া হয়েছে তাকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তিনি প্রেম সাগর কতখানি অবগাহন করলেন, আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কেমন? কিন্তু সন্তান তো আখের হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর। সে সন্তান তো এমন যে, তার বংশধারা থেকেই তাশরীফ আনবেন সমস্ত রাসূলের সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এজন্যই সন্তানও পাল্টা জিজ্ঞেস করেননি যে, আব্বাজান আমার এমন কী গুনাহ হয়েছে, আমার ত্রুটিই বা কী যার কারণে আমাকে মৃত্যু পথের যাত্রী হতে হচ্ছে? এর রহস্য কি? কোন্ হেকমত এতে লুকায়িত? এসব প্রশ্ন হযরত ইসমাঈল (আ.) করেননি; বরং তিনি একটাই উত্তর দিলেন এবং বললেন–

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ۔

হে আব্বাজান! আপনি যেভাবে আদেশ পেয়েছেন সেভাবেই করুন। খোদা চাহে তো আমাকে দেখতে পাবেন ধৈর্যশীলদের মাঝে। আমি কান্নাকাটি, চেচামেচি কিছুই করবো না। আপনার একাজে বাধাও দিবো না। আপনি নির্দ্বিধায় আপনার কাজ সম্পন্ন করুন।

উদ্যত ছুরি যেন থমকে না যায়

যখন পিতা পুত্র উভয়ই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই হুকুম মানার জন্য উভয়ই যখন প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছেন এবং পিতা ছেলেকে শুইয়ে দিয়েছেন মাটির উপর। ইসমাঈল (আ.) তখন বলে উঠলেন, আব্বাজান! আপনি আমাকে উপুড় করে শোয়ান। কারণ এভাবে শুইলে আমার দু'চোখ যখন আপনার দু' চোখের সাথে মিলিত হবে তখন আপনার অন্তরে আমার প্রতি স্নেহ-মহব্বত হয়তো বা উতলে উঠবে। ফলে আপনি ছুরি চালাতে ব্যর্থ হবেন।

শেষ পর্যন্ত পিতা পুত্রের এই বিরল আদেশ পালন আল্লাহ তা'আলার নিকট এত বেশি পছন্দ হয়েছে যে, যার আলোচনা কুরআন শরীফে এভাবে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۔ (سُوْرَةُ الصَّافَّات : ١٠٤، ١٠٥)

হে ইবরাহীম! আপনি আপনার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এবার আল্লাহর কুদরতের খেলা দেখুন! অবশেষে যখন তিনি চোখ খুললেন, দেখতে পেলেন হযরত ইসমাঈল (আ.) হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে এক প্রান্তে বসে আছেন, আর সেখানে পড়ে আছে জবেহকৃত একটি ভেড়া।

সব কিছুর উপরে আল্লাহ তা'আলার হুকুম

কুরবানীর আমলের মূল বুনিয়াদ আলোচ্য ঘটনাটি। এমন ইতিহাস জন্ম নেয়ার সময় থেকেই এ দীক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী শরীয়াহ কুরবানী নামক ইবাদত এজন্য প্রবর্তন করেছে যেন মানুষের হৃদয়ে এ অনুভূতি, বিশ্বাস এ প্রত্যয় জন্মে যে, আল্লাহর হুকুমের গুরুত্ব সবকিছুর উপরে। আর দ্বীন হচ্ছে মানার জিন্দেগীর নাম, আল্লাহর হুকুমের সীমানায় যুক্তির ঘোড়া দৌড়ানো যাবে না। হেকমত আর সুযোগ সুবিধা খোঁজারও কোনো আকাশ নেই।

হযরত ইবরাহীম (আ.) যুক্তি ও হেকমতের প্রতি তাকাননি

আমাদের সমাজে আজ যে গোমরাহী প্রসারিত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার হুকুমের মাঝে বুদ্ধিক হেকমত আর যৌক্তিক দর্শন খোঁজ করা। দেখা হয় বুদ্ধির বিচারে হুকুমটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত? যুক্তি যুক্ত মনে হলে তার উপর আমল করা হয় আর যুক্তিযুক্ত মনে না হলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। বলুন তো এটা কোন্ ধরনের দ্বীন। এটার নামই কি ইত্তিবায়ে দ্বীন বা দ্বীনের অনুসরণ? ইত্তিবা তো তাই যা দেখিয়েছেন হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং দেখিয়েছেন তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)। তাঁদের এই আমলটি আল্লাহ তা'আলার দরবারে এত বেশি প্রিয় হয়েছে যে, কিয়ামত অবধি চলতে থাকবে আমলটির অনুশীলন। যেমন বলা হয়েছে–

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْأٰخِرِيْنَ ـ (سُوْرَةُ الصَّافَّاتِ : ١٠٨)

অর্থাৎ, অনাগত মুসলিম উম্মাহর জন্য আমি (আল্লাহ) আমলটি আবশ্যিক করে দিয়েছি। আমরা যে কুরবানী করে থাকি তা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এর অনুকরণেই করে থাকি। কারণ তারা মাথা পেতে দিয়েছিলেন আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে। যৌক্তিক কোনো প্রমাণ তারা চাননি। অতএব, আমাদের জীবনকে তাদের জীবনের মতো উৎসর্গ করে দিতে হবে আল্লাহর জন্য। এটাই কুরবানীর প্রকৃত শিক্ষা।

কুরবানী কী পরিবেশ, সমাজ দূষিত করার মাধ্যম?

যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহ তা'আলা কুরবানী ওয়াজিব করছেন, আজকাল সম্পূর্ণ তার বিপরীত প্রচার করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে কুরবানী আবার কী? এই কুরবানী একটি অর্থহীন কাজ যা প্রবর্তন করা হয়েছে, এর মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা রক্তের স্রোতে ভেসে যায়। সামাজিক দৃষ্টিকোণেও যথেষ্ট ক্ষতি বিদ্যমান। অসংখ্য পশুর প্রাণহানি ঘটে। আরো কত কী। অতএব কুরবানীর পরিবর্তে কুরবানীর টাকা গরীব ও ক্ষুধার্তদের মাঝে যদি বিলিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারবে।

এসব প্রোপাগান্ডার মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। আগে তো এসব অপচর্চার জন্য ছিলো নির্দষ্ট কিছু মজলিস। কিন্তু বর্তমানে চলছে তার অবাধ চর্চা। প্রতিদিন কেউ না কেউ প্রশ্ন তুলছেই, ভাই, আমাদের প্রিয়জনদের মধ্যে কত গরীব আছে, আমরা কুরবানী না করে তার টাকা এসব গরীবদেরকে দিয়ে দিলে এমন কী ক্ষতি!

কুরবানীর আসল রূহ

আসল কথা হচ্ছে প্রত্যেক ইবাদতের জন্য আছে নির্দিষ্ট স্থান, নির্ধারিত পরিসর। কেউ যদি খেয়াল করে যে, আমি নামায পাড়বো না। তার পরিবর্তে গরীবদের দান করবো। এরূপ করলে নামাযের ফরযিয়াত কিন্তু তার থেকে অনাদায়ই থেকে যাবে। দান-সদকা করার সাওয়াব তার আপন স্থানে শরীয়তের অন্যান্য যে সব ফরয-ওয়াজিব তাও আপন জায়গায়।

এই যে অপপ্রচার কুরবানী সম্পর্কে করা হচ্ছে যে, এটা অযৌক্তি কাজ পরিবেশ দূষিত করার মাধ্যম, সামাজিক বিচারে কাজটি বৈধ হতে পারে না ইত্যাদি এসব অপপ্রচার মূলতঃ কুরবানীর রূহ পরিপন্থী।

আরে ভাই, কুরবানী শরীয়তে প্রবর্তিত হয়েছে তো এজন্যই যে, কাজটি তোমাদের বুদ্ধির বিচারে যৌক্তিক হোক বা না হোক তবুও কাজটি করো। যেহেতু আমি (আল্লাহ) হুকুম দিয়েছি, তাই আমল করে দেখাও।

এটাই হচ্ছে কুরবানীর আসল রূহ। মনে রাখবে মানুষ যতক্ষণ মানার জিন্দেগী গড়তে না পারবে ততক্ষন মানুষ মানুষ হতে পারবে না। যত রকম অসভ্যতা, অশান্তি, নৈরাজ্য বর্তমান বিশ্বে বিরাজ করছে তা শুধুমাত্র যুক্তির পিছনে দৌড়ে আল্লাহর হুকুম না মানার কারণে হচ্ছে।

তিন দিন পর কুরবানী আর ইবাদত নয়

অন্যান্য ইবাদত তো যখন ইচ্ছা তখন আদায় করা যায়। কিন্তু কুরবানীর মাঝে আল্লাহ তা'আলা এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, পশুর গলায় ছুরি চালানোর কাজটি তিনদিন পর্যন্ত ইবাদত হিসেবে গণ্য। তিনদিন পর এটি আর ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। এটা এই শিক্ষা দেয়ার জন্য যে, এই কুরবানীর ভিতর মূলতঃ কিছু নেই। যখন বলা হয়েছিল কুরবানী করো। তখন এটি করাটা ইবাদত ছিলো, আর যখন বলা হয়নি তখন না করাটাই ইবাদত। এভাবে পুরো দ্বীনটাই হচ্ছে মানার জিন্দেগীর নাম। আল্লাহর হুকুম আসলে মানতে হবে, আমল করতে হবে। আর যেখানে হুকুম আছে সেখানে অন্য কিছুই নেই।

সুন্নাত এবং বিদ'আতের মাঝে পার্থক্য

সুন্নাত এবং বিদ'আতের মাঝে মৌলিক পার্থক্য এটাই যে, সুন্নাত হচ্ছে দামী ও সাওয়াবের কাজ। আর বিদ'আতের কোনো মূল্যই আল্লাহর কাছে নেই। অনেকে বলে থাকে, জনাব! চেহলাম বা চল্লিশা ও দশমী উদযাপন করেছি তো

এমন কী গুনাহ করে ফেলেছি বরং ভালোই তো মনে হচ্ছে। মানুষজন একসাথে হচ্ছে, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত হচ্ছে, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত তো মহা সাওয়াবের কাজ। সুতরাং এখানে খারাপের কোনো কিছুতো নেই? আরে ভাই, খারাপ তো এটাই হয়েছে যে, নিজের পক্ষ থেকে কুরআন তেলাওয়াত করেছে ঠিক কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকায় তো তেলাওয়াত করেনি। কুরআন তেলাওয়াত তো তখন সাওয়াবের কাজ যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত পথে হবে। তাঁদের প্রদর্শিত পথে না হলে সাওয়াবের কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

মাগরিবের নামায চার রাক'আত পড়া গুনাহ কেন?

এ প্রসঙ্গে আমি একটি উদাহরণ পেশ করে থাকি যে, মাগরিবের নামায তিন রাক'আত ফরয। যদি কেউ বলে, এই তিন সংখ্যাটি কেমন যেন বিদঘুটে। তাই তিন রাক'আত না পড়ে চার রাক'আত পড়বো না কেন? এ বলে লোকটি তিন রাক'আতের স্থলে চার রাক'আত পড়ল।

বলুন তো এটা কী তার অপরাধ? সে কি মদপান করেছে? কিংবা চুরি-ডাকাতি অথবা অন্য কোনো গুনাহ করেছে কি? সে তো শুধু এক রাক'আত নামায অতিরিক্ত পড়েছে। যে এক রাক'আতে কুরআন তেলাওয়াতও বেশি হয়েছে, অতিরিক্ত একটি রুকু এবং দু'টি সিজদা হয়েছে, আল্লাহর নামও নেয়া হয়েছে আরো অধিক। সুতরাং তার এমন কী গুনাহ হলো? তবুও কিন্তু গুনাহ হয়েছে। সাথে সাথে চতুর্থ যে রাক'আতটি অতিরিক্ত পড়া হয়েছিল তার কোনো সাওয়াবও মিলেনি বরং এ অতিরিক্ত রাক'আতটি অবশিষ্ট তিন রাক'আতকে নষ্ট করে দিয়েছে।

কেন? কারণ তার এ পদ্ধতি আল্লাহও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা মতো হয় নি। আর সুন্নাত ও বিদ'আতের মাঝে পার্থক্য এটাই। অর্থাৎ যে তরীকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত তা সুন্নাত। পক্ষান্তরে যে তরীকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত নয়; বরং স্ব আবিষ্কৃত তা যতই মূল্যবান হোক না কেন, তাতে ফায়দা-সাওয়াব বা প্রতিদান নেই।

সুন্নাত ও বিদ'আতের আকর্ষণীয় উদাহরণ

আমার আব্বাজী (রহ.)-এর নিকট শাহ আব্দুল আজীজ (রহ.) নামক 'দু'আপ্রার্থী' এক বুযুর্গ আসতেন। যিনি ছিলেন তাবলীগ জামাতের প্রসিদ্ধ

বুযুর্গদের একজন। অত্যন্ত বিরল বৈশিষ্টের অধিকারী বুযর্গ। একদিন তিনি আব্বাজীর নিকট এসে একটি বিস্ময়কর স্বপ্নের কথা শুনালেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, আমার আব্বাজী একটি ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুলোক তার আশপাশে বসা। তিনি তাদেরকে দরস দিচ্ছেন। আব্বাজী ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্যে চক দ্বারা এক (১) সংখ্যাটি আঁকলেন এবং সকলকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? সকলে উত্তর দিলো, এক। তারপর তিনি এক সংখ্যার ডানে একটি শুন্য বসালেন এবং প্রশ্ন করলেন, এখন কত হলো? উত্তর আসলো, দশ। আরেকটি শূন্য বসিয়ে অনুরূপ প্রশ্ন করলেন, সকলে উত্তর দিলো, এবার একশ' হলো। তারপর আরো একটি শূন্য বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন. এবার কত? সকলে উত্তর দিলো এক হাজার। এরপর তিনি বলেন এ ভাবে যত শূন্য বাড়াতে থাকবো প্রতিটি শূন্য দশগুণ করে বাড়তে থাকবে শেষে তিনি সবগুলো শূণ্য মুছে ফেললেন এবং পুনরায় আরেকটি এক (১) সংখ্যা আঁকলেন এবং তার বামে একটি বিন্দু বসালেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, এখন কী হলো? সবাই উত্তর দিলো, দশমিক এক অর্থাৎ এক দশমাংশ? এরপর আরেকটি বিন্দু বসালেন এবং প্রশ্ন করলেন এবার কী হলো? উত্তর দিলো দশমিক শূন্য এক এভাবে এক এক করে আরো কয়েটি বিন্দু বসালেন। দেখা গেলো, প্রতিটি বিন্দু বামে বসানোর কারণে এক দশমাংশ করে হ্রাস পায়। অতঃপর তিনি বললেন, ডান দিকে যে শূন্য তা সুন্নাতের উদাহরণ। আর বাম দিকের বিন্দু হচ্ছে বিদ'আতের উদাহরণ।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, দৃশ্যতঃ উভয়টা এক, কিন্তু ডান দিকে বসানোর কারণে সন্নাত হচ্ছে, যেহেতু তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত তরীকায় হয়েছে। আর বাম দিকে বিন্দু যা বসানো হলো, তার অর্থ হচ্ছে, বিদ'আতের মাধ্যমে সাওয়াব ও প্রতিদানের পরিবর্তে উল্টো তা আরো হ্রাস পেতে থাকে। এটাই সুন্নাত এবং বিদ'আতের মাঝে পার্থক্য।

তাই! দ্বীন মানেই মানার জিন্দেগী। নামাযের সময় আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন, তা পালন করার নামই দ্বীন। নিজের বুদ্ধি প্রসৃত কোনো পথ ও পন্থা আবিষ্কার করার নাম দ্বীন নয়, বরং তা উল্টো শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর তাহাজ্জুদ আদায়

আমাদের শায়খ থেকে শোনা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। আপনারা হয়তো আরো শুনেছেন! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো সাহাবায়ে

কেরামের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে রাত্রি ভ্রমণে বের হতেন। একবার তিনি বের হয়ে দেখলেন হযরত আবু বকর (রা.) তাহাজ্জুদের মধ্যে খুবই ক্ষীন কণ্ঠে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা দেখে যখন আরেকটু অগ্রসর হলেন, দেখতে পেলেন হযরত উমর (রা.)-কে। তিনি খুবই উচ্চ আওয়াজে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করছিলেন। উভয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ফিরে আসলেন। সকালে ফজর নামাযের পর হযরত আবু বকর (রা.)-কে দেখে তাঁকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, আপনি নামাযের ভেতর এত ক্ষীন কণ্ঠে তেলাওয়াত করছিলেন কেন? উত্তরে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় উত্তর দিলেন।

أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ.

আমি যার কাছে প্রার্থনা করছিলাম, তাকে তো শুনিয়ে দিয়েছি। তাই দরাজ গলায় তেলাওয়াত করার প্রয়োজন আর মনে করেনি। যাকে শুনানো উদ্দেশ্য তাঁকে উচ্চ কণ্ঠে শুনাতে হবে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা তো নেই? অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন, আপনার এত জোরে তেলাওয়াত করার কারণ কী? উত্তরে তিনি বললেন–

أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرِدُ الشَّيْطَانَ.

আমার উচ্চ গলায় তেলাওয়াত করার কারণ হলো, যেন অলস ও ঘুম কাতুরে প্রকৃতির লোকদের ঘুম দূর হয়ে যায় এবং শয়তান রেগে যায়।

উভয়ের উত্তর শোনার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে বললেন ارفع قليلا তুমি আরেকটু উচ্চৈঃস্বরে পড়ো। আর উমর (রা.) কে বললেন– اخفض قليلا তুমি আরেকটু নিম্ন স্বরে পড়ো। [আবু দাউদ, সালাত অধ্যায়, হাদীস ১৩৯]

মধ্যপন্থা উদ্দেশ্য

মোটকথা, উক্ত ঘটনাটি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা, যা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। যার ব্যাখ্যায় সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে, হাদীসটির মাধ্যমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম পন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছেন। খুব উচ্চ

স্বরেও পড়া যাবে না, একেবারে নিম্নস্বরেও নয়। পড়তে হবে এরই মাঝামাঝি স্বরে। কুরআন শরীফেও একথাই ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا.

নামাযের মধ্যে খুব উচ্চৈঃস্বরেও পড়ো না এবং একেবারে নিম্নস্বরেও নয় বরং এর মাঝামাঝি পন্থায় নিয়ম বজায় রেখে পড়ো।

নিজস্ব মতামত মিটিয়ে দাও

হযরত ডাক্তার সাহেব (রহ.) হাকীমুল উম্মাত থানভী (রহ.)-এর উসীলায় উক্ত হাদীসটির একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিতেন। তিনি বলেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) বলেছিলেন, যে সত্তাকে শুনানো উদ্দেশ্য তাকে তো আমি শুনিয়ে দিয়েছি। সুতরাং উচ্চ আওয়াজের পড়ার প্রয়োজনই বা কী? একথাটি ভুল নয়। আর হযরত ফারুকে আ'যম (রা.)-এর জন্মগতভাবেই যেহেতু উচ্চ কণ্ঠ ছিলেন, তাই নামাযের ভেতরও উচ্চৈঃস্বর হয়ে যাওয়া তাঁর জন্য দূষণীয় নয়। এতদসত্ত্বেও হুযূর (সা.) বললেন, এতদিন তোমরা নিজস্ব মতানুযায়ী পড়তে। এখন পড়তে হবে, আমার কথা ও রায় অনুযায়ী। প্রথমে যেভাবে পড়তে সেটা তোমাদের নিজস্ব চিন্তা থেকে উদ্ভাবিত বিধায় সেটার মাঝে খুব বেশি নূরও বরকত ছিলো না। আর আজ থেকে যখন আমার নির্দেশ অনুযায়ী তেলাওয়াত করবে তখন পরিপূর্ণ নূর চলে আসবে।

গোটা জীবন অনুকরণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে

সম্পূর্ণ দ্বীনের সারকথা এটাই। নিজের মত ও পন্থার কোনো প্রভাব থাকতে পারবে না; বরং সকল আমলই হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত তরীকায়। দ্বীনের এই হাকীকত বোঝানোর লক্ষ্যেই কুরবানী নামক ইবাদতের সূচনা। আসলে আমরা উদাসীনতার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছি। আমরা অন্তকরণ সহ কোনো জিনিসকে গ্রহণ করি না। তাই কুরবানীর সময় আমাদেরকে এই চেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে যে, এই কুরবানী আমাদের কী শিক্ষা দেয়? কুরবানী আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, আমাদের জীবনটা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে অর্পণ করে দিতে হবে। গোটা জীবনই আমাদেরকে অনুকরণের দৃষ্টান্ত পেশ করতে হবে। আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক যৌক্তিক মনে হোক বা অযৌক্তিক মনে হোক সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুমের সামনে আমাদের মাথা নত করতে হবে। এটাই কুরবানীর শিক্ষা ও দর্শন। আল্লাহ

তা'আলা দয়া করে কুরবানীর উক্ত শিক্ষা আমাদেরকে বোঝার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে কুরবানীর বরকত দান করুন। আমীন।

কুরবানীর ফযীলত

হাদীস শরীফে এসেছে, কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় পশু কুরবানী করে, তখন ওই কুরবানীর ফলে পশুর শরীরে যতগুলো পশম আছে, প্রতিটি পশমের পরিবর্তে একটি করে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কুরবানীর দিনসমূহে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে কোনো প্রিয় জিনিস আল্লাহ তা'আলার নিকট নেই। যে যতবেশি কুরবানী করবে আল্লাহর দরবারে সে তত বেশি প্রিয় হবে। আরো ইরশাদ হয়েছে, কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার দরবারে পৌছে যায়। এবং তার নৈকট্য লাভের কারণ হয়।

এ সব ফযীলত এই জন্য যে, আমার বান্দা এ সব বাকী কথার উপর বিশ্বাস করে কিনা? আমার এ সব বাকী কথার উপর বিশ্বাস করেই তো সে অর্থ সম্পদ খরচ করে আমার নির্দেশ পালন করে এবং পশুর উপর ছুরি চালিয়ে দেয়। এ কারণেই তার আজ এই প্রতিদান ও সাওয়াব।

একজন গ্রাম্য লোকের ঘটনা

বড়দের মুখে শুনেছি, আগেকার যুগে নিয়ম ছিলো, কেউ বড় কোনো রাজা বাদশাহর দরবারে যেতে চাইলে সাথে করে কিছু হাদিয়া তোহফা উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে যেতো। মূলতঃ বাদশাহর তো এসব উপঢৌকনের প্রয়োজন নেই। তবুও উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জন করা। যদি তিনি উপঢৌকন গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁর সুদৃষ্টি ভাগ্যে জুটবে।

এই সম্পর্কে মাওলানা রুমী একটি ঘটনা লিখেন, বাগাদদের সন্নিকটে একটি গ্রাম ছিলো। সেই গ্রামে বাস করতো এক গ্রাম্য লোক। গ্রাম্য লোকটির একদিন সাধ জাগলো বাদশাহর দরবারে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার। বাদশাহও তো আর এই যুগের বাদশাহ নয় যে, চাট্টিখানি একটি দেশ আর সেই দেশের বাদশাহী! বরং বাদশাহ ছিলেন সে যুগের বাগদাদের খলীফা যিনি অর্ধ পৃথিবী শাসন করতেন।

যাক, বাড়ি থেকে বের হওয়ার পূর্বে গ্রাম্যলোকটি তার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলো যে, আমি তো বাদশাহর দরবারে যাচ্ছি। তাই তার জন্য কিছু হাদিয়া তোহফা নেয়া উচিত। এখন কী নিয়ে যেতে পারি? লোকটি তো বাস করতো

একটি ছোট্ট গ্রামে। তার দুনিয়ার কোনো খবর ছিলো না। তাই স্ত্রীকে পরামর্শ দিলো, আমাদের ঘরে কলসিতে যে পানি আছে, তা পুকুরের স্বচ্ছ শীতল ও বিশুদ্ধ পানি। বাদশাহ এরকম পানি পাবে কোথায়? তাই কলসির পানিটুকু নিয়ে যান।

স্ত্রীর পরামর্শটি গ্রাম্য লোকটির কাছে যৌক্তিক মনে হলো। তাই সে পানির কলস মাথায় উঠিয়ে নিলো এবং বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলো। সে যুগের সফর তো বর্তমানের উড়োজাহাজ কিংবা রেলের সফর ছিলো না। পায়ে হেঁটে অথবা উটে চড়ে সফর করতে হতো। লোকটি পায়ে হেঁটেই রওয়ানা হলো। এবার রাস্তার বাতাসে ধুলি বালি উড়ে এসে কলসির উপর জমাট বাঁধতে লাগলো। ফলে বাগাদাদ পৌছতে পৌছেতে কলসির পানিতে ময়লার তলানি জমাট হলো।

অবশেষে সে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাহকে লক্ষ্য করে আরজ করলো, হুযূর! আপনার খেদমতে গোলাম কিছু তোহফা নিয়ে এসেছে। বাদশাহ যখন জিজ্ঞেস করলেন, কী তোহফা? গ্রাম্য লোকটি তখন পানির কলসটি পেশ করলো এবং বললো, এটি আমার গ্রামের পুকুরের বিশুদ্ধ স্বচ্ছ, নির্মল ও শীতল পানি। ভাবলাম, আপনারা শহরের মানুষ এরকম পানি পাবেন কোথায়। তাই আপনার জন্য নিয়ে আসলাম। দয়া করে গ্রহণ করুন।

তারপরে বাদশাহ নির্দেশ দিলেন কলসিটির ঢাকনা খোলার জন্য; নির্দেশ পেয়ে লোকটি যখন ঢাকনা একটু খুললো, সাথে সাথে গোটা কক্ষে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। কারণ কয়েকদিন পর্যন্ত মুখ বন্ধ থাকার কারণে এবং ধুলো বালি এসে পড়ার কারণে পানির নিচে তলানি জমে নষ্ট হয়ে দুর্গন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এই অবস্থা দেখে বাদশাহ ভাবলেন, বেচারা একজন গ্রাম্য মানুষ। নিজ চিন্তা-চেতনা ও বুঝ অনুযায়ী আমার প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তির প্রকাশ করেছে। তাই তার অন্তর ভাঙ্গা উচিত হবে না। এই চিন্তা করে বাদশাহ কলসের মুখ বন্ধ করে দিলেন। এবং গ্রাম্য লোকটিকে বললেন, মাশাআল্লাহ তুমি তো খুব উত্তম হাদিয়া নিয়ে এসেছো। আসলেই এরকম পানি আমি পাবো কোথায়। বাদশাহ পানির খুব প্রশংসা করলেন এবং নির্দেশ জারী করে দিলেন, পানির পরিবর্তে তাকে এক কলসি আশরাফি দিয়ে দাও, গ্রাম্য লোকটিও এক কলসি আশরাফী পেয়ে খুবই আনন্দিত হলো– প্রফুল্লচিত্তে সে দরবার থেকে বের হয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যখন রওয়ানা হয়ে গেলো। তখন বাদশাহ তাঁর এক নওকরকে বললেন, তাকে দজলা নদীর তীর দিয়ে নিয়ে যাবে।

দজলার পাড়ে যখন গ্রাম্য লোকটি পৌছলো, সে বাদশাহর চাকরকে জিজ্ঞেস করলো, এটা কী? চাকর বললো, এটি একটি নদী। এখান থেকে পানি পান করে দেখো, তার পর গ্রাম্য লোকটি যখন সেখান থেকে পানি পান করলো, অনুভব করলো, এত মিষ্টি স্বচ্ছ ও সুস্বাদু পানি। এর তো কোনো তুলনাই হয় না। তার খেয়াল হলো, হায় আল্লাহ ! আমি বাদশাহর জন্য কী ধরনের পানি নিয়ে গেলাম! এর চাইতে কত ভালো এই নদীর পানি। এতো তার মহলের পাশ দিয়েই প্রবাহিত। আমার নেয়া পানির প্রয়োজনই তো তার নেই। তাহলে তিনি তার মহানুভবতা ও বাদান্যতার কারণেই আমার পানি গ্রহণ করেছেন। অন্যথায় আমার দুর্গন্ধ পানি গ্রহণ করার করিবর্তে আমাকে তো শাস্তি দেয়ার দরকার ছিলো। এত কিছুর পরও তিনি আমার সাথে এত সুন্দর ব্যবহার দেখালেন। উপরন্তু এক কলস আশরাফীও দান করলেন।

আমাদের ইবাদতের হাকীকত

উক্ত ঘটনা বর্ণনার পর মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন, আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে যেসব ইবাদত করি, তা হচ্ছে এই কলসির মতো। যার মধ্যে রয়েছে পঁচা দুর্গন্ধ পানি। উপরে যার ভীষণ ময়লা। তাই উচিত তো ছিলো, আমাদের কৃত ইবাদত আমাদের মুখে নিক্ষেপ করে দেয়ার। কিন্তু এটা আল্লাহ তা'আলার একান্ত রহম ও করম, তিনি নিক্ষেপের পরিবর্তে কবুল করেন। বান্দা যতটুকু ইবাদত করতে পারে, করে। এর চেয়ে অধিক কল্পনা করার যোগ্যতা তার কাছে নেই। আরো সুনিপুণভাবে, সুন্দরতম পন্থায় ইবাদত করতে সক্ষম নয় সে। কিন্তু যেহেতু সে নিখাদ ভালোবাসা, স্বচ্ছতার সাথে, ইখলাস নিয়ে ইবাদতটি করেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নেন।

মাওলানা রুমী (রহ.) আরো বলেন, আমার পেশকৃত উদাহরণটি আমাদের সকল ইবাদতের বেলায় প্রযোজ্য। আমাদের ইবাদত যেন গ্রাম্য লোকটির পানির কলসি।

তোমার প্রয়োজন আরো বেশি

যদি মেনেও নেয়া হয় যে, কেউ হয়ত অনেক মূল্যবান হীরা-জওহর বাদশাহর দরবারে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলো। তো সেই যামানার বাদশাহদের নিয়ম ছিলো, কেউ কোনো উপঢৌকন নিয়ে গেলে বাদশাহ তার উপর হাত রাখতেন কিংবা স্পর্শ করতেন। এটাই ছিলো তার গ্রহন করে নেয়ার

চিহ্ন। তারপর তিনি আবার যে হাদিয়া দিয়েছে তাকে ফিরিয়ে দিতেন এমনটি করতেন একথা বোঝানোর জন্য যে, এই উপঢৌকনের প্রয়োজন আমার চেয়ে তোমার বেশি। তাই তোমার জিনিস তোমার কাছেই রেখে দাও।

আমি দেখতে চাই তোমাদের তাকওয়া

মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন, মুসলমানগণ যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কুরবানীর নাযরানা পেশ করে এটা এমন এক নাযরানা, যে নাযরানার উদ্দেশ্য কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালানোর কারণে এটি ইবাদতে পরিণত হলো এবং আল্লাহ তা'আলাও কবুল করে নিলেন। অর্থাৎ কেমন যেন আল্লাহ তা'আলা তার উপর হাত রাখলেন এবং পশুটিও ফিরিয়ে দিলেন। সাথে সাথে ঘোষণা করে দিলেন, পশুটি নিয়ে যাও, খাও। এর গোশত, চামড়া সবকিছুই তোমাদের।

দেখুন, উম্মাতে মুহাম্মদীর কত সম্মান! একদিকে বলা হচ্ছে নাযরানা পেশ করো। অন্যদিকে যখন নাযরানার উদ্দেশ্যে রক্ত প্রবাহিত করে দেয়া হলো, আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন হয়ে গেলো, তখন বলা হয়, যথেষ্ট এতটুকুই যথেষ্ট। আমি এতটুকুই চেয়েছিলাম এই মর্মে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

এই গোশত ও খুন কিছুই আমার (আল্লাহ তা'আলার) প্রয়োজন নেই। আমি তোমাদের তাকওয়া দেখতে চাই। যখন তোমরা তাকওয়ার ভিত্তিতে এই কুরবানী পেশ করে দিলে, তখন তা আমার দরবারে কবুল হয়ে গিয়েছে। এবার এটা তোমরাই খাও। সুতরাং কেউ যদি কুরবানীর সব গোশত নিজে খেয়ে নেয়, কোনো গুনাহ হবে না।

তবে মুস্তাহাব হচ্ছে, কুরবানীর গোশ্ত তিন ভাগে ভাগ করার। একভাগ নিজের জন্য। আরেক ভাগ আত্মীয় স্বজনের জন্য। আরেক ভাগ গরীবদের মাঝে দান করার জন্য। কিন্তু কেউ যদি এক টুকরা গোশতও সদকা না করে কোনো গুনাহ হয় না। কুরবানীর সাওয়াবেও কোনো কমতি হবে না। কারণ তার তো কুরবানী করা হয়ে গিয়েছে। কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালানোর সাথে সাথে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন হয়ে গিয়েছে বিধায় সে কুরবানীর সকল ফযীলত পেয়ে যাবে।

কুরবানীর পশু পুলসিরাতের বাহন হবে কি?

জনশ্রুতি আছে যে, কুরবানীর পশু পুলসিরাতের বাহন হবে এবং কুরবানী যে করে সে ওই বাহনের উপর চড়ে পুলসিরাত পার হবে। মূলতঃ এটা একটি দুর্বল বর্ণনা থেকে বলা হয়। বর্ণনাটির শব্দমালা নিম্নরূপ–

سَمِّنُوْا ضَحَا يَاكُمْ فَاِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ.

অর্থাৎ, তোমাদের কুরবানীর পশু মোটা তাজা করো। কারণ পুলসিরাতে এটি তোমাদের বাহন হবে।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। আর দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার কারণ স্পষ্ট হওয়া ব্যতীত বর্ণনা করা যায় না। তাই হাদীসটির উপর খুব একটা বিশ্বাস না রাখাই উত্তম। অথচ কথাটি সাধারণের মাঝে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এও মনে করা হয় যে, হাদীসটি বিশ্বাস না করলে তার কুররবানীই সহীহ হবে না। আমরা হাদীসটির প্রতি আস্থাও রাখি না, অস্বীকারও করিনা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে হ্যাঁ, এই হাদীসটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ যে, কুরবানীর পশুর রক্ত জমিনে পড়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কুরবানী কবুল হয়ে যায়।

মোটকথা, কুরবানী পালন এই জন্য যে, যেন কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে মাথা নুইয়ে দেয়ার স্পৃহা জাগে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পথে নিজেকে সঁপে দেয়ার জযবা তৈরি হয়। যেমন কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَامُؤْمِنَةٍ اِذَاقَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ـ (سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ ٣٩)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফয়সালার পরে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর কোনো কথা বা সংশয় থাকতে পারে না। কবি বলেন–

سپردم بتو مایۂ خویش را
تو دانی حساب کم وبیش را

এটাই দ্বীনের হাকীকত। দয়া করে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দ্বীনের এই হাকীকত বোঝার তাওফীক দান করুন। কুরবানীর সাওয়াব ও প্রতিদান আমাদেরকে নসীব করুন। তার মধ্যে অবস্থিত সকল নূর ও বরকত আমাদেরকে দান করুন। গোটা জীবন এই শিক্ষা স্মরণ রাখার এবং এই শিক্ষানুযায়ী জীবন চালানোর তাওফীক দিন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সীরাতুন্নবী (সা.)–এর আয়নায় আমাদের জীবন

"আজ আমাদের অবস্থা হলো, শত্রুর তোষামোদ করতে গিয়ে সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিজাতীয় অনুকরণ করে শত্রুদেরকে একথা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, আমরা তোমাদের একান্ত অনুগত গোলাম। তবুও কিন্তু প্রভুরা (!) আমাদের উপর সন্তুষ্ট নয়। প্রতিদিন আমাদেরকে পেটাচ্ছে, কখনো ইসরাঈলে পেটাচ্ছে, কখনো অন্য কোনো দেশে পেটাচ্ছে। কোনো মুসলমান যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত ও আদর্শ ছেড়ে দিবে, মনে রাখবে, তখন তার জন্য অপমান আর লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নেই।

সীরাতুন্নবী (সা.)-এর আয়নায় আমাদের জীবন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا . اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ، وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا . سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ . ٢١

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ .

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে সর্বোত্তম নমুনা। [সূরা আহযাব, আয়াত ২১]

বারই রবিউল আউয়াল আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে, বিশেষতঃ ভারত উপমহাদেশে নিয়মিতভাবে একটি উৎসব দিবসের রূপ ধারণ করেছে। মাহে রবিউল আউয়াল আসার সাথে সাথে সারাদেশে সীরতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরোনামে মাহফিল,

জলসা, জুলূসের ধুম পড়ে যায়। বলা বাহুল্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মোবারক আলোচনা এতবড় সৌভাগ্যের বিষয় যার কোনো তুলনা হতে পারে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমাদের সমাজে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরকতময় আলোচনাকে রবিউল আউয়ালের সাথে; বরং শুধু বারই রবিউল আউয়ালের সাথে খাছ করে দেয়া হয়েছে। এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে, যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেন বারই রবিউল আউয়াল, তাই এদিন তাঁর জন্মদিবস পালন করা হবে। এতে তাঁর জীবন চরিত ও জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

অথচ এসব কিছু করার সময় আমরা ভুলে যাই, যে মহান ব্যক্তিত্বের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনার জন্য এ জলসা, যার জন্ম দিবস পালন করার লক্ষ্যে এ জুলূস, তাঁর শিক্ষা কী ছিলো? তিনি কি এ ধরনের কোনো জসনে জুলূস বা অনুষ্ঠান উৎসব পালন করেছেন?

মানবতার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ঘটনা

সন্দেহ নেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়াতে আগমন মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে আনন্দের, এর চেয়ে মোবারক ও পবিত্র ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি ঘটেনি। এটা এত বড় ঘটনা ইতিহাসে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো ঘটনা পাওয়া যাবে না। ইসলামে যদি কারো জন্মোৎসব পালনের বিধান থাকতো তাহলে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মোৎসব পালনই ছিলো সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত এবং এ দিবসই সবচেয়ে বড় আনন্দ-উৎসবের দিবস হিসেবে নির্ধারিত হতো। অথচ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর সুদীর্ঘ তেইশটি বছর তিনি দুনিয়াতে অবস্থান করেছেন এবং প্রতি বছরই রবিউল আউয়াল মাস এসেছে। কিন্তু কখনো তিনি বারই রবিউল আউয়ালকে জন্ম দিবস হিসেবে পালন করেননি। তাঁর কোনো সাহাবীও এ ধরনের কোনো কল্পনাও করেননি।

বারই রবিউল আউয়াল ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)

এরপর দু'জাহানের সরদার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পৃথিবী ছেড়ে পরজীবনে বিদায় নিয়ে গেলেন। রেখে গেলেন প্রায় সোয়া লাখ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। যাঁরা এমন ছিলেন যে, নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিতে সদা সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম-এর জন্য নিবেদিত প্রাণ, সত্যিকারের আশিক। এরপরেও এমন একজন সাহাবা পাওয়া যাবে না, যিনি গুরুত্ব সহকারে এ দিবসটি উদযাপন করেছেন। কিংবা কমপক্ষে এদিনে একটি মাহফিল করেছেন, মিছিল বের করেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এসব কেন করেননি? কারণ, রসম-রেওয়াজ পালন করার নাম ইসলাম নয়। যেমন অন্যান্য ধর্মালম্বীরা কয়েকটি রসম-রেওয়াজ পালন করেই তাদের ধর্ম থেকে ছুটি নিয়ে নেয়। ইসলাম এ ধরনের নয়। বরং ইসলাম হলো আমলের ধর্ম। ইসলাম প্রতিটি মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আত্মশুদ্ধির চিন্তায় ব্যস্ত রাখে এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ বা জীবনাদর্শ অনুশীলনের কাজে লাগিয়ে রাখে।

খ্রিস্ট জন্মোৎসবের সূচনা

জন্মদিবস পালনের এই প্রথা আমাদের দেশে খ্রিস্টানদের কাছ থেকে এসেছে। ২৫ শে ডিসেম্বর হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম দিবসকে christmas Day বা বড়দিন হিসেবে উদযাপন করা হয়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে তুলে নেয়ার পর থেকে প্রায় তিনশ বছর পর্যন্ত তাঁর জন্ম দিবস পালনের কোনো কল্পনাও কেউ করেনি। তাঁর সাহচর্য লাভকারী হাওয়ারিয়্যিন বা সাহাবারা কেউ কখনো এ দিবসটি পালন করেছেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তাঁর মৃত্যুর তিনশ বছর পর কিছুলোক এ কুসংস্কারটির সর্বপ্রথম সূচনা করলো এবং বললো, আমরা হযরত ঈসা (আ.) এর জন্ম দিবস পালন করবো। তখন ঈসা (আ.) এর পূর্ণ অনুসারীরা এদেরকে বলেছিল, তোমরা এই কুসংস্কার কেন শুরু করতে যাচ্ছো? হযরত ঈসা (আ.) এর শিক্ষাতে তো জন্ম দিবস পালন করার কোনো নির্দেশ নেই! তারা উত্তর দিলো, এতে ক্ষতির কী আছে? আমরা তো খারাপ কিছু করছি না! আমরা শুধু সমবেত হয়ে হযরত ঈসা (আ.) এর জীবনী আলোচনা করবো, মানুষকে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ স্মরণ করিয়ে দেবো, ফলে মানুষের মধ্যে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ মতে চলার জযবা সৃষ্টি হবে। এটা তো আমরা কোনো গুনাহের কাজ করছি না। এ যুক্তি দেখিয়ে তারা কুসংস্কারটির প্রচলন ঘটালো।

জন্মোৎসবের বর্তমান অবস্থা

প্রথম প্রথম তো এই হলো যে, ২৫ শে ডিসেম্বর এলে খ্রিস্টানরা গীর্জায় সমবেত হতো একজন পাদ্রী দাঁড়িয়ে হযরত ঈসা (আ.) এর শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ

ও জীবনী আলোচনা করতো। অতঃপর সমাবেশের সমাপ্তি ঘটতো। বলা চলে, নির্ভেজাল ও এক পবিত্র পদ্ধতিতে প্রথাটির সূচনা হলো।

কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পর তাদের মাথায় আসলো, আমরা পাদ্রীর আলোচনা তো শুনি। কিন্তু তা কেবল আমেজহীন এক আলোচনা সভা হয়। ফলে যুবক ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা এতে অংশ গ্রহণ করে না। তাই এটাকে কিছুটা আকর্ষণীয় ও মনোহর করা উচিত। যেন সকলে তাতে মোহিত হয়। অতএব তাকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বাদ্যযন্ত্র থাকা চাই। এ ভাবে বাদ্যযন্ত্রের সাথে সুরেলা গজল ও কবিতা পাঠ শুরু হলো।

আরো কিছুদিন পর তারা চিন্তা করলো, কেবল সুরেও চলবে না, এবার তার সাথে কিছু নাচ-গানও থাকা চাই। ফলে নাচ গানও তার সাথে যুক্ত হয়ে গেলো। অতঃপর তারা চিন্তা করলো, কিছু আমোদ-প্রমোদ, রং-তামাশাও হওয়া উচিত। তাই রং-তামাশার জন্য বিনোদনের আরো সমূহ উপকরণ অন্তর্ভুক্ত হলো। শেষ অবধি এভাবে সীমাতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে যে জন্মোৎসব হযরত ঈসা (আ.) এর শিক্ষার আলোচনা দিয়ে শুরু হয়েছিলো তা সাধারণ উৎসবের মতো একটি উৎসবে পরিণত হলো। পরিণামে নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা, মদ-জুয়া কোনো কিছু থেকে পবিত্র থাকলো না। মোটকথা, দুনিয়ার সব অরুচিকর কাজ, অশ্লীলতা, অবৈধতা, ভ্রষ্টতা এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। আর নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো হযরত ঈসা (আ.) এর উপদেশবাণী।

বড়দিনের পরিণাম

এখন গিয়ে দেখুন পশ্চিমা বিশ্বে এদিনে সমূহ অপরাধ ও অশ্লীলতার ঝড় বয়ে যায়। এই একদিনে এত পরিমাণ মদ সরবরাহ হয় যা সারা বছরেও হয় না। এই একদিনে যত পরিমাণ অঘটন ঘটে তা গোটা বছরেও হয় না। যত সংখ্যক নারীর সতীত্ব এই দিনে বিনষ্ট হয় পুরো বছরেও তা হয় না। আর এসব কিছুই হচ্ছে বড়দিনের নামে, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মোৎসব পালনের নামে।

মীলাদুন্নবীর প্রথম সূচনা

আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি জানতেন, মানুষকে সামান্য সুযোগ দিলে সে নিজকে অজানা গন্তব্যে নিয়ে যাবে। এজন্য তিনি কারো জন্ম দিবস পালনের সুযোগই রাখেননি। বড়দিনের ক্ষেত্রে যা হলো, মীলাদুন্নবীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। কোনো এক বাদশাহর

মাথায় ঢুকলো, খ্রিষ্টানরা যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম দিবস উদযাপন করে, তাহলে আমরা আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মোৎসব পালন করবো না কেন? এ চিন্তা থেকে ওই বাদশাহ মীলাদুন্নবী নামক প্রথার প্রচলন ঘটালো। প্রথম প্রথম এখানেও শুধু মীলাদ হতো যার মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন চরিতের আলোচনা হতো, তাঁর শানে কিছু না'ত পাঠ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে দেখুন পানি কোন্ পর্যন্ত গড়িয়েছে!

এটা হিন্দুয়ানী উৎসব

এটা তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একান্ত মু'জিযা যে, চৌদ্দশ বছর পরও তা সেই পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেনি, যতটুকু খ্রিষ্টানরা গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু এরপরেও দেখার বিষয় হচ্ছে, আজ মীলাদুন্নবী উপলক্ষে পথে ঘাটে কী হচ্ছে! কীভাবে রওযা শরীফের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হচ্ছে। কীভাবে কা'বা শরীফের প্রতিকৃতি স্থাপন করে তার চারপাশে মানুষ তাওয়াফ করছে। কী ভাবে এর চতুর্দিক রেকর্ডিং হচ্ছে। কীভাবে আলোকসজ্জা করা হচ্ছে এবং পতাকা ইত্যাদি উড়ানো হচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ। অবস্থা দেখে মনে হয় এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতের কোনো উৎসব নয়; বরং হিন্দু-খ্রিষ্টানদের অনুরূপ কোনো উৎসব। ধীরে ধীরে তাতে আরো বহু রকমের কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করছে।

এটা ইসলামের রীতি নয়

সবচেয়ে জঘন্যতম দিক হলো, এসব কিছু দ্বীনের নামে হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে হচ্ছে। সব কিছু এ আশায় করা হচ্ছে যে, এসব কাজের বিনিময়ে সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া যাবে। আরো মনে করা হচ্ছে, আজ বারই রবিউল আউয়াল বাড়ি ঘর আলোকসজ্জিত করে, রাস্তাঘাট সুসজ্জিত করে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতের হক আদায় করে ফেলছি।

যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমরা দ্বীনের উপর আমল কর না কেন? উত্তরে তারা বলে দেয়, আমরা তো মীলাদুন্নবী পালন করি। আমাদের এখানে তো মীলাদ মাহফিল হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবসে আলোকসজ্জা করা হয়। এভাবে দ্বীনের দাবি পূরণ হয়ে যায়। অথচ আদৌ এটা ইসলামের রীতি নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত

পথও নয় এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর রীতিও নয় এটি। যদি এই পথে কল্যাণ ও বরকত থাকতো তাহলে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.), হযরত আলী (রা.) কখনো এ কাজে ত্রুটি করতেন না।

ব্যবসায়ীর চেয়ে শেয়ানা পাগল

আমার আব্বাজান হযরত মুফতী শফী (রহ.) হিন্দী ভাষায় একটি প্রবাদ বলতেন- بنیے سے سیانا سو باؤلا অর্থাৎ, যদি কেউ দাবি করে সে ব্যবসায় বেনিয়াদের চেয়ে বহুত শেয়ানা এবং ব্যবসা তাদের চেয়ে বেশি বুঝে, তাহলে বুঝতে হবে এ ব্যক্তির মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটেছে, এ ব্যক্তি পাগল। কারণ ব্যবসা ব্যবসায়ীর চেয়ে কেউ বেশি বুঝে না। অতঃপর আব্বাজান বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর চেয়ে বেশি ইশক ও মহব্বতের দাবি করবে, সে নিরেট পাগল, আহমক, নির্বোধ বৈ কিছু নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ইশক ও মহব্বত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ছিলো সবচেয়ে বেশি। এ বিষয়ে অন্য কেউ তাদের তুলনা হতে পারে না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়াতে আগমনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর রীতিনীতিতে জলসা-জুলূস, আলোকসজ্জা-প্ল্যাকার্ড, পতাকা উত্তোলণ এবং সাজসজ্জা ইত্যাদির কোনোটাই ছিলো না। তবে একটি বস্তু তাদের মধ্যে ছিলো তা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সীরাত ও জীবনাদর্শ অনুশীলন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা অনুসরণ করতেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সীরাতকে। তাঁদের প্রতিটি দিন পবিত্র সীরাতের দিন, তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত পবিত্র সীরাতের মুহূর্ত। প্রতিটি কাজ পবিত্র সীরাতের কাজ।

মোটকথা, তাঁদের কোনো একটি কাজও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সীরাত ও আদর্শের বাইরে ছিলো না। কারণ তাঁরা জানতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পৃথিবীর বুকে এজন্য আগমন করেন নি যে, তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হবে কিংবা তিনি প্রশংসা কুড়াবেন, তার শানে না'ত রচিত ও পঠিত হবে। আল্লাহ না করুন যদি এ উদ্দেশ্যই হতো তাহলে

তখনকার মক্কার কাফেররা তাঁকে এই আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিয়েছিলো যে, হে মুহাম্মাদ! যদি আপনি আরবের নেতা হতে চান, আমরা আপনাকে নেতা মেনে নিতে প্রস্তুত। যদি আপনি ধন-সম্পদ চান, ধন-সম্পদের স্তূপ আপনার পদতলে এনে দিতে আমরা প্রস্তুত। যদি আপনি সুন্দরী নারী চান, আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী আমরা সংগ্রহ করে দিতে প্রস্তুত। তবে শর্ত হলো, ধর্মশিক্ষার প্রচার পরিত্যাগ করতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যদি এসব কিছুর প্রতি আগ্রহ থাকতো, তাহলে অবশ্যই তিনি তাদের এ মোহনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে নিতেন। ফলে কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, অর্থ-প্রতিপত্তি, পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ বিলাসের উপকরণ তিনি পেয়ে যেতেন। কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, যদি তোমরা আমার এক হাতে সূর্য আরেক হাতে চন্দ্রও এনে দাও, তবুও আমি আমার দ্বীন প্রচার থেকে পিছপা হবো না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এ পৃথিবীতে এজন্য আগমন করেন নি যে, তার জন্মোৎসব উদযাপন করা হবে। বরং তার আগমনের উদ্দেশ্য ছিলো, যা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ، وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ (سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ ـ ٢١)

অর্থাৎ, আমি তোমাদের জন্য আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোত্তম আদর্শরূপে পাঠিয়েছি, যেন তোমরা তাঁকে অনুসরণ করতে পারো। আর ওই ব্যক্তির জন্য প্রেরণ করেছি যে আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান রাখে এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে আর আল্লাহ তা'আলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

মানুষ আদর্শের মুখাপেক্ষী

প্রশ্ন জাগে, বিশেষ কোনো আদর্শের কেন প্রয়োজন? কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন। আমরা তা পড়ে তাঁর হুকুম-আহকাম পালন করতে থাকবো। তাতেই তো চলবে, আদর্শের এমন প্রয়োজনই বা কী? মূলতঃ আদর্শ প্রেরণ করার প্রয়োজন এজন্য ছিলো যে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো, কেবল কিতাব-বই-পুস্তক তার সংশোধনের জন্য, তাকে কোনো শাস্ত্রজ্ঞান ও শিল্প

শেখানোর জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এজন্য কোনো মুরব্বী বা অভিভাবকের বাস্তব নমুনা প্রয়োজন। কোনো নমুনা বা আদর্শ সামনে না থাকলে শুধু বই পড়েও কোনো জ্ঞান-শাস্ত্র শিক্ষা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারটিকে মানুষের স্বভাবের মাঝে প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন।

ডাক্তারের জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন

কেউ যদি মনে করে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট বই-পুস্তক লেখা হয়েছে। আমি ওই বইগুলো পড়ে অন্যদের চিকিৎসা শুরু করে দেবো। সে পড়তেও জানে, মেধাও তীক্ষ্ণ, সমঝদারও বটে। তাই সে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই-পুস্তক পড়ে চিকিৎসা শুরু করে দিলো। এর দ্বারা কবরস্থান আবাদ করা ছাড়া তার পক্ষে অন্য কোনো কিছু সম্ভব হবে না।

এই কারণে চিকিৎসা শাস্ত্রের সার্বজনীন নিয়ম হলো, কেউ এম. বি. বি. এস ডিগ্রি অর্জন করলে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ প্রাকটিসের অনুমতি দেয়া হয় না, যতক্ষণ সে নির্দিষ্ট নিয়মে হাউজ জব না করবে। যে পর্যন্ত সে কোনো হাসপাতালে অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থেকে বাস্তব নমুনা না দেখবে, সে সঠিক ডাক্তারী করতে পারবে না। কারণ এ পর্যন্ত যদিও সে চিকিৎসা শাস্ত্রের বহু বই-পুস্তক পড়েছে, কিন্তু বাস্তব নমুনা এখনো তার সামনে আসেনি। বিজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকার মাধ্যমে তার পঠিত বই-পুস্তকের আলোকে রোগও রোগের চিকিৎসা নিরাময় রোগীর মাঝে সরাসরি দেখে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করবে। তারপর তাকে সাধারণ প্রাকটিসের অনুমতি দেয়া হবে।

বই পড়ে কোর্মা বানানো যায় না

বাজারে খাবার পাকানোর নিয়ম পদ্ধতি সম্বলিত বই-পুস্তকের অভাব নেই। এ সব বই-পুস্তকে হরেক রকম খাবার বানানোর নিয়ম পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে, বিরিয়ানী পাকাতে হয় এভাবে, পোলাও তৈরি করতে হয় এভাবে, কাবাব এভাবে তৈরি করতে হয়, এ ভাবে তৈরি করতে হয় কীমা। এখন এক ব্যক্তি যে কখনো খাবার পাকায়নি বই সামনে রেখে প্রণালী দেখে দেখে যদি কোর্মা পাকায়, আল্লাহ জানেন সে তখন কী তৈরি করবে। হ্যাঁ, কোনো উস্তাদ বা অভিজ্ঞ বাবুর্চি তাকে সামনে রেখে যদি বলে দেয়, দেখো, কোর্মা এভাবে পাকাতে হয়। এই বলে সে যদি তার বাস্তব নমুনা সামনে পেশ করে, তাহলে অবশ্য সে রুচিসম্মত কোর্মা পাকাতে পারবে।

কেবল বই-পুস্তকই যথেষ্ট নয়

উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেলো, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন যে, যতক্ষণ না তার সামনে কোনো অভিজ্ঞ অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কের বাস্তব নমুনা পেশ হবে, ততক্ষণ সে সুস্থ ও সঠিক পথ ও পন্থা লাভ করতে পারবে না এবং কোনো শাস্ত্র বা শিল্প যথাযথভাবে শিখতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহ তা'আলা নবী প্রেরণের যে সিলসিলা সৃষ্টি করেছেন, মূলতঃ তা এই উদ্দেশ্য বাতলে দেয়ার জন্যই যে, আমি তো কিতাব প্রেরণ করলাম। তবে শুধু কিতাব তোমাদের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না উক্ত কিতাবের উপর আমলকারী বাস্তব কোনো নমুনা বা আদর্শ থাকবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন, আমি আমার রাসূল কে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যেন তোমরা দেখতে পাও এই কুরআন হলো তোমাদের জীবন বিধান। আর আমার নবী হলেন উক্ত জীবন বিধানের উপর বাস্তব আমলকারী, বিধায় তিনি তোমাদের জন্য নমুনা ও আদর্শ।

নববী শিক্ষার আলো প্রয়োজন

আল-কুরআনুল কারীম অন্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ঘোষণা করেছে–

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ ـ (سُوْرَةُ مَائِدَة: ١٥)

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রথমতঃ তো একটি স্পষ্ট গ্রন্থ তথা আল-কুরআন এসেছে, সাথে সাথে একটি নূরও এসেছে।

আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি কারো নিকট কিতাব থাকে এবং কিতাবে সবকিছু উল্লেখ থাকে কিন্তু তার নিকট আলো নেই, না আছে সূর্যের আলো, না আছে দিনের আলো, না আছে বাতির আলো, না আছে বৈদ্যুতিক আলো, বরং আছে কেবল অন্ধকার, তাহলে আলো ছাড়া উক্ত কিতাব থেকে উপকৃত হওয়া যাবে না। অনুরূপ যদি দিনের আলো বিদ্যমান থাকে, থাকে বৈদ্যুতিক আলো, কিন্তু তার যদি দৃষ্টি শক্তি না থাকে তবে কিতাব থেকে উপকার লাভ করতে পারবেন না। তাই আমি (আল্লাহ তা'আলা) আল-কুরআনের সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষার আলো পাঠিয়েছি। যতক্ষণ শিক্ষার এই আলো তোমাদের সাথে না থাকবে ততক্ষণ

তোমরা আল-কুরআন বুঝতে পারবে না এবং তার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চলতে সক্ষম হবে না।

রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা পুরোটাই নূর

কোনো কোনো অযোগ্য ও অপরিণামদর্শী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্য করে থাকে। রাসূল সত্তাগত দিক থেকে মানুষ ছিলেন না; বরং নূর ছিলেন। জনাব! এটা তো লক্ষ্য করতে হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষার আলোর সাথে বিজলীর আলো কিংবা টিউবলাইটের আলোর কোনো তুলনাই তো হয় না।

মূলতঃ উক্ত আয়াতের মাধ্যমে এই কথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা ও আদর্শ পেশ করেছেন তা এমন নূর বা আলো যার মাধ্যমেই তুমি পবিত্র কুরআনের উপর সঠিকভাবে আমল করতে পারবে। এ আলো ছাড়া অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে কুরআনুল কারীমের উপর যথাযথ ভাবে আমল করতে তুমি সক্ষম হবে না। আল্লাহ তা'আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এজন্য পাঠিয়েছেন যে, তার শিক্ষার আলো কুরআন মজীদের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করবে। এ আলো তোমাকে সঠিক পথ দেখাবে। তোমার সামনে বাস্তব ও আমলি নমুনা পেশ করে দেখিয়ে দিবে, কুরআন শরীফের উপর আমল করতে যদি চাও তাহলে এভাবে করো।

এভাবে আমি আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণ নমুনা ও আদর্শ বানিয়ে দিয়েছি। এটা এমন নমুনা যে, মানুষ তার দৃষ্টান্ত পেশ করতে সক্ষম হবে না। এ আদর্শ এজন্য পাঠিয়েছি যে, তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে এবং অনুসরণ করবে। তোমাদের দায়িত্ব শুধু এতটুকুই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আদর্শ

যদি তুমি পিতা হও, তাহলে দেখো ফাতেমা (রা.) এর পিতা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করতেন? যদি তুমি স্বামী হও তাহলে দেখো আয়েশা (রা.) আর খাদীজা (রা.) এর স্বামী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করতেন? যদি তুমি শাসক হও তাহলে দেখো মদীনার শাসক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন? যদি তুমি মজদুর হও তাহলে দেখো মক্কার পাহাড় পর্বতের বকরীর রাখাল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করতেন? যদি তুমি ব্যবসায়ী হও তাহলে দেখো বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরিয়াতে ব্যবসা করতে গিয়ে কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন? তিনি ব্যবসাও করেছেন, কৃষি কাজও করেছেন, মজদুরীও করেছেন, রাজনীতিও করেছেন, সামাজিক কাজও করেছেন। জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্তা আদর্শরূপে নেই। তোমাদের কাজ শুধু তার আদর্শ গ্রহণ করে তাঁকে অনুসরণ করা। বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমি (আল্লাহ) আমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছি। এজন্য প্রেরণ করিনি যে, তাঁর জন্মদিবস পালন করা হবে। কিংবা তাঁর জন্মোৎসব পালন করে মনে করা হবে, তাঁর হক আদায়ে করে ফেলেছি, বরং এজন্য প্রেরণ করেছি যে, তাকে তোমরা এমনভাবে অনুসরণ করবে যেমন অনুসরণ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)।

মজলিসের একটি আদব

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সর্বদা ফিকিরে থাকতেন, কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করা যায়? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এমনতিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী হননি।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে খুতবা (বয়ান) দিচ্ছিলেন। খুতবার মাঝখানে তিনি লক্ষ্য করলেন, কিছু লোক বিক্ষিপ্তভাবে মসজিদের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। যেমনটি বর্তমানেও হয়ে থাকে, কোথাও ওয়াজ মাহফিল হলে দেখা যায়, কিছু লোক মাহফিল স্থলের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা বসেও না, আবার চলেও যায় না। এভাবে বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মজলিসের আদবের পরিপন্থী। কারো শোনার ইচ্ছা থাকলে বসে পড়া উচিত। আর শুনতে মন না চাইলে চলে যাওয়া উচিত। কারণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে বক্তার মন এলোমেলো হয়ে যায়, শ্রোতারও মনোযোগ ঠিক থাকে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, বসে যাও। যখন তিনি এ নিদের্শ দিলেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ছিলেন পথের উপর, তিনি আসছিলেন মসজিদে নববীর দিকে। এখনও তিনি মসজিদে প্রবেশ করেননি। এমন সময় তাঁর কানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আওয়াজ পৌছল, বসে যাও। তিনি সাথে সাথে সেখানেই পথের উপর বসে গেলেন।

খুতবা শেষে যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাত হলো, তিনি বললেন, আমি তো বসার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম তাদেরকে যারা মসজিদের আশপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। তুমি তো ছিলে রাস্তায়। রাস্তায় বসার জন্য তো আমি বলিনি, তুমি সেখানে বসলে কেন? উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ কানে এলো, বসে যাও; তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের জন্যে মোটেও সম্ভব ছিলো না যে, সামনে এক কদম অগ্রসর হবে।

ঘটনা এমন ছিলো না যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) জানতেন না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে রাস্তায় বসে যাওয়ার নির্দেশ দেন নি। বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো, যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ কানে পৌছলো, বসে যাও; এরপর তিনি আর কদম চালাতে পারছিলেন না।

এই ছিলো সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর আনুগত্যের দৃষ্টান্ত। তাঁরা এমনিতেই সাহাবা হয়ে যাননি। ইশক, মহব্বতের দাবিদার তো অনেক। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ইশকের ন্যায় আরেকটি নমুনা কেউ পেশ করতে পারবে কি?

যুদ্ধের ময়দানে আদব রক্ষার দৃষ্টান্ত

উহুদের ময়দানে যখন হযরত আবু দুজানা (রা.) দেখলেন স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর বৃষ্টির মতো তীর বর্ষিত হচ্ছে। তখন হযরত আবু দুজানা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে আড়াল হয়ে দাঁড়াতে চাইলেন। যদি তীরের দিকে বুক দিয়ে আড়াল হয়ে দাঁড়ান তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে পিঠ দিতে হয়। আর যুদ্ধের ময়দানে তাঁর পিঠ থাকবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে, এটা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। তাই তিনি নিজের বুক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে দিলেন এবং পিঠ দিলেন শত্রুবাহিনীর দিকে। এভাবে তিনি নিজের পিঠে সব তীর নিতে লাগলেন যেন যুদ্ধের ময়দানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে পিঠ দেয়ার বেয়াদবী না হয়।

হযরত উমর (রা.) এর ঘটনা

হযরত উমর ফারুক (রা.) মসজিদে নববী থেকে দূরে বাসস্থান করে সেখানে থাকতে শুরু করলেন। দূরত্বের কারণে প্রতিদিন মসজিদে নববীতে আসা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়লো। তাঁর প্রতিবেশী হিসেবে একলোক সেখানে থাকতেন। তিনি তাঁর সাথে এই মর্মে চুক্তি করে নিলেন যে, একদিন আপনি যাবেন একদিন আমি যাবো। আপনি যেদিন যাবেন ফিরে এসে আমাকে জানাবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ কী বলেছেন, আর আমি যেদিন যাবো ফিরে এসে আপনাকে জানাবো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী ইরশাদ করেছেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র যবান নিঃসৃত কোনো কথা ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকবে না। এভাবেই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিটি কথা ও সুন্নাত রক্ষায় সদা সচেষ্ট থাকতেন। প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিলেন।

আমার মুরব্বীর সুন্নাত ছাড়তে পারি না

হযরত উসমান (রা.) হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মক্কাতে তাশরীফ নিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দূত হিসেবে। সেখানে পৌঁছে তাঁর চাচাতো ভাইয়ের ঘরে অবস্থান নিলেন। সকালে যখন মক্কার নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য ঘর থেকে বের হলেন। তখন তাঁর পায়জামা টাখনুর উপরে আধগোছা পর্যন্ত ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা হলো, টাখনুর নিচে পায়জামা লটকানো নাজায়েয। যদি কাপড় টাখনুর উপরে থাকে তাহলে হারাম নয়। তবে সাধারণতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাপড় পরতেন পায়ের অধগোছা (নিছফেছাক্ব) পর্যন্ত। তার নিচে কখনো তিনি পরিধান করতেন না। হযরত উসমান (রা.)-এর চাচাতো ভাই বললেন, জনাব! আরবদের রীতি হলো যার কাপড় যত বেশি নিচের দিকে ঝুলানো থাকবে তাকে তত বেশি অভিজাত ও মর্যাদাশীল মনে করা হবে। এজন্য আরবদের নেতৃস্থানীয় লোকরা কাপড় নিচের দিকে ঝুলিয়ে পরে। তাই আপনি যদি টাখনুর উপর কাপড় পরে তাদের সামনে এভাবে যান, তাহলে আপনার ভাবমূর্তি তাদের সামনে ক্ষুন্ন হবে এবং আলোচনা ফলপ্রসু হবে না। চাচাতো ভাইয়ের কথা শুনে হযরত উসমান গণী (রা.) উত্তর দিলেন—

لا : هكذا ازرة صاحبنا صلى الله عليه وسلم .

না, আমি পরতে পারবো না। আমাদের মুরব্বী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাপড় এরূপই আছে। তারা আমাকে সম্মান করুক বা আপমান করুক, যা ইচ্ছা তা-ই করুক, এতে আমি পরোয়া করি না। আমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাপড় পরিধান করতে দেখেছি। তিনি যেমন পরিধান করেন, আমিও তেমনি পরিধান করবো। এতে কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটানো আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়।

এসব আহমকদের কারণে সুন্নাত ছেড়ে দেবো কি?

ইরান বিজয়ী হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)-এর কথা বলছি। যখন তিনি ইরানে পারস্য বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। তখন পারস্য বাদশাহ আলোচনার জন্য তাঁকে দরবারে ডেকে আনলেন। দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর তাঁর সামনে যত্ন সহকারে খাবার পেশ করা হলো। তিনি খানা আরম্ভ করলেন। খাবারের মাঝখানে তাঁর হাত থেকে একটি লোকমা নিচে পড়ে গেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা হলো। খাবারের কোনো লোকমা যদি নিচে পড়ে যায় তাহলে তা নষ্ট করা যাবে না। কারণ তা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। আর কেউ বলতে পারে না, রিযিকের কোন অংশে আল্লাহ তা'আলা বরকত রেখেছেন। তাই পড়ে যাওয়া লোকমা বেকদরি করা যাবে না, বরং তা উঠিয়ে নিতে হবে। যদি তাতে ধুলা মাটি লেগে যায়, পরিষ্কার করে খেয়ে নিতে হয়।

যাক, যখন খাবারের লোকমা নিচে পড়ে গেলো, হযরত হুযাইফা (রা.)-এর মনে পড়ে গেলো রাসূল (রা.)-এর উক্ত শিক্ষা। তাই তিনি লোকমাটি তুলে খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। তাঁর পাশে এক ব্যক্তি বসা ছিলেন। তিনি তাঁকে হাতের কনুই দ্বারা গুতো দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, হুযাইফা! আপনি এ কী করছেন? এটা যে পৃথিবীর সুপারপাওয়ার কিসরার দরবার! আপনি পড়ে যাওয়া লোকমাটি তুলে খেতে নিলে এই দরবারে আপনার মূল্যায়ন কমে যাবে। এরা মনে করবে, এই ব্যক্তি তো অত্যন্ত নীচু প্রকৃতির লোক। অতএব, আজ লোকমা তুলে খাবার সময় ও পরিবেশ নেই। অতএব, এটা পরিহার করুন।

জবাবে হযরত হুযাইফা (রা.) দৃঢ়ভাবে বললেন–

أَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ؟ .

আমি কি এই নির্বোধদের কারণে আমার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতকে পরিহার করবো?

অর্থাৎ, এরা ভালো কিংবা মন্দ যাই মনে করুক, সম্মান করুক বা উপহাস করুক আমি কিন্তু আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত ছাড়তে পারবো না।

কিসরার অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন

এবার বলুন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সুন্নাতের উপর আমল করে সম্মানিত হয়েছেন নাকি আমরা সুন্নাত ছেড়ে সম্মান লাভ করেছি? বরং তাঁরা সুন্নাতের উপর আমল করেই মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছেন। এমন মর্যাদা যে, একদিকে তো সুন্নাতের উপর আমল করতে গিয়ে পতিত লোকমা তুলে খেলেন। অন্যদিকে পারস্য সম্রাটের দম্ভ ও অহংকার এমনভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন–

إِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلَا كِسْرٰى بَعْدَهُ

যেদিন থেকে কিসরা ধ্বংস হবে এরপর আর কোনো কিসরা জন্ম নেবে না। পৃথিবী থেকে তার নাম নিশানা চিরতরে মুছে যাবে।

আপন পোশাক ছাড়বো না

এই ঘটনার পূর্বে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। যখন হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) ও রাবয়ী ইবনে আমের (রা.) কিসরার সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে তাঁর দরবারে গমন করেছিলেন, তাঁদের পরিধানে ছিলো সাদাসিধে পোশাক। দীর্ঘ সফর করে আসার কারণে পোশাক কিছুটা ধুলোয় মলিন ছিলো। ফলে দরবারের প্রধান ফটকের প্রহরী তাঁদেরকে বাধা দিয়ে বললো, এত বড় মহান সম্রাট কিসরার দরবারে আপনারা এই পোশাকে যেতে চাচ্ছেন? একথা বলে সে একটি জুব্বা দিয়ে বললো, এই জুব্বা পরে দরবারে প্রবেশ করুন। জবাবে রাবয়ী ইবনে আমের (রা.) প্রহরীকে বললেন, কিসরার দরবারে যেতে হলে যদি তাঁর প্রদত্ত এই জুব্বা পরা আবশ্যক হয়, তাহলে তাঁর দরবারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যেতে হলে আমরা আমাদের পোশাকেই যাবো। যদি এই পোশকে তিনি আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে না চান, তাহলে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার কোনো আগ্রহ নেই আমাদের সুতরাং আমরা ফিরে যাচ্ছি।

তরবারি দেখেছো বাহুও দেখে নাও

প্রহরী আন্দর মহলে সংবাদ পাঠালো বড় অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ এসেছে। আমাদের পোশাকও গ্রহণ করতে রাজী নয়। ইত্যবসরে হযরত রাবয়ী ইবনে আমের (রা.) নিজের ভোতা তরবারীখানা ঘষা মাজা করতে লাগলেন। প্রহরী তরবারী দেখে বললো, আমাকে তোমার তরবারীটা একটু দেখাও। তিনি তাকে তরবারীটি দিলেন। তরবারী দেখে সে বলে উঠলো, এই তরবারী দিয়ে তোমরা পারস্য জয়ের স্বপ্ন দেখছো? রাবয়ী ইবনে আমের (রা.) জবাব দিলেন, তুমি তো শুধু তরবারী দেখেছো, তরবারী চালনাকারীর বাহুতো দেখনি। সে বললো, আচ্ছা বাহুও দেখিয়ে দাও। তখন হযরত রাবয়ী ইবনে আমের (রা.) বললেন, বাহু দেখতে চাও? তাহলে তরবারি প্রতিহতকারী এই দরবারের সবচেয়ে মজবুত ঢালটি নিয়ে এসো। তারপর আমার বাহুর শক্তি পরখ করো। ফলে দরবারের সবচেয়ে মজবুত ঢালটি নিয়ে আসা হলো, যার সম্পর্কে জনশ্রুতি হলো, যত ধারালো তরবারীই হোক না কেন, তা মোটেও ভেদ করতে পারবে না। হযরত রাবয়ী ইবনে আমের (রা.) বললেন, একজন আমার সামনে ঢালটি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও! তখন এক ব্যক্তি উক্ত ঢালটি নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। হযরত রাবয়ী ইবনে আমের (রা.) তাঁর ভোতা তরবারী দ্বারা এক আঘাতে ঢালটি দু'টুকরো করে ফেললেন। সমস্ত মানুষ এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলো। বলাবলি করতে লাগলো, দুর্জেয় এই মানুষগুলো না জানি কী করে!

এই হলেন ইরান বিজয়ী

এই দৃশ্য দেখে অবশেষে প্রহরী রাজ দরবারে গিয়ে সংবাদ জানালো অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ এসেছে। বিরল তাঁর আচরণ। মহামান্য সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত পোশাক গ্রহণ করতে সে রাজী নয়। তার তরবারিখানি দেখতে মনে হয় ভোতা ও জং ধরা। কিন্তু এই তরবারী দ্বারাই দরবারের সবচেয়ে শক্তিশালি ঢালটি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে।

যাক, কিছুক্ষণ পর তাকে দরবারে নিয়ে যাওয়া হলো। কিসরার দরবারের বিধি ছিলো সে নিজে থাকবে সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর অবশিষ্টরা দাঁড়িয়ে থাকবে। হযরত রাবয়ী ইবনে আমের (রা.) কিসরাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শে বিশ্বাসী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ এটা নয় যে, একজন বসা থাকবে আর অবশিষ্টরা দাঁড়িয়ে থাকবে। তাই আমরা এভাবে আলোচনা

শুরু করতে প্রস্তুত নই। হয়তো আমাদের জন্য কুরসির ব্যবস্থা করা হোক, কিংবা সম্রাটও আমাদের সামনে দণ্ডায়মান হোক।

কিসরা বাদশাহ যখন এই অবস্থা দেখলো যে, এরা তো আমাদেরকে অপমান করতে এসেছে। তিনি নির্দেশ দিলেন; একটি মাটির টুকরি পূর্ণ করে তাদের মাথায় দিয়ে দরবার থেকে বের করে দাও। আমি তাদের সাথে আলোচনাই করবো না। নির্দেশ মোতাবেক কার্য সমাধা হলো, মাটি ভর্তি টুকরি নিয়ে দরবার থেকে বের হওয়ার সময় হযরত রাবয়ী ইবনে আমের (রা.) সম্রাটকে লক্ষ্য করে বললেন, হে কিসরা! মনে রেখো তুমি নিজেই আমাদেরকে পারস্যের মাটি দিয়ে দিলে! একথা বলেই তিনি বের হয়ে গেলেন।

ইরানের লোকেরা ছিলো অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ। তারা চিন্তায় পড়ে গেলো যে, তারা যে বললো, 'তোমরা পারস্যের মাটি আমাদেরকে দিয়ে দিলে।' এটা তো বড় কুলক্ষণের কথা। তাই কিসরা তৎক্ষণাৎ তাদের পেছনে এই বলে লোক পাঠালেন যাও, এক্ষুণি মাটির টুকরিটি ফেরত নিয়ে এসো। কিন্তু মাটি তো রাবয়ী ইবনে আমের (রা.)-এর মতো দুর্জেয় ব্যক্তির হাতে। সে তাকে আর পায় কোথায়। তিনি মাটির টুকরি নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। ঘটনাটি এই জন্য ঘটলো, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইরানের মাটি এসব ভাঙ্গা তরবারীধারীদের ভাগ্যেই লিখে দিয়েছেন।

আজ মুসলমান লাঞ্ছিত কেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ করে তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) গোটা পৃথিবীকে করতলগত করেছিলেন। অথচ আজ আমরা এই ভয়ে সন্ত্রস্ত যে, যদি অমুক সুন্নাতের উপর আমল করি, পাছে লোকে আমাদের কী বলবে? যদি অমুক সুন্নাতের অনুসরণ করি দুনিয়বাসী আমাদেরকে উপহাস করবে। ইংল্যান্ড উপহাস করবে। অমুক রাষ্ট্রের মানুষ তোমাদেরকে উপহাস করবে। পরিণামে আমরা আজ অপমানিত হচ্ছি।

আজ বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ আবাসভূমি মুসলমানদের হাতে। বর্তমান বিশ্বে যে পরিমাণ মুসলমান আছে এর পূর্বে তা কখনো ছিলো না এবং আজ মুসলমানদের হাতে ধন-সম্পদ ও উন্নয়নের যত পথ ও পন্থা আছে, ইতোপূর্বে তা কখনো ছিলো না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গিয়েছেন, এক সময় এমন হবে যে, সংখ্যায় তোমরা অনেক হবে, কিন্তু

তোমাদের অবস্থা হবে পানির স্রোতে ভাসমান খড়-কুটার ন্যায় যার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই।

আজ আমাদের অবস্থা হলো, শত্রুর তোষামোদ করতে গিয়ে সবকিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। নিজেদের নৈতিকতা, আমল, সীরাত, আদর্শ, স্বাতন্ত্রিকতা ও বৈশিষ্ট্য সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েছি। এমনকি নিজেদের আকৃতি পর্যন্ত পাল্টে ফেলেছি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিজাতীয় অনুকরণ করে শত্রুদেরকে একথা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, আমরা তোমাদের একান্ত অনুগত গোলাম। তবুও কিন্তু প্রভুরা আমাদের উপর সন্তুষ্ট নয়। প্রতিদিন আমাদেরকে মারছে, কখনো পেটাচ্ছে ইসরাঈল, কখনো অন্য কোনো দেশ। মনে রাখবে, কোনো মুসলমান যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত ও আদর্শ ছেড়ে দিবে, তখন তার ভাগ্যে অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।

কবি আসআদ মুলতানী নামক একজন বিদগ্ধ কবি ছিলেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিতা লিখতেন তিনি। তাঁর উর্দু কবিতার দু'টি পংক্তি শুনুন–

کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا
کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا
ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے
زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا

কারো আস্তানা এত উঁচু যে, মাথা নোয়ালেও উঁচুই থাকে। তোমরা হাসি তামাশাকে যত দিন ভয় করবে, যামানা তোমাদের উপর ততদিন হাসতেই থাকবে।

দেখে নাও, বাস্তবেও যামানা হেসেই যাচ্ছে। আর যদি তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দাও, তাহলে দেখতে পাবে দুনিয়া তোমাকে কিরূপ সম্মান করছে।

মুমিনের জন্য ইত্তিবায়ে সুন্নাত আবশ্যক

এখানে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রশ্ন হতে পারে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতসমূহ ত্যাগ করলে লাঞ্ছিত হতে হয়। অথচ আমরা দেখতে পাই, সমস্ত কাফের মুশরিক তথা আমেরিকা ও ইউরোপীয়

দেশগুলোতে সুন্নাতে রাসূল প্রতিনিয়ত ত্যাগ করা হচ্ছে। তবুও তারা দিন দিন উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের সম্মান-প্রতিপত্তি দৈনন্দিন শুধু বেড়েই চলছে। তারা কেন উন্নতি লাভ করছে?

আসল ব্যাপার হলো, তোমরা ঈমানদার। তোমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কালিমা পড়েছো। তোমরা যতদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদতলে নিজেকে সোপর্দ না করবে, ততদিন তোমরা মার খেতেই থাকবে। ইজ্জত সম্মানের ছোঁয়াও তোমরা পাবে না। কাফেরদের জন্য তো শুধুই দুনিয়া আর দুনিয়া। তারা এই দুনিয়াতে উন্নতি লাভ করবে, সম্মান কুড়াবে, যা চায় তাই পাবে। চৌদ্দশ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে, মুসলমানগণ যতদিন পর্যন্ত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ করেছে, ততদিন তারা সম্মান পেয়েছে। প্রভাব-প্রতিপত্তি, শান-শাওকতও ছিলো তাদের এবং নেতৃত্বের আসনেও তাঁরাই অধিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু যখনি তারা সুন্নাত ছেড়ে দিয়েছে, তখনি তাঁদের উপর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমান নেমে এসেছে।

জীবনের হিসাব কষো

মোটকথা ওয়াজ মাহফিল তো অনেক হচ্ছে। সভা-সেমিনারও কম হচ্ছে না। কিন্তু এতকিছুর মধ্য দিয়েও আমাদের জীবনের পরিবর্তন হয়েছে কতটুকু? আমাদের জীবনে কতটুকু পরিবর্তন এসেছে? তাই আজ আমরা একটি ওয়াদা করবো যে, আজ থেকে আমরা হিসাব করে দেখবো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সুন্নাতটির উপর আমল করছি আর কোনটি ছেড়ে দিচ্ছি। কোন সুন্নাতটির উপর এখনি আমি আমল শুরু করতে পারবো। কোনটির উপর আমল শুরু করার জন্য একটু সময় সুযোগের প্রয়োজন। যে সুন্নাতটির উপর এখনই আমি আমল শুরু করতে পারবো, তার উপর আমল শুরু করে দেই এবং সেটির প্রতি যত্নবান হই।

আল্লাহ তা'আলর প্রিয় হয়ে যাও

আমাদের শায়েখ ডাক্তার আব্দুল হাই সাহেব (রহ.) বলতেন, বাথরুমে অথবা গোসলখানায় প্রবেশের সময় বাম পা প্রথমে দাও এবং প্রবেশ করার পূর্বে এই দু'আ পড়ো–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

সাথে সাথে এই নিয়ত করো যে, কাজটি আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণে করছি। এভাবে করলে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত লাভ করতে পারবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ . (سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ : ٣١)

তোমরা আমার অনুকরণ করলে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হতে পারবে।

ছোট ছোট কাজেও সুন্নাতের খেয়াল করো, আল্লাহ তা'আলার মাহবুব হতে পারবে। আর যখন আপাদমস্তক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের উপর আমল করবে তখন আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ মাহবুব হতে পারবে।

আমাদের শাইখ ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) বলতেন, আমি দীর্ঘ দিন এই আমলের অনুশীলন করেছি। ঘরে প্রবেশ করেছি, খানা সামনে এসেছে প্রচণ্ড ক্ষুধাও লেগেছে, মন চাচ্ছে খানা খেতে; কিন্তু এক মুহূর্ত খাবার থেকে বিরত থাকলাম, না, খাবো না। অতঃপর অন্তরে এই কল্পনা আনলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত ছিলো, যখন তাঁর সামনে ভালো কোনো খাবার আসতো, তিনি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে খেয়ে নিতেন। তাই এখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে খানা খেয়ে নেবো। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের উপর হলো, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও মহব্বত অর্জন হয়ে গেলো। খাবারের চাহিদাও পূর্ণ হলো।

এই আমলটি করে নাও

ঘরে প্রবেশ করেছ। শিশু সন্তান খেলাধুলা করছে। আনন্দ লাগছে, মন চাচ্ছে তাকে কোলে তুলে নিতে। এক মুহূর্ত এ কল্পনা করো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদেরকে স্নেহ করতেন এবং কোলে তুলে নিতেন। আমি ও তাঁর অনুকরণে সন্তানকে কোলে নেবো। এভাবে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুকরণে সন্তানকে কোলে উঠাবো, তখন এ আমল আল্লাহ তা'আলার মহব্বত লাভের উসীলা হয়ে যাবে।

মোটকথা, দুনিয়ার এমন কোনো কাজ নেই যাতে সুন্নাতের নিয়ত করা যায় না। সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অনেক কিতাব বাজারে পাবেন। এগুলো দেখে দেখে সুন্নাতগুলো নিজের জীবনে ফিট করুন। তারপর দেখুন, সুন্নাতের কি পরিমাণ নূর লাভ করা যায়। এভাবে তোমার প্রতিটি দিন পরিণত হবে সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিবসে। তোমার প্রতিটি মুহূর্ত সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুহূর্তে পরিণত হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল ও জলসা-জুলুস

আরেকটি কথা না বললেই নয়, সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলে আমরা এমন কাজ করি, যা সুন্নাতে-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্পষ্ট পরিপন্থী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উচ্চারিত হচ্ছে, তাঁর শিক্ষা-আদর্শ এবং সুন্নাতসমূহের আলোচনা চলছে, কিন্তু কার্যত আমরা তাঁর শিক্ষা-আদর্শ এবং হিদায়েতের সঙ্গে উপহাস করছি।"

সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল ও জলসা-জুলুস

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا . اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ، وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا . (سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ . ٢١)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ .

হামদ, সালাতের পর–

মোহতারাম সভাপতি, সম্মানিত সুধী,

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ।

রাসূল (সা.)-এর বরকতময় আলোচনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মোবারক আলোচনা উম্মতের জন্য এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়। পৃথিবীর বুকে অন্য কোনো ব্যক্তির আলোচনা দ্বারা এমন সৌভাগ্য, কল্যাণ ও বরকত অর্জন করা যায় না যা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলোচনা দ্বারা অর্জন করা যায়। কিন্তু আলোচনার সাথে সাথে আমরা এ সীরাতে তাইয়্যেবার সাথে এমন অনেক গর্হিত কাজ সংযোজন করেছি, যার ফলে আজ সীরাত আলোচনা সঠিকভাবে ফলপ্রসূ ও স্বার্থক হচ্ছে না।

সীরাতে তাইয়্যেবা এবং সাহাবায়ে কেরাম

এসব গর্হিত কাজের একটি হলো, আমরা সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল একটি মাস তথা রবিউল আউয়াল মাসের সাথে সীমাবদ্ধ করে ফেলছি। বরং রবিউল আউয়াল এরও শুধু একদিন এবং একদিন থেকে শুধু কয়েক ঘন্টা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলোচনা করে আমরা মনে করি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হক আদায় করে ফেলেছি। মূলতঃ এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সীরাতের সাথে চরম বে-ইনসাফী ও নির্দয়তা বৈ কিছু নয়।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পুরো জীবনে কোথায়ও সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এইরূপ পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যাবেনা যে, তাঁরা বার রবিউল আউয়ালকে ঈদে মীলাদুন্নবী হিসেবে উদযাপন করেছেন। কিংবা বিশেষ মাসের ভিতর সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিলের আয়োজন করেছেন। বরং সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী তো এমন ছিলো যে, তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাত এবং আদর্শের প্রতিফলন ঘটতো। যখনই দু'জন সাহাবা এক জায়গায় মিলিত হতেন, তাঁরা হাদীস, বাণী ও রাসূল (সা.)-এর প্রদত্ত শিক্ষা এবং তাঁর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন ঘটনার আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

তাই বলা চলে, তাঁদের প্রতিটি মাহফিল সীরাতে তাইয়্যেবার মাহফিল ছিলো। তাঁদের প্রতিটি বৈঠক ছিলো সীরাতে তাইয়্যেবার বৈঠক। ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তাঁদের মহব্বত ও সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য প্রথাগত কোনো প্রদর্শনীর প্রয়োজন ছিলো না। প্রয়োজন ছিলো না তাঁদের ঈদে মীলাদুন্নবীর জুলুস বের করার, মাহফিল-অনুষ্ঠান করার, বাড়ি ঘরে আলোকসজ্জা করার। এ ধরনের একটি দৃষ্টান্তও সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী কিংবা তাবে তাবেয়ীর যুগে কেউ পেশ করতে পারবে না।

ইসলাম রসম-রেওয়াজের ধর্ম নয়

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জীবনে রসম-রেওয়াজ পালনের কল্পনাও করা যেতো না। তারা যে কোনো বিষয়ের হাকীকত বা প্রাণশক্তি বোঝার জন্য উদ্যমী থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পৃথিবীতে কেন তাশরীফ এনে ছিলেন? কী ছিলো তার পায়গাম? কী ছিলো তাঁর শিক্ষা? কী চেয়েছিলেন তিনি বিশ্বের কাছে? এসব কিছুর জন্যই তো পুরো জীবন বিলিয়ে দিলেন। কোনো ধরনের রসম-রেওয়াজ তো তিনি করেননি।

এটা আমরা গ্রহণ করেছি অমুসলিমদের থেকে। আমরা দেখলাম, অমুসলিমরা তাদের বড় বড় নেতাদেরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দিবস পালন করে। উক্ত দিবসসমূহে বিশেষ অনুষ্ঠান বিশেষ উৎসবের আয়োজন করে। তাদের দেখাদেখি আমরাও ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মরণসভার জন্য আমরা ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করবো। কিন্তু আমরা একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করি বা একটু ভেবেও দেখি না যে, যাদের জন্য দিবস পালন করা হয় তারা তো মূলতঃ ওই শ্রেণীর লোক যাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হিসেবে মনে করা যায় না। বরং হয়তো সে রাজনীতি কিংবা অন্য কোনো জাগতিক ক্ষেত্রে মানুষের নেতা ছিলো। ফলে মানুষের স্মৃতি থেকে সে যেন হারিয়ে না যায়; বরং সে যেন মানুষের স্মৃতিতে থাকে, এলক্ষে তাকে কেন্দ্র করে দিবস উদযাপন করা হয়।

কিন্তু উক্ত নেতার ব্যাপারে তো এই দাবি মোটেও করা যাবে না, তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আদর্শ হওয়ার যোগ্য। সে দুনিয়াতে যা কিছু করেছে, সঠিক করেছে। সে নিষ্পাপ ছিলো, ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলো। অতএব তার প্রতিটি স্বভাব ও আচরণ অনুসরণযোগ্য। এ ধরণের দাবি তাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

তিনি আমাদের জন্য সর্বোত্তম আর্দশ

কিন্তু সরকারে দু'আলম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, আমি আপনাকে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ

করেছি যে, আপনি বিশ্বমানবতার সামনে এক পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম আদর্শ পেশ করবেন। এমন আদর্শ পেশ করবেন যা দেখে মানুষ যত্নের সাথে তা লুফে নিবে এবং তাঁকে অনুকরণ, অনুসরণ করবে, তা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়াস চালাবে, নিজের জীবন তদনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করবে।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য অনুকরণীয় অনুসরণীয়। তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। মুসলমান হিসেবে এটা আমাদের কর্তব্য। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য নেতার সাথে তুলনা করতে পারি না। কারণ তাদের তো শুধু জন্ম দিবস পালন করলেই সব দায়িত্ব চুকে যায়। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জীবনকে আমাদের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা আখ্যায়িত করে দিয়েছেন। তাই জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তাঁর অনুকরণ করতে হবে। আমাদের জীবনের প্রতিটি দিবস তাঁর সীরাত আলোচনা ও অনুশীলন করার দিবস।

আমাদের নিয়ত শুদ্ধ নয়

আরেকটি কথা হলো, বিভিন্ন স্থানে সীরাতুন্নবী মাহফিল ও জলসা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সীরাত আলোচনা হয়। কিন্তু কাজ যতই ভাল হোক না কেন, যতক্ষণ কাজ সম্পাদন করার নিয়ত শুদ্ধ না হবে, তার অন্তরের আগ্রহ ও স্পৃহা সঠিক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত কাজ অনর্থক, নিস্ফল ও তাৎপর্যহীন সাব্যস্ত হবে। উপরন্তু কোন কোন সময় তা ক্ষতি ও গুনাহর কারণ হয়ে যায়।

যেমন মনে করুন, নামায কতো উত্তম আমল। আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ ইবাদত। কুরআন হাদীসে নামাযের ফযীলতের বর্ণনা অনেক। কিন্তু কেউ যদি নামায এই উদ্দেশ্য পড়ে যে, মানুষ তাকে নেককার, মুত্তাকী ও পরহেযগার মনে করবে, তাহলে তার নামায অর্থহীন ও বে-ফায়দা হয়ে যাবে। বরং এ ধরনের নামায দ্বারা সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللّٰهِ (مسند احمد ج ٤ : ص ١٢٦)

যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে নামায পড়লো, সে যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যকে শরীক সাব্যস্ত করলো।

কারণ সে তো আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নামায পড়ছে না। বরং মাখলুককে খুশি করার জন্য এবং মাখলুকের মাঝে নিজের তাকওয়া ও নেক আমলের প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য পড়ছে। সুতরাং এ ভাবে সে যেন আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করলো। নামায কত বড় নেক কাজ ছিলো, কিন্তু শুধুমাত্র নিয়তের অশুদ্ধতার কারণে উল্টো গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

এই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটছে আজ সীরাতে তাইয়্যেবা বয়ানকারী ও শ্রবণকারীদের। যদি কেউ সীরাতে তাইয়্যেবা সঠিক উদ্দেশ্যে সহীহ নিয়ত এবং বিশুদ্ধ জযবা ও স্পৃহার সাথে শুনতো ও শোনাতো, তাহলে তা অবশ্যই বিরাট সাওয়াবের কাজ হতো, কল্যাণ ও বরকত লাভের উপায় হতো। জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন চলে আসতো। কিন্তু যদি সীরাতে তাইয়্যেবা সহীহ নিয়তে না শুনে এবং সহীহ নিয়তে না শোনায়, বরং তার মাধ্যমে অন্তরে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ও স্বার্থ লুকায়িত থাকে এবং তা চরিতার্থ করার জন্যই যদি সীরাত মাহফিলের আয়োজন করে, বন্ধুগণ! তাহলে এটা বহুত বড় লোকসানের ব্যবসা। কারণ বাহ্যিকভাবে তো দেখা যাচ্ছে, আপনি এতে নেক কাজ করছেন। কিন্তু বাস্তবে তা উল্টো গুনাহর কারণ হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার আযাব ও গজবের মাধ্যম হচ্ছে।

উদ্দেশ্য অন্য কিছু

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি নিজেদের বিচার করি এবং সঠিক নিয়তও অন্তকরণের সাথে যদি নিজেদের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে দেখি যে, এই সমস্ত মাহফিল যা করাচী থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আয়োজকরা কি এই উদ্দেশ্য এগুলোর আয়োজন করছে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খুশী হবেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যা আলোচনা হবে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুকরণ করাই কি এ সব মাহফিলের উদ্দেশ্য?

হয়তো আল্লাহর কোনো কোনো নেক বান্দার এমন নিয়ত থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন এসব মাহফিল আয়োজন করার পিছনে উদ্দেশ্য অন্য কিছু। সমাজে সাধারণতঃ এসব মাহফিল এই উদ্দেশ্যে হয় না যে, মাহফিলে অংশ গ্রহণ করার পর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাতকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হবো। বরং নিয়ত হলো, মহল্লায় কোনো সংগঠন থাকলে তার প্রভাব ও ভিত মজবুত করা এবং সংগঠনের প্রসিদ্ধি লাভ করা। কেউ কেউ আবার এসব মাহফিলের আয়োজন করে প্রশংসা কুড়ানোর জন্য। লোকে বলবে, বড় আজীমুশ্বান মাহফিল করেছে। অনেক উচ্চমানের আলোচকদের দাওয়াত করেছে। বহুলোক তাতে অংশ গ্রহণ করেছে এবং মাহফিল ব্যবস্থাপনাও সুন্দর হয়েছে। আবার কোথাও মাহফিল এজন্য অনুষ্ঠিত হয় যে, নিজের কথা ব্যক্ত করার কোনো ক্ষেত্র নেই। কোনো রাজনৈতিক কথা অথবা দলীয় কথা বলার কোনো প্লাটফর্ম নেই, তাই সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিল করে নিজের মনের কথা বা মতাদর্শ প্রকাশ করে। এসব মাহফিলের প্রথম দিকে হয়তো রাসূল (রা.) এর আলোচনা ও গুণকীর্তনে দু'চারটি কথা বলা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই শুরু হয় নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা ও পরিকল্পনা ব্যক্ত করা এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা। এসব অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই সাধারণত বর্তমানের সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিলগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বন্ধুর অসন্তুষ্টির আশঙ্কায় অংশ গ্রহণ

তারপর লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, বাস্তবেও যদি আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাতের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে সীরাত মাহফিল করে থাকি, তবুও কিন্তু আমাদের আচার-আচরণ একটু ভিন্ন হয়ে থাকে। এক ঘরে হয়ত মীলাদুন্নবী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন যদি এ মাহফিলে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কেউ অংশগ্রহণ না করে, তাকে দোষারোপ করা হয়, তিরস্কার করা হয় এবং তার সমালোচনা করা হয়। ফলে মাহফিলে অংশ গ্রহণকারীর নিয়ত আর এটা থাকে না যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাত শুনবো এবং তার উপর আমল করবো, তার নিয়ত হয় মাহফিলে না গেলে আয়োজনকারী আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন, আমার সমালোচনা করবেন। আল্লাহকে খুশি করার ফিকির নেই বরং মাহফিলের আয়োজকদেরকে খুশি করার ফিকিরই থাকে কেবল।

বক্তার জোশ দেখা উদ্দেশ্য

আবার কেউ কেউ এজন্য মাহফিলে অংশগ্রহণ করে যে, তাতে অমুক আলোচক আলোচনা করবেন। একটু গিয়ে দেখবে, তিনি কেমন আলোচনা

করেন। শুনেছি, বড় শানদার বক্তা। অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। যেন বক্তার মজা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। বক্তার তেজোদীপ্ততা ও স্পিরিট দেখার জন্য যাচ্ছে, দেখার জন্য যাচ্ছে, অমুক ওয়ায়েজ কেমন সুললিত কণ্ঠে কবিতা গাইতে পারেন সেটা।

অবসর সময় কাটানোর নিয়ত

কেউ কেউ এজন্য সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিলে শরীক হয় যে, আজ অন্য কোন কাজ নেই। চলো, কোনো মাহফিলে গিয়ে একটু অবসর সময় কাটাই। আবার কিছু লোক এজন্য অংশগ্রহণ করে যে, ঘরে তো মন বসে না। মহল্লায় একটি মাহফিল হচ্ছে। সেখানে গিয়ে একটু বসবো। যতক্ষণ ভালো লাগে বসবো। ভালো না লাগে উঠে চলে আসবো।

সুতরাং বোঝা গেলো, অনেকের নিয়তেই গোলমাল। আমল করার উদ্দেশ্যে সীরাত মাহফিলে যায় না। বরং উদ্দেশ্য শুধু কিছু অবসর সময় কাটানোর একটা ব্যবস্থা হওয়া। হ্যাঁ, যদিও কোনো কোনো সময় এভাবে সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে গেলেও কল্যাণজনক হয়ে যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো কথা হয়ত অন্তরে গেথে গেলো। আর তার দ্বারা জীবনের মোড় ঘুরে গেলো– এ ধরনের ঘটনাও ঘটে থাকে।

হ্যাঁ আমি বলতে চাচ্ছি নিয়তের কথা। যাওয়ার সময় নিয়ত ঠিক থাকে না। এই নিয়ত থাকে না যে, আমি গিয়ে রাসূল (রা.) এর সীরাত শুনে তার উপর আমল করবো।

সীরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ফায়দা নেয়া সকলের ভাগ্যে জুটে না

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ, তাঁর জীবন এক উজ্জ্বল আলোর মেলা, হিদায়াতের এক মহা পয়গাম। একটি সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তবে সেটি কেবল তার জন্য, যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায়, যে শেষ বিচারের দিবসকে শান্তিপূর্ণ করতে চায় এবং যে ঈমান রাখে আখিরাতের উপর এবং আল্লাহ তা'আলাকে অধিক স্মরণ

করে। যার মধ্যে এ সব গুণ পাওয়া যাবে, তার জন্য সীরাতে তাইয়্যেবা এক পয়গামে হিদায়াত। আর যার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত এবং যে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করতে চায় না, আখিরাতকে বিশ্বাস করে না, অধিক হারে আল্লাহকে স্মরণ করে না এবং পরকালকে শান্তিপূর্ণ করার ফিকির করে না, তার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সীরাত পয়গামে হিদায়াত হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সীরাতে তাইয়্যেবা তো আবু জাহল, আবু লাহাব আর উবাই ইবনে খালফের সামনেও ছিলো। কিন্তু তারা সীরাতে তাইয়্যেবা দ্বারা ফায়দা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি।

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لالہ روید ودر شورہ بوم خس

সে মাটিই অনুর্বর ছিলো এবং তাতে হিদায়াতের বীজ বপন করা সম্ভব ছিলো না, ফসল দানের ক্ষমতা উক্ত মাটির ছিলো না।"

সুতরাং কারো অন্তরে যদি আল্লাহ তা'আলাকে রাজী করার ফিকির না থাকে, আখিরাতকে সুসজ্জিত করার আগ্রহ না থাকে এবং আল্লাহকে স্মরণ করার কোনো জযবা না থাকে তাহলে সে জীবনেও সীরাতে তাইয়্যেবা দ্বারা উপকার লাভ করতে পারবে না।

সীরাতুন্নবী মীলাদুন্নবী-এর ব্যানারে যে সমস্ত মাহফিল আমাদের পরিলক্ষিত হয়, এগুলোতে অধিকাংশ সময় আমাদের নিয়ত ঠিক থাকে না। ফলে হাজারো বক্তৃতা ও ওয়াজ শোনার পরও, হাজারো সীরাত মাহফিলে শরীক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের জীবন যেমন ছিলো ঠিক তেমনই থেকে যায়। পূর্বে যেমন আমাদের অন্তরে গুনাহের প্রতি আগ্রহ ছিলো, গুনাহ করে মজা পেতাম, এখনও ঠিক তা বিদ্যমান। তাতে কোন পরিবর্তন আসেনি।

সুন্নাতে রাসূল (সা.)-কে নিয়ে ঠাট্টা উপহাস

আরেকটি কথা না বললেই নয়, সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিলে আমরা এমন কিছু কাজ করি যা সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুস্পষ্ট বিরোধী। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম উচ্চারিত হচ্ছে। তাঁর শিক্ষা আদর্শ এবং সুন্নাত সমূহের আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু কার্যত আমরা উক্ত শিক্ষা-আদর্শ এবং হিদায়াতের সাথে উপহাস করছি।

সীরাত মাহফিলে বেপর্দা

যেমন বর্তমানে আমাদের সমাজে এমন অনেক মাহফিল হয়ে থাকে যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ উঠাবসা হচ্ছে। অথচ তাতে সীরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলোচনা হচ্ছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো নারীদের উদ্দেশ্যে এই পর্যন্ত বলেছেন, তোমরা নামায মসজিদের পরিবর্তে ঘরে পড়বে। বরং ঘরে বারান্দার পরিবর্তে কামরায় পড়বে। কামরাতেও উত্তম হলো, এক কোণে পড়া।

নারীর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হুকুম আরোপ করেছেন। অথচ তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে আর তাতে নারী পুরুষ অবাধে অংশ গ্রহণ করছে। কোনো আল্লাহর বান্দার বোধদয় হচ্ছে না, এ ভাবে পবিত্র সীরাতের সাথে কেমন উপহাস হচ্ছে। অলংকার ও শাড়ি-চুড়ি পরে, পরিপূর্ণ বেপর্দার সাথে অবাধে নারীরা অংশ গ্রহণ করছে। সাথে আবার পুরুষরাও থাকছে।

সীরাত মাহফিলে গান-বাজনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আমাকে যেসব দায়িত্বসহ প্রেরণ করা হয়েছে সেসব দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম একটি হলো, আমি গান-বাজনা এবং গান-বাজনার উপকরণ পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেবো। অথচ আজ সেই নবীর নামে অনুষ্ঠিত মাহফিলে বাদ্যযন্ত্র ও সুর-মূর্ছনার সাথে নাত পরিবেশিত হচ্ছে। তাতে কাওয়ালী হচ্ছে। কাওয়ালীর সাথে আবার 'শরীফ' শব্দটিও যোগ করা হয়েছে। তাতে মহা ধুমধাম করে হারমোনিয়ামও বাজছে। সাধারণ গান-বাজনাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর না'তের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখা হচ্ছে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাতের সঙ্গে এর চেয়ে বড় উপহার আর কী হতে পারে?

এ ছাড়াও রেডিও টেলিভিশনে নারী পুরুষ সম্মিলিত কণ্ঠে নাতে রাসূল পড়ছে। টেলিভিশন দেখে এমন লোকের মুখে শুনেছি নারীরা সজ্জিত হয়ে টিভির পর্দায় আসছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা আদর্শ ও সীরাতের সঙ্গে এটা কত বড় দুঃসাহসিক উপহাস! অথচ নারীদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولٰى . (سُوْرَةُ الْأَحْزَاب : ٣٣)

অর্থাৎ, তোমরা (নারীরা) জাহিলী যুগের মত সাজসজ্জা করে দেহ প্রদর্শন করে বেড়াবে না। অথচ আজ সেই নারীরা মেকআপ করে, সম্মোহনী ভঙ্গিতে পুরুষদের সামনে আসছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে না'ত পরিবেশন করছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর না'ত ও সালাতের প্রতি এর চেয়ে বড় জুলুম আর কীহতে পারে?

যদি কেউ মনে করে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন তাহলে তার চেয়ে বড় প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত আর কেউ হতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতকে মিটিয়ে দিয়ে, তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা পরিপন্থী কাজ করে, তার সীরাতে তাইয়্যেবার সাথে বিরূপ আচরণ করে, সর্বোপরি তাঁকে উপহাস করে যদি কেউ এ প্রত্যাশা করে যে, তার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে, তাহলে তার চেয়ে বড় নির্বোধ ও আত্মপ্রতারিত পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয় জন আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন। যে কাজ আল্লাহ তা'আলার গযব টেনে আনে, যে কাজ সীরাতুন্নবীর আদর্শের পরিপন্থী সে কাজটিই আমরা সীরাতুন্নবী মাহফিলে দে-দারছে করে যাচ্ছি। এটা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী বৈ কিছু নয়।

সীরাত মাহফিলে নামায ছুটে যাওয়া

ইতোপূর্বে বিষয়টি শুধু এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো যে, সীরাত মাহফিলে শরীয়ত পরিপন্থী যা কিছু হোক না কেন, তাতে কারো এত বেশি নাক গলানোর কিছু ছিলো না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এ পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে যে, সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিলের আয়োজন চলছে এবং তাতে নামায ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। মাহফিলের কাজে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে নামাযের আর খবর থাকে না। কোনো কোনো সময় আবার গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা চলার কারণে ফজর নামায ছুটে যাচ্ছে। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি বলছেন– যে ব্যক্তির এক ওয়াক্ত আসরের নামায ছুটে গেল, তার যেন সমস্ত ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কেউ লুট করে নিয়ে গেলো।

কত বিশাল ক্ষতি! অথচ সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিল করতে গিয়ে কত ওয়াক্ত নামায ছুটে যায়, এ নিয়ে যেন কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। কারণ তারা তো বড় মহা কাজে ব্যস্ত, ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের প্রতি যে গুরুত্বারোপ করেছেন, তা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

সীরাত মাহফিলে মুসলমানকে কষ্ট দেয়া

আরো লক্ষ্য করুন, সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিল চলছে। সেখানে শ্রোতার সংখ্যা হবে হয়তো সব মিলিয়ে পঁচিশ-ত্রিশজন। কিন্তু লাউড স্পিকার এত শক্তিশালী লাগাতে হবে যে, তার বিকট আওয়াজ যেন গোটা মহল্লাকে প্রকম্পিত করে তোলে। ফলে মাহফিল শেষ হওয়া পর্যন্ত মহল্লার কোনো অসুস্থ, দুর্বল, বৃদ্ধ ও মা'যুর ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল তো ছিলো, তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের উদ্দেশ্যে উঠছেন; কিন্তু কিভাবে উঠছেন? হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন–

فَقَامَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا

তিনি (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি সন্তর্পণে ঘুম থেকে উঠলেন এবং অতি সন্তর্পণে দরজা খুললেন। যেন আয়েশা (রা.) এর ঘুম ভেঙ্গে না যায়। তার ঘুমের কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল এই ছিলো যে, তিনি বলেন– নামাযে যদি আমি কোনো শিশুর কান্না শুনি নামায সংক্ষিপ্ত করে ফেলি, যেন উক্ত শিশুর কান্না শুনে তার মা কষ্ট না পায়। অথচ এখানে অকারণে-অপ্রয়োজনে শুধু পঁচিশ-ত্রিশ জন শ্রোতাকে শোনানোর জন্য এত বেশি লাউড স্পীকার লাগানো হচ্ছে, যার বিকট শব্দে কোনো দুর্বল ও অসুস্থ লোক ঘরে ঘুমাতে পারছে না। আয়োজকদেরও কোনো খবর নেই, কত বড় কবীরা গুনাহ হচ্ছে তাদের। নাসায়ী শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম। [নাসায়ী শরীফ হাদীস নং ৩৯৬৩]

অমুসলিমদের অনুকরণে জুলূস বের করা

আমাদের এসব কিছু একথার প্রমাণ বহন করে যে, মূলতঃ আমাদের নিয়তের মধ্যেই গোলমাল, নিয়ত শুদ্ধ নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা আদর্শ গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য অন্য কিছু। যেমনিভাবে আমি ইতোপূর্বেও বলেছি যে, প্রথমে তো শুধু মাহফিল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো, এখন মাহফিল থেকে আরো অগ্রসর হয়ে জুলূস পর্যন্ত বের করা শুরু হয়েছে। যুক্তি দেখানো হয়, অমুক দল অমুক নেতার স্মরণে আনন্দ-মিছিল বের করে, আমরা কেন আমাদের নবীর স্মরণে রবিউল আউয়াল মাসে জুলূস বের করবো না।

বলতে গেলে এখন শিয়াদের অনুকরণ করা হচ্ছে, মুহররম মাসে বের হলে রবিউল আউয়াল মাসে বের হবে না কেন। সাথে সাথে ধারণা করা হচ্ছে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করছি এবং তাঁর মর্যাদা ও ভালোবাসার হক আদায় করছি।

একটু ভেবে দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই যদি এই জশনে জুলূস দেখতেন, তাহলে তিনি এই কাজটি পছন্দ করতেন কিনা? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সর্বদা উম্মাতকে এসব রসম রেওয়াজ প্রদর্শনী ত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, বাহ্যিক রসম-রেওয়াজের পরিবর্তে আমার শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি দেখো। আমার শিক্ষাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হও। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জীবনীতে কেউ এমন একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করতে পারবে না যে, তাঁদের কেউ সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে রবিউল আউয়াল মাসে অথবা অন্য কোনো মাসে কোনো ধরনের জুলূস বের করেছেন। বরং পুরো তেরশ বছরের ইতিহাস ঘাটাঘাটি করে আমি তো অন্তত এতটুকু পাইনি যে, কেউ তার নামে জুলূস বের করেছেন। হ্যাঁ, শিয়ারা মুহররম মাসে তাদের ইমামের নামে জুলূস বের করে থাকে। আমরা হয়তো ভাবলাম, তাদের অনুকরণে জুলূস বের করবো। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ . (اَبُوْدَاوُدْ ، كِتَابُ اللِّبَاسِ ، رقم الحديث : ٤٠٣١)

যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়কে অনুসরণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

শুধু যে জুলূসই বের করা হয় তাই নয়। বরং আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে, কা'বা শরীফ, রওজায়ে আকদাস, সবুজ গম্বুজ ও বিভিন্ন পবিত্র স্থানের প্রতিকৃতি স্থাপন করে তাকে লাল শালু দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় এবং তা থেকে বরকত লাভের চেষ্টা করা হয়। এগুলোর নিকট গিয়ে প্রার্থনা করে বিভিন্ন মান্নত করে।

আমার প্রশ্ন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে এ সব কী হচ্ছে? যে নবী শিরক বিদ'আতসহ সকল প্রকার জাহিলিয়াতকে নির্মূল করার জন্য এই পৃথিবীতে এসেছেন। অথচ আজ তাঁরই নামে এগুলো হচ্ছে। রওজায়ে আকদাসের সাথে হাতের তৈরি এই সবুজ গম্বুজের কী সম্পর্ক? আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তাকে মোবারক মনে করে বরকত লাভ করার জন্য চুম্বন করা হয়। কেউ বা হাত সম্পর্শ করে।

হযরত উমর (রা.) ও হাজরে আসওয়াদ

হযরত উমর (রা.) হাজার আসওয়াদকে চুম্বন করার সময় বলতেন– হে হাজারে আসওয়াদ! আমার ভালো করে জানা আছে যে, তুমি একটি পাথর ছাড়া আর কিছু নও। আল্লাহর কসম! যদি আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমিও তোমাকে চুম্বন করতাম না। কিন্তু যেহেতু আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে দেখেছি এবং এটা তাঁর সুন্নাত তাই আমি তোমাকে চুম্বন করছি। [সহীহ বুখারী কিতাবুল হজ্জ, হাদীস নং ১৫৯৭]

হযতর উমর (রা.) তো হাজারে আসওয়াদকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বললেন। আর আজ স্বহস্তে গম্বুজ এবং কা'বা শরীফ তৈরি করা হচ্ছে, স্থাপনও করা হচ্ছে। তাকে বরকতপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। তাকে চুম্বন করা হচ্ছে। এটা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নির্মূল করার জন্য আগমন করেছিলেন, তা পুনর্জীবিত করার শামিল। আলোকসজ্জা করা হচ্ছে, রেকর্ডিং করা হচ্ছে। গান বাজানো হচ্ছে, আনন্দ ফূর্তি হচ্ছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মেলা বসানো হচ্ছে। আরো কত কী হচ্ছে! এটা দ্বীনকে খেলনার পাত্রে পরিণত করার নামান্তর, যা শয়তান আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের উপর রহম করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সীরাতের মান মর্যাদা রক্ষা করুন। তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসর দাবি পূর্ণ করুন। আর তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও মর্যাদার দাবি হলো, নিজের জীবনকে তাঁর প্রদর্শিত পথে চালানোর চেষ্টা করা।

আল্লাহর ওয়াস্তে এসব পরিবর্তন করুন

অধিকাংশ লোক সীরাত মাহফিলে এই উদ্দেশ্য আসে না যে, আমরা উক্ত মাহফিলে এ অঙ্গীকারবদ্ধ হবো, যদি পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত পরিপন্থী পঞ্চাশটি কাজ করে থাকি, তাহলে আজ তন্মধ্য থেকে অন্তত দশটি ছেড়ে দিবো। এ ধরনের অঙ্গীকার কি কেউ করে? একজনও কি এভাবে মীলাদুন্নবী পালন করে? এই অঙ্গীকার করতে বর্তমানে কেউই প্রস্তুত নয়। অথচ জুলূস বের করার জন্য, মেলা সাজানোর জন্য, গম্বুজ স্থাপন করার জন্য এবং আলোকসজ্জা করার জন্য আমরা সকলেই প্রস্তুত।

এসব কাজে সময়, অর্থ ব্যয় করার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত। এসব কাজে সময় অর্থ ব্যয় করার জন্য লোকের অভাব নেই। কারণ, তাতে নফস ও প্রবৃত্তি তৃপ্তি অনুভব করে। কিছুটা আনন্দ উল্লাস, হৈহল্লোড় করা যায়। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাত ও আদর্শের যে প্রকৃত পথ রয়েছে তাতে নফস ও শয়তান আনন্দ বোধ করে না। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদেরকে এ পথ পরিহার করা উচিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান-মর্যাদা, ভালোবাসা ও ভক্তির দাবি পূর্ণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সুন্নাতের উপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

গরীবদের অবজ্ঞা করো না

বর্তমানে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে, পরিবর্তন এসেছে মানুষের চিন্তা চেতনায়। দুনিয়াতে যারা এখন প্রাচুর্যশীল, বড় চেয়ারের মালিক, যাদের কাছে সম্পদের পাহাড় মানুষের কাছে তাদের সম্মানের অভাব নেই। অন্যদিকে পার্থিব দৃষ্টিতে যারা দুর্বল যাদের কোনো মর্যাদা নেই, স্বাভাবিক জীবন-যাপন করে, আজ তারা সকলের নিকটেই অবহেলিত। তাদের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাতেও চায় না। সকলেই তাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। জেনে রাখুন ইসলাম এটা মোটেও সমর্থন করে না।

গরীবদের অবজ্ঞা করো না

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ـ اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ـ (سُوْرَةُ الْكَهْفِ : ٢٨)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ـ

আপনি নিজেকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। [সূরা কাহাফ, আয়াত ঃ ২৮]

উক্ত আয়াতের আলোকে আল্লামা নববী (রহ.) একটি পরিচ্ছদের অবতারণা করেছেন। পরিচ্ছেদটির নামকরণ করেছেন–

بَابٌ: فَضْلُ ضَعَفَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْفُقَرَاءِ وَالْخَامِلِيْنَ

অর্থাৎ, দুর্বল মুসলমানদের ফযীলতের বর্ণনা। তথা যারা অর্থ-সম্পদের দিক থেকে দুর্বল। পদমর্যাদার দিক থেকে কমজোর এবং শারীরিকভাবেও ভঙ্গুর, তাদের ফযীলতের বর্ণনায় পরিচ্ছেদটির অবতারণা।

তারা দুর্বল নয়

পরিচ্ছেদটি লেখার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে, মানুষের মনোযোগ এ দিকে আকর্ষণ করা যে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা দান করেছেন, যেমন কাউকে হয়ত সম্পদ দান করেছেন, কাউকে দান করেছেন বড় কোনো পদ কিংবা প্রসিদ্ধি– এ ধরনের মানুষ সাধারণতঃ দুর্বল লোকদের তুচ্ছ জ্ঞান করে তাদেরকে অবজ্ঞা করে। এজাতীয় লোককে সতর্ক করার জন্য বলা হচ্ছে, একজন মানুষ দৃশতঃ হয়ত দুর্বল। হয়তো বা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল কিংবা শারীরিক দিক থেকে দুর্বল। তাই তাকে তুচ্ছ মনে করোনা। কে জানে, হতে পারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার মর্যাদা তোমার চেয়ে বেশি, আল্লামা নববী তাঁর আলোচনার শুরুতে সর্বপ্রথম কুরআনে কারীমের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ـ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ـ

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি নিজেকে তাদের সংগে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইবাদত করে। এমন যেন না হয় যে, আপনার দৃষ্টি তাদের দিক থেকে ঘুরে গিয়ে পার্থিব কোনো বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। অর্থাৎ আপনি কখনও একথা মনে করবেন না যে, এরা গরীব, ফকীর এবং নিম্নশ্রেণীর লোক। তাই তাদের দিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন কিসের? তাই ধনীদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত।

কে আল্লাহ তা'আলার প্রিয়

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কের গভীরতা কতটুকু, তা সকল মুসলমানেরই কম বেশি জানা আছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট বিশ্বের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ তা'আলার নিকট এত প্রিয় নন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট এত বেশি প্রিয় যে, সমস্ত কুরআন শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসায় ভরপুর। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে–

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا - (سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ : ٤٥، ٤٦)

'হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি। [সূরা আহযাব, আয়াত ৪৫-৪৬]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল সসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা করতে গিয়ে এভাবে শব্দ সম্ভারের মেলা জমিয়েছেন।

বন্ধুত্বপূর্ণ তিরস্কার

কিন্তু গোটা কুরআন মজীদের মধ্যে দু'স্থানে আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছুটা বন্ধুত্ব পূর্ণ ভর্ৎসনা করে বলেছেন, আপনার কাজটি আমার পছন্দ হয়নি। তন্মধ্যে একটি স্থান হচ্ছে, সূরায়ে আবাসায়। ঘটনা হচ্ছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কাফেরদের কিছু সরদার আসতো। এতে তিনি খেয়াল করলেন, এরা যেহেতু প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় লোক। তাই তারা যদি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়, তাদের মাধ্যমে গোটা জাতির হেদায়াতের পথ উন্মোচিত হতে পারে। ফলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হৃদয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তাই তিনি তাদের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেন। এরই মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম যিনি একজন অন্ধ সাহাবী ছিলেন এবং মসজিদে নববীর মুয়াযযিনও ছিলেন। তিনি আসলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবলেন এ তো নিজেদের লোক, সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকেন, তার জিজ্ঞাসার জবাব এখন না দিয়ে পরেও দেয়া যাবে।

এই চিন্তা করে তিনি তাকে বললেন, তুমি একটু অপেক্ষা করো। এই বলে তিনি মুশরিকদের সাথে পুনরায় আলাপে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। ব্যাস! ঘটনা শুধু এতটুকুই। কিন্তু এতেই আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সতর্ক করে দিয়ে আয়াত নাযিল করে দিলেন–

عَبَسَ وَتَوَلّٰى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمٰى -

উক্ত আয়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করার জন্য উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার না করে অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে কাজটি আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। উক্ত আয়াতটিতে বলা হয়েছে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তার কাছে এক অন্ধ এসেছে।

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى - أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى -

আপনি কি জানেন, হয়তো ওই অন্ধ পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো। এতে আপনার উপদেশ ফলপ্রসূ হতো।

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى - فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى -

'পরন্তু যে বেপারোয়া, (উপকৃত হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আপনার কাছে আসে নি, বরং এসেছে বেপরোয়াভাব প্রকাশ করার জন্য) আর আপনি তার চিন্তায় মশগুল।

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكّٰى

অথচ (জেনে রাখুন) এ ধরনের লোক পরিশুদ্ধ না হলে এটা আপনার দোষ নয়। কারণ তার মাঝে তো সত্যকে জানা ও গ্রহণ করার আগ্রহ নেই। সুতরাং আপনি এ ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে না।

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى - وَهُوَ يَخْشٰى - فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى

আর যে আপনার কাছে দৌড়ে এসেছে এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহকে ভয় করে, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। [সূরা আবাসা]

সত্যসন্ধানীর গুরুত্ব বেশি

উল্লিখিত আয়াত সমূহের মাধ্যমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই উদ্দেশ্য মোটেও ছিলো না যে, অন্ধ লোকটি দুর্বল ও নিঃস্ব, তাই তাকে উপেক্ষা করে সবল নেতৃবর্গের প্রতি মনোযোগী হবেন। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, এ তো নিজস্ব লোক, আর স্বজনদের সাথে তো পরেও কথা বলা যাবে। কিন্তু এসব নেতৃবর্গ তো আবার আসবে কিনা, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই এই সুযোগে তাদের কর্ণকুহরে হকের আওয়াজ পৌঁছিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এটি পছন্দ করেননি। তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন, এই যে অন্ধ লোকটি সত্যের সন্ধানে এসেছে সে ওইসব লোকের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যার হকের সাথে বৈরিতা প্রকাশের জন্য আপনার কাছে এসেছে। তাই তাদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সত্যের সন্ধানীকে গুরুত্ব দিন।

উক্ত আয়াতসমূহে যদিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে সমগ্র উম্মাতকে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, বাহ্যিক দুর্বলতা দেখে কাউকে হীন ভেবো না। কারণ হতে পারে সে আল্লাহ তা'আলার দরবারে অনেক মর্যাদাবান।

জান্নাতী কারা?

এ আলোচনার অধীনে আল্লামা নববী (রহ.) প্রথমে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন-

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ - صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، كِتَابُ الْأَدَبِ، بَابُ الْكِبْرِ : ٦٠٧١

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেবো জান্নাতী

কারা? অতঃপর তিনি বলেন, প্রত্যেক ওই দুর্বল ব্যক্তি যাকে মানুষও দুর্বল মনে করে। হয়তো সে শারীরিক দিক থেকে দুর্বল অথবা ধন-সম্পদের দিক থেকে দুর্বল কিংবা মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে দুর্বল। দুনিয়ার মানুষ তাকে অগ্রাহ্য ও মর্যাদাহীন মনে করে। অথচ এই দুর্বল লোকটিই আল্লাহ তা'আলার দরবারে এত বেশি প্রিয় যে, সে যদি আল্লাহর নামে কখনো কসম করে, আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। অর্থাৎ সে যদি কসম করে যে, অমুক কাজটি এমন হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা কাজটি তেমনই করে দেন। যেহেতু সে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা। আর আল্লাহ তা'আলা তার ভালোবাসা ও মর্যদার কারণে এমন করেন।

আল্লাহ তা'আলা তার কসম পূর্ণ করে দেন

হাদীস শরীফে এসেছে একবার দু'মহিলা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে গেলো। ঝগড়ার এক পর্যায়ে এক মহিলা আরেক মহিলার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। আর ইসলামের বিধান হলো, দাঁতের পরিবের্তে দাঁত। তাই যখন মহিলাকে বিধানটি শুনিয়ে দেয়া হলো, তখন মহিলাটির অভিভাবক দাঁড়িয়ে হুযূর (সা.) এর সম্মুখে বলে ফেললেন-

وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا.

ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তার কসম করে বলছি। মহিলাটির দাঁত ভাঙ্গবে না। আল্লাহ না করুন লোকটি একথা বলার অর্থ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফয়সালার উপর অভিযোগ উত্থাপন কিংবা তাঁর সাথে বেয়াদবি করা নয়। বরং সে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে বলেছে যে, ইনশাআল্লাহ পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যাবে। খোদা চাহে তো তার দাঁত ভাঙ্গবে না। যেহেতু তার কথার মাঝে অভিযোগের সুর কিংবা বেয়াদবির গন্ধ ছিলো না, তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার কথার কারণে কিছু মনে করলেন না।

একদিকে ইসলামের বিধান হচ্ছে, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত, চোখের পরিবর্তে চোখ, অন্যদিকে ইসলাম এ সুযোগও রেখেছে যে, ওয়ারিসরা কিংবা হকদাররা যদি মাফ করে দেন, তাহলে প্রতিশোধমূলক বিধান রহিত হয়ে যায় এবং তখন আর প্রতিশোধ নেয়ার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তা'আলার মঞ্জুরও ছিলো তাই, ফলে যে মহিলার দাঁত ভাঙ্গলো তার অন্তরে একথার উদ্রেক হলো এবং সে বললো, আমি দাঁতের বদলে দাঁত ভেঙ্গে প্রতিশোধ নিতে চাই না আমি তাকে ক্ষমা করে দিতে চাই।

অবশেষে ক্ষমার কারণে শাস্তির উপযুক্ত মহিলাটির শাস্তি মওকুফ হয়ে গেলো। তার দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হলো না। এই প্রেক্ষিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিছু কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে খুবই প্রিয়। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল মনে হয়। মানুষের কাছে গেলে হয়তো তাকে অবজ্ঞার সাথে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। অথচ এই লোকটির মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার নিকট এতো বেশি যে, সে যদি কোনো ব্যাপারে আল্লাহর নাম নিয়ে কসম করে, আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। আর এই ব্যক্তিও এমন যে, সে কসম খেয়েছিল মহিলাটির দাঁত ভাঙ্গবে না। আল্লাহ তা'আলা তার এ কসমের মর্যাদা দিলেন। ফলে হকদার নিজেই তার হক ক্ষমা করে দিয়েছেন। [বুখারী শরীফ, কিতাবুসসুলহি, হাদীস - ২৭০৩]

উক্ত হাদীস দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, এমন ব্যক্তি যাকে দৃশ্যত মনে হয় দুর্বল। মানুষও তাকে তাই মনে করে। অথচ সে তার তাকওয়া ও ইবাদতের কারণে আল্লাহ তা'আলার নিকট পেয়ারা হিসেবে পরিগণিত। এখন সে যদি তাঁর নামে কসম করে, তিনি বাস্তবায়িত করে দেন। এরূপ লোক জান্নাতী।

জাহান্নামী কারা

অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তোমাদেরকে জানাতে চাচ্ছি, জাহান্নামী কারা? তিনি বলেন–

كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ۔

'যে রুক্ষ মেজাযী।' عُتُلٍّ শব্দের অর্থ বদমেজাযী; কথা বলার সময় যেন অন্যকে চিবিয়ে খাবে; নম্রতা ও বিনয়ের সাথে যে কথা বলে না, অন্যকে যে অবজ্ঞা করে, হীন ও নিচু ভাবে। হাদীসের মধ্যে দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে– جَوَّاظٌ যার অর্থ অন্যকে নাক ছিটকায় যে, কপালে যার সর্বদা বিরক্তি ও বিস্বাদের ছাপ স্পষ্ট; গোমড়া মুখবিশিষ্ট, সাধারণ মানুষের সাথে যে কথা বলতে প্রস্তুত নয়; দুর্বল, ব্যক্তিত্বহীন, প্রাচুর্যহীন, মর্যাদাহীন লোকদের সাথে কথা বলাকে যে নিজের মানহানি মরে করে; সর্বদা পেশিশক্তি দেখিয়ে বেড়ায় যে নিজের বড়ত্ব প্রকাশে সর্বদা অগ্রগামী।

হাদীসে উল্লিখিত তৃতীয় শব্দটি হচ্ছে– مُسْتَكْبِرٌ যার অর্থ অহংকারী, যে নিজেকে বড় ও অন্যকে ছোট মনে করে। এসব বদস্বভাব যাদের মাঝে আছে, তাদের ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা জাহান্নামী।

যাদের ফযীলত অনেক

উল্লিখিত হাদীসের মাধ্যমে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গরীব মিসকীনদের হীন জ্ঞান করে তাঁদেরকে অবজ্ঞা করো না। কারণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁদের ফযীলত অনেক। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাঝে সবধরনের লোকই ছিলেন। বরং তাঁদের অধিক সংখ্যক ছিলেন সহায় -সম্বলহীন। সবাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে বসতেন। যেমনি হযরত উসমান (রা.) ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এর মতো সম্পদশালী সাহাবারা বসতেন। তেমনি হযরত বেলাল হাবশী (রা.) সালমান ফারসী (রা.) এবং সুহাইব রুমী (রা.) এর মতো প্রাচুর্যহীন সাহাবারাও বসতেন। যারা কখনো লাগাতার দু'তিনদিন অনাহারে কাটিয়ে দিতেন। যাদের ভাগ্যে প্রায় সময় একটি রুটিও জুটতো না।

এরা গরীব

ফলে একদিন মক্কার কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমরা আপনার নিকট আসতে চাই এবং আপনার কথা শোনার জন্য আমরা প্রস্তুত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আপনার কাছে সর্বদা সাধারণ গরীব শ্রেণীর লোক বসে থাকে। তাদের সাথে বসা আমাদের মর্যাদার পরিপন্থী। এতে আমাদের প্রেস্টিজে আঘাত আসে। তাই আপনি তাদের জন্য আলাদা মজলিসের ব্যবস্থা করুন, আমাদের জন্যও ভিন্ন মজলিসের ব্যবস্থা করুন। এরূপ করলে আমরা আপনার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত।

কাফেরদের এ প্রস্তাব দৃশ্যতঃ অযৌক্তিক ছিলো না। হতে পারে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একথা শুনে তারা নিজেদের ভুল শোধরে নিবে। আমরা যদি হতাম, প্রস্তাবটি অবশ্যই মেনে নিতাম। তাই আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথে আয়াত নাযিল করে দিলেন–

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۔

আপনি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেন না, যারা সকাল ও সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁকে ডাকে।' [সূরা আন'আম, আয়াত : ৫২]

তাই উক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিলেন, 'যদি তোমরা সত্যের সন্ধানী হও, তাহলে এসব

নিঃস্ব ও গরীবদের সাথেই বসতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং তোমাদের জন্য ভিন্ন কোনো মজলিসের ব্যবস্থা করা যাবে না।' [সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবাহ]

আম্বিয়া কেরামের অনুসারীগণ

অন্যান্য নবীদের বেলায়ও এরকম বলা হয়েছে। তাদের সমকালীন কাফেররাও অভিযোগ উত্থাপিত করেছিল–

مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۔ (سُوْرَةُ هُوْدٍ : ٢٧)

'আমরা দেখি, আপনার অনুসরণ তো তারাই করছে যারা আমাদের মাঝে হীন প্রকৃতির লোক। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবো কী ভাবে? কারণ আমরা তো খুব জ্ঞানী ও মর্যাদাশীল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ সমস্ত লোক যাদেরকে গরীব হীন নিচু বলা হচ্ছে, গরীব দুর্বল ও মিসকীন মনে করা হচ্ছে,আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁদের মর্যাদা অনেক বেশি। তাই তাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখো না। তোমরা মনে করো না, তোমাদের নেতৃত্ব কর্তৃতত্ত্ব প্রাচুর্যতার দাপটের কারণে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হবে। এই ধরনের অবিচারমূলক কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কখনো সমর্থন করতে পারেন না। যতই দুর্বল ও জীর্ণশীর্ণ হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি।

হযরত যাহের (রা.)

গ্রাম্য এক লোক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রায় আসা যাওয়া করতেন। তাঁর নাম ছিলো যাহের। লোকটি ছিলো কুৎসিত ও গ্রাম্য ধরনের। প্রাচুর্য ও সম্পদের দিক থেকে ছিলো খুবই দুর্বল। মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি কোনো মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব ছিলো না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দরবারে তিনি ছিলেন মর্যাদাবান। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারে গিয়েছিলেন। দেখলেন, যাহের বাজারে দাঁড়িয়ে আছে। একজন জীর্ণশীর্ণ, পরিচয়হীন লোক যদি বাজারে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তাঁর প্রতি কেই বা ফিরে তাকাবে। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাজারের উপর দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বাজারের অন্যান্য মানুষের প্রতি খেয়াল না করে

সরাসরি চলে আসলেন যাহেরের পিছনে এবং যাহেরকে বুকের ভেতর নিয়ে তার চোখ চেপে ধরলেন। এক বন্ধু আরেক বন্ধুর সাথে আনন্দ কৌতুক করতে গিয়ে যেমনটি করে থাকেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যাহেরের চক্ষুদ্বয় চেপে ধরলেন, তখন যাহের নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল। কারণ তার জানা ছিলো না, কে তাকে এভাবে পিছন দিক জড়িয়ে ধরে তার সাথে কৌতুক করছে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কৌতুকচ্ছলে এমনভাবে হাঁক ছাড়লেন, কেমন যেন তিনি একজন বিক্রেতা, তিনি বললেন–

مَنْ يَّشْتَرِى الْعَبْدَ؟

গোলামটি কিনবে কে?

এতক্ষণ পর্যন্ত হযরত যাহের (রা.) জানতেন না যে, কে তাকে এভাবে জড়িয়ে ধরলো? তাই তিনি নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার চেষ্টা করিছিলেন। কিন্তু যখন নবীজীর কণ্ঠ শুনলেন, বুঝতে পারলেন, ইনি আর কেউ নন, ইনি তো হুযূর (সা.) তখন নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার পরিবর্তে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুকের দিকে নিজেকে আরো লেপ্টে দিতে লাগলেন এবং নিজের অজান্তেই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গোলাম হিসেবে বিক্রি করলে তেমন একটা মূল্য পাবেন না। কারণ আমার দামই বা কত?' সুবহানাল্লাহ! উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একটি বিস্ময়কর বাক্য বললেন–

لٰكِنْ عِنْدَ اللّٰهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ ۔

যাহের! মানুষ তোমার মূল্যায়ন করুক বা না করুক, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দরবারে তো তুমি মূল্যহীন নও। তাঁর দরবারে তোমার দাম অনেক।'

এখানে লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হলো, বাজারে নিশ্চয় অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী থাকে, বহু টাকার মালিকরাও থাকে, কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে না গিয়ে একজন দুর্বল-জীর্ণশীর্ণ ব্যক্তির কাছে গেলেন। তাঁকে সুসংবাদ শোনালেন। তাঁকে খুশি করার জন্য তার সাথে এমন আচরণ করলেন, যেমনটি করে থাকে এক বন্ধুর সাথে অপর বন্ধু। [মুসনাদে আহমদ : খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ১৬১]

শুধু তাই নয়, বরং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজীবন এই দু'আটি করেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ . (تِرْمِذِىْ، كِتَابُ الزُّهْدِ، بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَائِهِمْ ٢٣٥٢)

'হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন হিসেবে জীবিত রাখুন, মিসকীন হিসেবে আমাকে মরণ দান করুন এবং মিসকীনদের সাথে আমার হাশর করুন।[তিরমিযী]

চাকর নকরের সাথে আমাদের আচরণ

বর্তমানে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে, পরিবর্তন এসেছে মানুষের চিন্তা-চেতনায়। দুনিয়াতে যারা এখন প্রাচুর্যশীল, বড় চেয়ারের মালিক, যাদের হাতে সম্পদের পাহাড়, মানুষের কাছে তাদের সম্মানের অভাব নেই। সকলেরই দৃষ্টি তাদের প্রতি। অন্যদিকে পার্থিব দৃষ্টিতে যাদের কোনো মর্যাদা নেই, যারা মানুষের চোখে দুর্বল; তাদের ঠাঁই মানুষের অন্তরে নেই।তাদের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাতেও চায় না। তাদেরকে সকলেই অবজ্ঞার চোখে দেখে। স্মরণ রাখুন,ইসলাম এটা মোটেও সমর্থন করে না। অনেক সময় আমরা তো মুখে বলে দেই–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ - سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ : ١٣

যে যত বেশি তাকওয়া সম্পন্ন, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার মর্যাদা তত বেশি।

কিন্তু কার্যত আমরা এটার উপর কতটুকু আমল করি। আমাদের চাকর বাকরের সাথে এবং আমাদের কাছে যেসব ফকীর আসে তাদের সাথে কথা বলি কিভাবে? তাদেরকে খুশি করি নাকি অবজ্ঞা করি? উল্লিখিত হাদীসের উপর আমল করি কি? আল্লাহ না করুন তাদের সাথে অবজ্ঞামূলক আচরণ করা হলে ভয়াবহ ফলাফলের অপেক্ষা করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন

জান্নাত ও জাহান্নামের ঝগড়া

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ : فِىَّ

الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ. فَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِىَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيْنُهُمْ، فَقَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِىْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَاِنَّكِ النَّارُ عَذَابِىْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَىَّ مِلْؤُهَا . (صَحِيْحُ مُسْلِمٍ، كِتَابُ الْجَنَّةِ، بَابُ النَّارِ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُوْنَ رقم الحديث : ٢٨٤٧)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পরের মাঝে ঝগড়া হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে উত্তম কে? জাহান্নাম বললো, আমার মর্যাদা বেশি। কারণ আমি আবাদ হবো, বড় বড় প্রভাবশালীও অহংকারী দ্বারা। অর্থাৎ যত অহংকারী ও বড়াইকারী আছে, বড় পদমর্যাদাশীল, ধন-দৌলতের কুমির এবং নিজের বড়ত্ব প্রকাশকারী আছে এদের সকলকেই আমি ধারণ করবো। উত্তরে জান্নাত ফকীর ও মিসকীনদের কথা বললো যে, সে এদের দ্বারা আবাদ হবে। জাহান্নাম গর্বিত প্রতাপশালী ও অহংকারীকে নিয়ে আর জান্নাত গর্বিত গরীব মিসকীনদেরকে নিয়ে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিলেন এবং জান্নাতকে সম্বোধন করে বললেন, 'তুমি জান্নাত আমার রহমতের বহিঃপ্রকাশ তুমি রহমতের চিহ্ন ও ঠিকানা। তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা দয়া করবো।

আর দোযখকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি দোযখ আমার আযাবের চিহ্ন ও ঘাটি। তোমাকে দিয়ে আমি যাকে ইচ্ছা আযাব দেবো। আর উভয়ের সাথে আমি এই ওয়াদা করছি যে, আমি তোমাদের উভয়ের উদরপূর্ণ করবো। জান্নাতকে পূর্ণ করবো তাদের দিয়ে যারা আমার রহমতের উপযুক্ত। আর জাহান্নাম ভর্তি করবো তাদের দ্বারা যারা আমার আযাবের উপযুক্ত। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

জান্নাত ও জাহান্নাম কথা বলে কিভাবে?

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অনুষ্ঠিত একটি বিতর্ক ও মুনাজারার কথা বললেন। হতে পারে, বাস্তবেই জান্নাত ও জাহান্নামের এরকম বাক-বিতণ্ডা হয়েছিলো। কারণ, তারাও তো আল্লাহ

তা'আলার সৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদেরকে বলার শক্তি দান করতে পারেন। তাদের মাঝে কথাবার্তা হওয়াটা বিস্ময়কর কিছু নয়। আল্লাহর কুদরত কী না পারে? অনেকে আশ্চর্যবোধ করে যে, যার কথা বলার শক্তি নেই সে আবার কথা বলে কিভাবে? জান্নাত হচ্ছে একটি মনোহর এলাকা-জমিনের নাম। একটি মনোমুগ্ধকর বাগানের নাম। আর দোযখ হচ্ছে একটি ভয়ংকর অগ্নিকুণ্ডের নাম, সুতরাং তারা কথা বলে কিভাবে?

আচ্ছা, বলুন তো মানুষ কথা বলে কিভাবে? তাদের কাছে কথা বলার শক্তি আসলো কিভাবে? এই শক্তি তো আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনি যদি মানুষকে এই শক্তি দান না করতেন, তাহলে সে কথা বলতো কিভাবে? অতএব, এই শক্তি যদি তিনি কোনো পাথরকেও দান করেন, পাথরও কথা বলতে পারবে। কোনো গাছকে দান করলে সেও কথা বলতে পারবে। কোনো জমিনকে দান করলে সেও কথা বলতে সক্ষম হবে।

কিয়ামতের দিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কথা বলবে কিভাবে?

হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) একবার কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সাক্ষাত হলো একজন নতুন শিক্ষান্বেষীর সাথে। সে একটি আয়াত বা হাদীসের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে বললো, হযরত! কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কথা বলবে। আমার হাত, পা, হাঁটু সবকিছু নাকি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। হযরত! এটা তো বড়ই আশ্চর্যজনক কথা! থানভী (রহ.) বললেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? আল্লাহ যাকে চান, কথা বলার শক্তি দান করতে পারেন। তুমি দলীল চাচ্ছো নাকি নযীর চাচ্ছো?

থানভী (রহ.) এর কথাটি ছিলো যুক্তি শাস্ত্রের একটি পরিভাষা। দলীল তো এতটুকুতেই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। যাকে ইচ্ছা কথা বলার শক্তি দান করতে পারেন। আর প্রত্যেক দলীল বা প্রমাণের জন্য কোনো নযীর তথা উপমার প্রয়োজন হয় না, তার জন্য কোনো উদাহরণ পেশ করা জরুরি নয়।

এবার ওই লোকটি বললো, হযরত! অন্তরের প্রশান্তির জন্য কোনো উপমা পেশ করলে ভালো হয়। হযরত থানভী (রহ.) বললেন, আচ্ছা, বলো তো এই মুখ কথা বলে কিভাবে? যেহেতু এই মুখও তো হাতের মতোই একটি গোশ্তের টুকরা। সুতরাং তার মাঝে বাকশক্তি আসলো কিভাবে? এই শক্তি এসেছে যেহেতু আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। অতএব, মুখ নামক গোশতের এই

অংশটিকে যদি আল্লাহ বাকশক্তি দান করতে পারেন, তিনি হাত নামক এই অংশটিকেও বলার যোগ্যতা দান করতে পারেন। অতএব, এতে আশ্চর্যবোধের কিছু নেই।

মোটকথা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত ও দোযখের যে ঝগড়ার কথা হাদীসের মাঝে বর্ণনা করেছেন, তা বাস্তবিক অর্থেই হতে পারে। জান্নাত দোযখকে আল্লাহ তা'আলা বাকশক্তি দিয়েছেন বিধায় তাদের মাঝে উক্ত বাক-বিতণ্ডা হতে পারে। এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই। অথবা হতে পারে তাদের এই ঝগড়া একটি উপমা মাত্র।

আল্লাহ তা'আলা অহঙ্কার পছন্দ করেন না

এক সরিষা পরিমান অহংকারও আল্লাহর দরবারে পছন্দনীয় নয়। একটি বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ فِيْهِ قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ ۔ (ابوداؤد، كتاب اللباس : ٤٠٩)

অহংকার আমার চাদর, আমার গুণ। যে আমার এই চাদর নিয়ে ঝগড়া করবে, তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো।

বাস্তবেই এই অহংকার জাহান্নামের প্রতি নিয়ে যাওয়ার মতো স্বভাব। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদের সকলকে এই বদস্বভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমীন। এটি এমন শক্তিশালী গুনাহ যে, সকল গুনাহর মূল এটি। সকল ব্যাধির উৎস বা উম্মুল আমরায হচ্ছে এই অহংকার। এই একটি গুনাহ না জানি কত গুনাহ জন্ম দিতে পারে। কারো অন্তরে একবার এই গুনাহের জন্ম নিলে, হাজারো গুনাহে সে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

অহংকারীর উদাহরণ

এ ব্যাপারে আরবী ভাষায় একটি বিরল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপমা রয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে অহংকারীর উদাহরণ পাহাড়ের চূড়ায় দণ্ডায়মান ব্যক্তির মতো। যে চূড়ায় অবস্থানের কারণে অন্যান্য মানুষকে ছোট ছোট দেখে। আর মানুষও তাকে ছোট দেখে। ঠিক তেমনি অহংকারী যখন অন্যের প্রতি তাকায়, তখন সে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়। আর কোনো মুমিন, এমনকি কাফেরের প্রতিও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকানো কবীরা গুনাহ। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। আমীন

একজন অহংকারী যেহেতু অন্যকে হীনতার দৃষ্টিতে দেখে, তাই সে যতজন মানুষকে এভাবে দেখবে ততটি গুনাহ হবে। ততো পরিমাণ কবীরা গুনাহ তার আমলনামায় বৃদ্ধি হতে থাকবে। যেহেতু অহংকারী ব্যক্তি কথা বলার সময় যেহেতু সাধারণত কর্কশ ভাষায় কথা বলে, ফলে অন্য মুসলমানের অন্তরে আঘাত আসে। আর মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ।

কাফেরকেও ঘৃণাভরে দেখো না

ইতোপূর্বে আমি যে বলেছিলাম, কাফেরকে পর্যন্ত ঘৃণার চোখে তাকালে কবীরা গুনাহ হবে। কারণ কে জানে, আল্লাহ তা'আলা তার ভাগ্যে ঈমানের দৌলত রাখতেও তো পারেন। হয়ত সে তার ভুল উপলব্ধি করে ঈমান নিয়ে আসবে এবং তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাবে। তাই কাফেরকেও ঘৃণার চোখে দেখা যাবে না। তবে হ্যাঁ, কুফরী, ফিসকীর প্রতি ঘৃণা থাকতে হবে। পাপকে ঘৃণা করতে হবে, পাপীকে নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে কখন বুঝবো আমার অন্তরে পাপের প্রতি ঘৃণা আছে, পাপীর প্রতি নয়। এর জন্য বুযুর্গদের সাহচর্য প্রয়োজন।

হাকীমুল উম্মাতের বিনয়

আমার আর আপনার দামই বা কতটুকু। হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলতেন, আমি সর্বাবস্থায় নিজেকে অন্য মুসলমান থেকে ছোট মনে করি। আর সম্ভাবনাও পরিণামের দিকে তাকিয়ে কাফের থেকেও নিজেকে মূল্যহীন ভাবি। কারণ হতে পারে সেও এক সময় মুসলমান হবে এবং আমার থেকে আরো অগ্রসর হয়ে যাবে। তাই আমি নিজেকে সবার থেকে ছোট মনে করি।

অহংকার ও ঈমান একসাথে হতে পারে না

অহংকার আর ঈমান কখনো একসাথে হতে পারে না। কারো অন্তরে অহংকার চলে আসলে, তার ঈমান অনেক সময় রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। এই সেই অহংকার যা ইবলিসকে ডুবিয়েছে। তাকে বলা হয়েছিল, সিজদাহ করো। কিন্তু অন্তরে দানা বেঁধেছিল অহংকার। তাই ভাবলো আমি আগুনের সৃষ্টি আর আদম মাটির সৃষ্টি। আদমের প্রতি তার অবজ্ঞা চলে এসেছিল এবং নিজের বড়ত্বও অহংকার মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিলো। ফলে সে আল্লাহর দরবার থেকে

চিরকালের জন্য বিতাড়িত হয়ে গিয়েছে। এই তাকাব্বুর-অহংকার এত বড় ভয়াবহ বিষয়।

অহংকার একটি আত্মিক ব্যাধি

এই জন্য দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসের মাধ্যমে আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, দেখো, অহংকার যেন তোমার কাছেও ঘেঁষতে না পারে। এটা এমন এক ব্যাধি যে, অনেক সময় আমরা এ ব্যাধি সম্পর্কে বে-খবর থাকি, আক্রান্ত ব্যক্তি মনে করে সে সম্পূর্ণ সুস্থ। অথচ সে এ ব্যাধির নির্মম শিকার। তাই বুযুর্গানে দ্বীনের পরামর্শ হচ্ছে– এ ব্যাধি থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহ তা'আলার কোনো মোকাম্মাল বুযুর্গের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক গড়ে তোলা।

পীর মুরিদীর উদ্দেশ্য

এই যে পীর মুরিদীর যে প্রচলন চলছে। শায়খের হাতে মানুষ বাই'আত গ্রহন করছে। অনেকে মনে করে, শায়খের হাতে হাত দিয়েছি, বরকত লাভ করেছি। তিনি কিছু অযীফা বলে দিবেন সেগুলো পড়বো, এই তো আর কী। ভালোভাবে জেনে রাখুন, পীর মুরিদীর মূল উদ্দেশ্য এটা নয়। কোনো শায়খ অথবা পীর সাহেবের কাছে যাওয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, রূহের রোগের চিকিৎসা করা। আর রূহের রোগের মধ্যে সবচেয়ে বড় রোগ হচ্ছে অহংকারের রোগ। তার চিকিৎসা করাই মূল উদ্দেশ্য। যেমনি শারীরিকভাবে রুগ্ন ব্যক্তি অনেক সময় জানেনা সে কোন্ রোগে আক্রান্ত। তাই সে দক্ষ ডাক্তারের কাছে প্রথমে রোগ নির্ণয় করে, অতঃপর চিকিৎসা গ্রহণ করে। তেমনিভাবে শায়খ বা পীর সাহেবও আত্মার চিকিৎসা করে। রোগের শ্রেণী নির্ণয়ের জন্য শায়খের হাতে হাত রাখতে হয়। এটা এক প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি।

রূহানী চিকিৎসা

বর্তমান নুতন আরেকটি বিষয়ের উপদ্রব শুরু হয়েছে। তা হচ্ছে– তাবিজ, ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা করাকে বলে রূহানী চিকিৎসা। জেনে রাখবেন, এটা রূহানী চিকিৎসা নয়। বরং রূহানী চিকিৎসা হচ্ছে, রূহের মাঝে যেসব রোগ বাসা বেঁধেছে, যেমন অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা পোষণ ইত্যাদি যা মানুষের অন্তরে জন্ম নেয় সেগুলোর চিকিৎসার জন্য শায়খ বা হক্কানী পীরের কাছে যাওয়ার নাম রূহানী চিকিৎসা। শায়খ নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে রোগ ও

রোগীর শ্রেণীভেদে চিকিৎসা করেন, শায়খের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করাই পীর-মুরীদি বা বাই'আতের হাকীকত।

হযরত থানভী (রহ.) এর চিকিৎসা পদ্ধতি

হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর দরবারে সবচেয়ে বেশি যে কথার প্রতি তাগিদ দেয়া হতো তা হচ্ছে, তার দরবারে এ ধরনের কোনো রূহের রোগী আসলে তিনি তার চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করতেন। তিনি কোনো ওষুধ পান করিয়ে কিংবা অযীফা পাঠ করিয়ে চিকিৎসা করতেন না। বরং তিনি চিকিৎসা করতেন আমল বা কাজের মাধ্যমে। কোনো অহংকারের রোগী এসেছে। তার জন্য তিনি হয়ত ব্যবস্থাপত্র দিতেন, যাও। মসজিদে যাও। মসজিদে লোক আসা যাওয়া করবে সকলের জুতা সোজা কর। এভাবে হয়ত তাকে চিকিৎসা স্বরূপ এই কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কোনো অযীফা, তাসবীহ কিংবা দুরুদের আমল তাকে হয়ত দিলেন না। এখন এই লোকটিকে দেখে মানুষ বুঝতে পারতো, এই লোক অহংকার ব্যাধিতে আক্রান্ত। তার জন্য এমন চিকিৎসারই প্রয়োজন ছিলো।

অহংকার জাহান্নামের পথ

উক্ত ব্যাধি থেকে আল্লাহর কাছে আমরা পানাহ চাই। বলতে চাচ্ছিলাম এই রোগটি মানুষের অন্তরে অত্যন্ত সংগোপনে প্রবেশ করে। অনেক সময় মানুষ টেরই পায় না যে, সে অহংকার ব্যাধিতে আক্রান্ত। অথচ সে কার্যত এই রোগেই আক্রান্ত। এভাবে সে মনের অজান্তেই জাহান্নামের পথে পা বাড়ায়। খালিস ঈমান আর অহংকারের সাথে শত্রুতার সম্পর্ক বিধায় তার চিকিৎসা খুবই প্রয়োজন। উল্লিখিত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার প্রতিই গুরুত্বারোপ করেছেন।

জান্নাতে গরীব মিসকীনের সংখ্যাধিক্য

উল্লিখিত হাদীসের দ্বিতীয় ভাগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন জান্নাত গরীব ও মিসকীনদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে। অর্থাৎ তোমরা যাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করো, গরীব, মিসকীন ও সাধারণ শ্রেণীর লোক, সাধাসিধে পোশাক পরিহিত, যাদের প্রতি মানুষ ভ্রূক্ষেপও করতে চায় না– এ ধরনের অধিকাংশ লোক আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হন। তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ভয় ভালোবাসা থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলার

রহমতের বারিধারা তাদের উপরই বর্ষিত হয়। জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী এরাই হবে।

আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারীগণ অধিকাংশই গরীব

কুরআন খুলে নবীদের ঘটনা দেখুন, আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন এসব দুর্বল ও মিসকীন লোক। এই জন্যই তো সমকালীন সকল মুশরিকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছিলো যে, আমরা এসব সাধারণ শ্রেণীর লোকদের সাথে বসবো কীভাবে যাদের কেউ সামান্য বেতনভোগি চাকর, কেউবা জেলে, কেউ হয়ত কাঠমিস্ত্রি আবার কেউ হয়ত অন্য সাধারণ পেশায় নিয়োজিত, আর এরাই কিনা আপনার আশেপাশে থাকে, তাই আমরা বড় বড় নেতৃস্থানীয় লোকেরা এসব মামুলি ধরনের লোকদের সাথে বসবো কিভাবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব সাধারণদেরকেই তো এত বেশি মর্যাদা দান করেছেন, 'যে মর্যাদার আশা করা ওই সব কাফেরদের জন্য দুরাশা বৈকি! সুতরাং দৃশতঃ যারা দুর্বল তাদেরকে ছোট ও তুচ্ছ মনে কারো না, আল্লাহ না করুন তাদের প্রতি বক্র চোখে দেখো না।

দুর্বল ও মিসকীন কারা?

উক্ত হাদীসের সাথে সম্পর্ক যুক্ত এমন একটি কথা যা না বললেই নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত হাদীসে দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এক. ضُعَفَاء দুই مَسَاكِين প্রথমটির অর্থ যারা শারীরিকভাবে অথবা সম্পদের দিক থেকে কিংবা পদ ও মর্যাদার দিক থেকে দুর্বল। আর দ্বিতীয় শব্দটি مِسْكِين -এর বহুবচন। যার অর্থ দু'টি। এক, যার কাছে টাকা-পয়সা, অর্থ সম্পদ নেই, যে সম্পূর্ণ নিঃস্ব। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে মিসকীন ওই ব্যক্তিকে বলে যার কাছে টাকা পয়সা থাক বা না থাক কিন্তু বদান্যতার কারণে দৃশ্যতঃ সে মিসকীন। মিসকীনদের সাথে তার চলাফেরা, উঠাবসা, লেনদেন সববিছু। তার স্বভাবে ও চরিত্রে বিনয়ের ছাপ স্পষ্ট। কখনো সে অহংকারের সাথে কথা বলে না। এ ধরনের লোকও মিসকীনদের দলে পরিগণিত হবে।

মিসকীন ও ধনাঢ্যতার মাঝে কোনো বিরোধ নেই

সুতরাং একথা ভেবে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই যে, ধনী ব্যক্তি সুন্দর জীবন যাপন করলেও মনে হয় জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ না করুন। ব্যাপার এমন

নয়। বরং ধনসম্পদও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। তবে এই নেয়ামত তখন নেয়ামত হিসেবে পরিগণিত হবে, যখন বিনয় ও নম্রতা থাকবে এবং অন্যের সাথে সদাচরণ বজায় রাখবে। আল্লাহ ও বান্দার হকের যথাযথ কদর করবে। এরূপ করলে ইনশাআল্লাহ সেও মিসকীনদের দলভুক্ত হবে।

একটি হাদীসে এসেছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَامِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زمرة الْمَسَاكِيْنِ ـ (تِرْمِذِىْ، كِتَابُ الزُّهْدِ : ٣٣٥)

হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীনবস্থায় জীবিত রাখুন। মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং মিসকীদের কাতারে আমার হাশর করুন।

অন্য এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেছেন এ ভাবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ ـ (اَبُوْدَ اود، كِتَابُ الصَّلٰوةِ : ١٥٤٤)

হে আল্লাহ! আমি ফকীরীও নিঃস্বতা থেকে, অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে আপনার দরবারে পানাহ চাচ্ছি।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসকীন হওয়ার কামনা করেছেন, ফকীর হওয়া থেকে পানাহ চেয়েছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় ফকীর এবং মিসকীন এক নয়। বরং মিসকীন দ্বারা উদ্দেশ্য আখলাক ও স্বভাবের দিক থেকে মিসকীন তথা নম্রতা ও বিনয় এবং মিসকীনদের সাথে সদাচরণ ইত্যাদি। এসব গুণ নিজের মাঝে বাস্তবায়িত করতে পারলে, আল্লাহর রহমতে সেও হাদীসে উল্লিখিত সুসংবাদের অধিকারী হবে।

জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা

পূর্বে উল্লিখিত হাদীসের শেষ অংশে রয়েছে যে, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অনুষ্ঠিত ঝগড়ার ফায়সালা আল্লাহ তা'আলা এভাবে করেছেন যে, তিনি জান্নাতকে বলেছেন, জান্নাত! তুমি আমার রহমতের চিহ্ন। তোমার মাধ্যমে আমি বান্দার উপর রহমত দান করবো। আর জাহান্নামকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, জাহান্নাম তুমি আমার আযাবের নিশানা। আমি তোমার মাধ্যমে কৃতঘ্ন বান্দাদের আযাব দেবো। আর হ্যাঁ অবশ্য আমি উভয়কেই পূর্ণ করে

দেবো। এর দ্বারা বোঝা যায়, দুনিয়াতে মানুষ দু'ধরনের হবে। এক. জান্নাতের উপযুক্ত। দুই, জাহান্নামের উপযুক্ত। জান্নাতের আমলকারীরা জান্নাত লাভে সৌভাগ্য অর্জন করবে। জাহান্নামের আমলকারীরা শাস্তির উপযুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জান্নাতবাসীদের দলভুক্ত করুন। আমীন।

জনৈক বুযুর্গ আজীবন হাসেননি

জনৈক বুযুর্গের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলো যে, তিনি আজীবনের জন্য একবারও হাসেননি, এমনকি মুচকি হাসিও না। তার চেহারায় সর্বদা চিন্তার ছাপ থাকতো। তাই এক ব্যক্তি তাকে একদা জিজ্ঞেস করলেন, হুযূর আমরা আপনাকে কখনো হাসতে দেখিনি। একটু আনন্দ করতেও দেখিনি। এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, ভাই আমি হাদীস শরীফে পড়েছি, আল্লাহ তা'আলা কিছু মাখলুককে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর কিছু মাখলুক সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামের জন্য। আমার তো জানা নেই, আমি কোন শ্রেণীর শামিল। যতক্ষণ না আমি নিশ্চিত হবো আমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত, ততক্ষণ আমার হাসি আসবে কিভাবে? তাই সর্বদা আমি এই চিন্তায় মগ্ন থাকি।

মুমিনের চোখে ঘুম আসে কিভাবে

জনৈক বুযুর্গ একটি কবিতা বলেছেন–

وَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنُ وَهِىَ قَرِيْرَةٌ * وَلَمْ تَدْرِ فِىْ اَىِّ الْمَحَلَّيْنِ تَنْزِلُ ـ

মুমিনের চক্ষু প্রশান্তিতে ঘুমায় কিভাবে। অথচ তার জানা নেই যে, তার ঠিকানা জান্নাতে না জাহান্নামে!

উক্ত বুযুর্গ তাই পুরো জীবনে একবারও হাসেননি। মৃত্যুর সময় যারা তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাদের বক্তব্য, মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর চেহারায় হাসির আভা ফুটে উঠেছে। কারণ তিনি তো আজ নিশ্চিত জানতে পেরেছেন, তাঁর ঠিকানা জান্নাতে।

গাফেল জীবন বড়ই খারাপ

আল্লাহ তা'আলা যাদের অন্তরে এই ফিকির দিয়েছেন যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার রেজামন্দি অর্জন করছি না গজব কামাই করছি। সুতরাং আমরা হাসবো কিভাবে? অবশ্য চিন্তার এই তাড়না আল্লাহ তা'আলা দয়া বশত সকলকে

দান করেন না। সবাই যদি এই চিন্তায় ব্যাকুল হতো তাহলে দুনিয়ার চাকা থেমে যেতো। পার্থিব কাজ-কারবার তখন বন্ধ হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ তা'আলা এ বিশেষ অবস্থা সবাইকে দান করেন না। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার তাগিদ দিয়ে বলেছেন এই ফিকির তোমাকে দান করা হয়নি বিধায় তুমি একেবারে গাফেল হয়ে যেয়ো না। আজীবন নিজের গন্তব্য সম্পর্কে উদাসীন থেকো না। বরং মাঝে মাঝে এই ফিকির করো, তোমার গন্তব্য কোথায়-জান্নাতের প্রতি না জাহান্নামের প্রতি? নিজের আমলের দিকে লক্ষ্য করো, কী আমল করছো? আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে তাদের শামিল করুন। আমীন।

বাহ্যিক শক্তি সুস্থতা রূপ সৌন্দর্য্য নিয়ে বড়াই করো না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ . (صحيح بخارى، كتاب تفسير سورة الكهف : ٤٨٢٩)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন হৃষ্ট পুষ্ট বিশালদেহী এবং সম্মানিত এক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তার ওজন একটি মাছির ডানার সমানও নয়। তার এই পার্থিব হৃষ্ট পুষ্টতা, আভিজাত্য, ও রূপ সৌন্দর্য সবই মূল্যহীন হিসেবে একদিকে ছুড়ে ফেলা হবে। কেন? যেহেতু এই ব্যক্তি সুস্থ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্টি করার কাজ করেনি। তাই তার মূল্য মাছির ডানা পরিমাণও নয়।

এই হাদীস দ্বারা এই কথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, বাহ্যিক রূপ, সৌন্দর্য, সুস্থতা সামর্থ্য, আভিজাত্য ও ধন-সম্পদের কারণে বড়াই করো না। কারণ হতে পারে এগুলো আল্লাহ তা'আলার দরবারে মূল্যহীন সাব্যস্ত হবে। মূল লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো আমল।

মসজিদে নববীতে যে মহিলাটি ঝাড়ু দিতেন–

وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا أَوْ فَقَدَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ، فَقَالُوا مَاتَ، قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللّٰهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ . (صَحِيحُ الْبُخَارِي، كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ . حديث ١٣٣٧)

হাদীসটিতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় এক মহিলা মাঝে মাঝে মসজিদে নববীতে এসে ঝাড়ু দিতো। মহিলাটি ছিলো কুৎসিৎ ধরনের। কিন্তু কিছু দিন থেকে মহিলাটিকে দেখা যচ্ছিলো না। মসজিদে নববীর পরিচ্ছন্নতার কাজেও আসেনি সে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন যে, অনেকদিন হলো মহিলাটিকে দেখছি না কেন?

লক্ষ্য করুন, মানুষের সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্ক কত গভীর ছিলো! মহিলাটি এসে ঝাড়ু দিয়ে চলে যেতো, কিন্তু এতটুকুতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা স্মরণ রাখলেন। তাই সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে তিনি মহিলাটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলাটি মারা গেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার মৃত্যুর কথা আমাকে অবহিত করোনি কেন? এতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একেবারে থ বনে গেলেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে বোঝা যাচ্ছিলো তারা বলতে চাচ্ছিলেন যে, হুযূর সে তো এক সাধারণ মহিলা ছিলো। তার মৃত্যু এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তো নয় যে, আপনার মহান ব্যক্তিকেও তা জানাতে হবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তার কবর কোথায়? কোথায় তাকে দাফন করা হলো? তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে তার কবরের কাছে চলে গেলেন এবং তার কবরের সামনে জানাযার নামায পড়লেন।

কবরের উপর জানাযার নামাযের বিধান

সাধারণতঃ জানাযার নামাযের ক্ষেত্রে বিধান হলো, তদি কারো জানাযার নামায পড়া হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় তার কবরের উপর জানাযার নামায পড়া জায়েয নেই। আর কাউকে যদি জানাযার নামায পড়া ব্যতীত দাফন করে ফেলে তখন শরীয়তের বিধান হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত লাশ ফোলা ফাটার ভয় না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কবরের উপর জানাযার নামায পড়া জায়েয। যদি ভয় থাকে যে, লাশ ফোলে ফেটে গেছে, তাহলে কবরে আর জানাযার নামায পড়া যাবে না।

কবর এক অন্ধকার জগত

কিন্তু দু'জাহানের সরদার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত মহিলাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করার জন্য তার কবরে তাশরীফ নিলেন এবং জানাযার নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি বললেন, কবরসমূহ অন্ধকার দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা আমার নামাযের বরকতে নূরান্বিত করে দেন।

কাউকে তুচ্ছ ভেবো না

কাউকে তুচ্ছ ভেবোনা। উক্ত হাদীস আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়। কারো বাহ্যিক মান মর্যাদা কিংবা গুরুত্ব কম দেখে মনে করো না যে, তাকে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনই কিসের ? কারণ হতে পারে সে আল্লাহ তা'আলার দরবারে বড়ই মর্যাদাবান।

এলোমেলো চুল যার

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُبَّ اَشْعَثَ اَغْبَرَ مَدْفُوْعٍ بِالْاَبْوَابِ لَوْاَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ. (صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة : ٢٦٢٢)

দু'জাহানের সর্দার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনেক মানুষ এমন রয়েছে যাদের চুল এলোমেলো, কখনও বা পরিপাটি করে রাখেনি এমন, জীর্নশীর্ণ দেহ, বিধস্ত চেহারা এবং পরিশ্রম করে উপার্জন করে যার কারণে

চেহারা ধুলোমলিন হয়ে গিয়েছে, এমন মানুষটি যদি কারো দরবারে যায় গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। এরা হয়তো পার্থিব এ জগতে মূল্যহীন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাদের কদর ও মর্যাদা অনেক। এরা যদি কোনো বিষয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে কসম করেন, আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। অর্থাৎ এরা যদি আল্লাহর কসম করে বলে কাজটি হবে, তাহলে হয়ে যায়। আর যদি কসম করে যে, হবে না, তাহলে হয় না।

গরীবদের সাথে আমাদের ব্যবহার

উল্লিখিত হাদীস সমূহ দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, কারো বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নীচু মনে করো না। মুখে তো আমরা বলে থাকি যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট আমির গরীবের কোনো ভেদাভেদ নেই। বরং তার নিকট গরীবের মূল্য বেশি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কার্যত আমরা তার উপর কতটুকু আমল করি? গরীবদের সাথে সদাচরণ আমরা করি কিনা? চাকরবাকর অধীনস্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য দরিদ্র পীড়িত মানুষের সাথে কথাবার্তা বলার সময় উক্ত দিকটা আমরা কতটুকু খেয়াল করি? আলোচনার ঝড় তুলতে পারি, মঞ্চ কাঁপাতে পারি, কিন্তু আমল কতটুকু করি?

খাদেমের সাথে হযরত থানভী (রহ.)-এর আচরণ

যারা গরীবও অধীনস্তদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, তাদের ঘটনা শুনুন। হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর একজন খাদেম ছিলো। খানকার লোকেরা তাকে ভাই নওয়াজ বলে ডাকতো। একবার জনৈক লোক থানভী (রহ.)-এর নিকট ভাই নেওয়াজের শেকায়েত করলেন। বললেন, হুযুর! ভাই নওয়াজ মানুষের সাথে ঝগড়া করে। আমাকেও এটা সেটা বলে।

যেহেতু তার বিরুদ্ধে এর আগেও এরূপ দু'একটি অভিযোগ এসেছিল, তাই থানভী (রহ.) তাকে ডাকলেন এবং ধমকির সুরে বললেন, 'তুমি সকলের সাথে এরকম ঝগড়া বাধাও কেন? উত্তরে খাদেম বললো, 'হযরত! মিথ্যা বলবেন না, আল্লাহকে ভয় করুন।

লক্ষ্য করুন, একজন খাদেম তার মুনীবকে এভাবে অভদ্রতার সাথে উত্তর দিলো। আর মুনীব কে? হযরত থানভী (রহ.)। আসলে খাদেম বলতে চেয়েছিলো। হযরত! আপনার কাছে যারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তারা মিথ্যা বলেছে, তাই তাদের উচিত আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা। কিন্তু রাগের

আতিশয্যে খাদেমের মুখ ফসকে বের হয়ে গিয়েছে, 'হযরত মিথ্যা বলবেন না। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, একজন খাদেম তার মুনীবকে এ ভাবে শাসালে, নিশ্চয় মুনীব আরো বেশি উত্তেজিত হওয়ার কথা, অথচ হযরত থানভী (রহ.) তা না করে মাথা নিচু করে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন, আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ আসতাগফিরুল্লাহ।

কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, 'আমার ভুল হয়ে গেছে। কারণ আমি এক তরফা কথা শুনে তাকে শাসন শুরু করে দিয়েছি। অথচ শরীয়তের বিধান হলো, উভয় পক্ষের কথা না শুনে কোনো বিষয়ে মীমাংসা করা যাবে না। তাই সর্বপ্রথম তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো যে, ব্যাপার কি আমাকে খুলে বলো, তাহলে সে তার অবস্থা বর্ণনা করতো আর আমি সঠিক সমাধান দিতে পারতাম। কিন্তু আমি এমন না করে প্রথমেই তার সাথে অসদাচারণ শুরু করে দিয়েছি। আর সে যখন বলেছে, আল্লাহকে ভয় করুন। তখন আমি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। তারপর আমি অনুভব করলাম আসলে ভুলটা আমারই। তাই ইসতেগফার পড়লাম।

এরাই তো তারা যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

كَانَ وَقَّا فًا عِنْدَ حُدُوْدِ اللّٰهِ.

এরা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখার সামনে মাথা নত করে দেয়। এরা সীমা লংঘন করে না। আল্লাহ আমাদের সকলের হেফাজত করুন। আমীন।

জান্নাত ও জাহান্নামবাসী

وَعَنْ اُسَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ، فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ، فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ. (صَحِيْحُ الْبُخَارِىِّ، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ لَا تَاْذَنُ الْمَرْاَةُ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلَّا بِاِذْنِهٖ ٥١٩٦

হযরত উসামা (রা.) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বড় আদুরে সাহাবী ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পালক ছেলে হযরত

যাইদ ইবনে হারিসা (রা.)-এর পুত্র ছিলেন। এই দৃষ্টিতে হযরত উসামা (রা.) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাতি ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ানো ছিলাম। সম্ভবত এটা মি'রাজ রজনী হবে। কারণ এই রজনীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত এবং জাহান্নাম ভ্রমণ করেছিলেন। অথবা হতে পারে এটা কাশফের জগতের কথা। আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি বলেন, আমি জান্নাতে যাদের দেখেছি, তাদের অধিকাংশকে মিসকীন দেখেছি। আমি লক্ষ্য করেছি দুনিয়াতে যাদেরকে ভাগ্যবান মনে করা হতো। বড় পদমর্যাদার কারণে কিংবা সম্পদের কারণে যাদেরকে মানুষ মূল্যায়ন করতো, তারা সকলেই জান্নাতের দরজার সামনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন কোনো বাধাপ্রদানকারী তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। যেহেতু তাদের হিসাব কিতাব এত দৈর্ঘ্য যে, তারা হিসাব কিতাব সমাপ্ত করা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারছে না। তাদের মধ্যে কিছুলোক আবার জাহান্নামের উপযোগী। তাদের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হলো, এদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাও।

অতঃপর আমি জাহান্নামের দরজার সামনে দাঁড়ালাম এবং দেখলাম, অধিকাংশ জাহান্নামী মহিলা। জাহান্নামে নারীদের সংখ্যাই বেশি দেখলাম।

জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা অধিক কেন?

নারীদেরকে সম্বোধন করে অন্যত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ . (مسند احمد . ج٢ ص ٦٧)

আমাকে দেখানো হয়েছে জাহান্নামে তোমাদের আধিক্য।

জাহান্নামে পুরুষের তুলনায় নারীদের সংখ্যা বেশি হবে। এর অর্থ কিন্তু এটা নয় যে, পুরুষদের তুলনায় নারীরাই জাহান্নামের অধিক উপযোগী। বরং অন্য হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নারীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা বেশি। তখন নারীরা প্রশ্ন করলেন, بِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কারণ কি? তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৌলিক দু'টি কারণ বর্ণনা করলেন, তিনি বললেন–

تَكْثُرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ .

এমন দু'টি বদস্বভাব তাদের মাঝে বেশি পাওয়া যায় যে, যা তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে । যে নারী এ দু'টি স্বভাব থেকে বেঁচে থাকতে পারবে সে জাহান্নাম থেকেও বেঁচে যাবে। ওই দু'টি কারণের মধ্যে একটি হলো, হে নারীরা! তোমাদের মাঝে পরস্পরকে লা'নত দেয়ার অভ্যাস বেশি। সামান্য ব্যাপারেও তোমরা চটে যাও আর অভিসম্পাত করো।

এখানে লানত দ্বারা উদ্দেশ্য অপরকে ঘায়েল করার লক্ষ্যে এমন কথা বলা যা শুনলে শরীরে আগুন ধরে যায়। অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, এই স্বভাব নারীদের মধ্যেই অধিক পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় কারণ হলো, তোমরা স্বামীর অবাধ্যতা করো। কোনো সহজ সরল স্বামী যদি তোমাদেরকে খুশি করার চিন্তায় সারাদিনও মগ্ন থাকে তবুও তোমাদের মুখ থেকে শোকর বের হতে চায় না।

না-শোকরী কুফরের আলামত

অকৃতজ্ঞতা কিংবা না-শোকরী তো সর্বাবস্থায় এমনিতেই নিন্দনীয়। আল্লাহ তা'আলাও এটি খুব অপছন্দ করেন। কতটুকু অপছন্দ করেন, তা একটু অনুমান করুন আরবী ভাষায় এবং শরীয়তের পরিভাষায় কুফর এর অর্থ না-শোকরী। কারণ কাফের এই না-শোকরীর কারণেই কাফের হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে কতো নেয়ামত দান করেছেন, তাকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করেছেন। এভাবে তার উপর নেয়ামতের বারিধারা বর্ষণ করেছেন। অথচ সে না-শোকরী বা অকৃতজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যকে শরীক স্থাপন করে।

স্বামীকে সেজদাহ

একটি হাদীসে এসেছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি যদি আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার নির্দেশ এই দুনিয়াতে প্রদান করতাম, তাহলে নারীদেরকে বলতাম, তারা যেন তাদের স্বামীকে সেজদাহ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদাহ করা যেহেতু জায়েয নেই, তাই আমি এই নির্দেশ দেইনি। হাদীসটি বলার উদ্দেশ্য এই যে, নারীদের উপর ফরয হলো স্বীয় স্বামীর আনুগত্য করা। স্বামীর অবাধ্যতা করা তাদের জন্য বৈধ নয়। নারীরা আপন স্বামীর অবাধ্যতা করার অর্থ

আল্লাহর সাথে অকৃতজ্ঞা প্রকাশ করা। কারণ স্বামীর অবাধ্যতা করা আল্লাহ তা'আলার নিকট এত বেশি অপছন্দনীয় যে, যার কারণে তারা জাহান্নামেও চলে যেতে পারে। [আবু দাউদ কিতাবুননিকাহ হাদীস ২১৪০]

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'টি উপায়

আল্লাহ তা'আলা স্বামীর জিম্মায় অর্পণ করেছেন স্ত্রীর অধিকার আর স্ত্রীর জিম্মায় দিয়েছেন স্বামীর অধিকার। বলুন তো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে উম্মতের রোগ নির্ণয়কারী অভিজ্ঞ ব্যক্তি কে? তিনি নারীদের রোগ চিহ্নিত করেছেন এবং উপায় ও বলে দিয়েছেন যে, এই দুটি রোগ নিরাময় করতে পারলে তোমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। এক, লা'নত। দুই স্বামীর অবাধ্যতা। সুতরাং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে পরস্পর লা'নত করো না এবং স্বীয় স্বামীর অবাধ্য হয়ো না।

আরেকটি হাদীসে এসেছে, যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তার বিছানার প্রতি ডাকে আর স্ত্রী যদি তাতে অসম্মতি জানায়, ফলে স্বামী অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা ওই নারীর উপর অভিসম্পাত করতে থাকে।

জিহ্বার হেফাযত করুন

এই পর্যায়ে আমি বলতে চাচ্ছি, একটু আগে বলা হলো। জাহান্নামে পুরুষের তুলনায় নারীদের সংখ্যা অধিক হবে। আজকাল কিন্তু নারীদের অধিকার নিয়ে খুব হৈ চৈ চলছে। অপপ্রচার করা হচ্ছে যে, ইসলাম নারীদেরকে এতো নিচে নামিয়েছে এমনকি নারীদের দ্বারা জাহান্নামকেও পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। ভালোভাবে বুঝে নিন, নারীদেরকে 'নারী' হওয়ার কারণে জাহান্নামের অধিক উপযোগী বলা হচ্ছে না। বরং তাদের মাঝে বদস্বভাবের অতিরিক্ত প্রবণতা থাকার কারণে তারা অধিকহারে জাহান্নামে যাবে।

হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন মানুষকে জাহান্নামে অধিক নিক্ষেপকারী জিনিস হলো জিহ্বা। এই জবানকে নিয়ন্ত্রণে না রাখলে সাধারণতঃ এর দ্বারাই গুনাহ বেশি হয়। যাচাই করে দেখুন, পুরুষরা নারীদের তুলনায় কিছুটা হলেও জবান নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিন্তু জবান হেফাযতের ব্যাপারে অধিকাংশ নারী উদাসীন। যার ফলে হাজারো ফাসাদের সৃষ্টি হয়।

দোহাই লাগে, আল্লাহর দিকে তাকিয়ে জবানের হেফাযত করুন। আপনার কথা যেন অন্যের হৃদয় ভাঙ্গার কারণ না হয়। বিশেষ করে নারীদেরকে বলছি,

আপনারা স্বামীর সন্তুষ্টির প্রতি সচেষ্ট হউন। কারণ তাকে সন্তুষ্ট রাখা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাদের উপর আরোপিত ফরয। এই যে বলা হলো, জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা বেশি হবে। এর দ্বারা একথা মনে করবেন না, আপনাদের সাথে অবিচার করা হয়েছে কিংবা বলপূর্বক আপনাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে আপনাদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বরং এটা তো আপনাদের আমলেরই ফল। যদি উক্ত অসৎ চরিত্র ত্যাগ করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ চাহে তো, আপনারাও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, জান্নাতী নারীদের সরদার হযরত ফাতেমা (রা.)। তিনি তার আমলের কারণেই এত বড় মর্যাদা লাভ করেছেন। সুতরাং জান্নাত ও জাহান্নামের উপযুক্ত হওয়ার মাধ্যম হলো আমল। আমলের ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে, কে জান্নাতের উপযুক্ত আর কে জাহান্নামের উপযোগী?

বান্দার হকের প্রতি গুরুত্ব

আরেকটি কথাও বুঝে নিন, যে কথাটি উক্ত হাদীস থেকে পাওয়া যায়। তা হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে অধিক জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসেবে এটা বলেননি যে, তারা নফল তেলাওয়াত অযীফা ইত্যাদি কম করে। বরং কারণ হিসেবে দু'টি জিনিসকে চিহ্নিত করেছেন। এক, অধিক লানত করা। দুই, স্বামীদের অবাধ্যতা করা। এই উভয়টির সম্পর্ক বান্দার হকের সাথে। এর দ্বারা বোঝা যায়, নফল ইবাদতের তুলনায় বান্দার হকের গুরুত্ব বেশি। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং সকল হক সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আদায় করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ·

নফসের টালবাহানা

মানুষের প্রবৃত্তিশক্তি যা মানুষের মাঝে কাজের প্রতি স্পৃহা জোগায়, তা পার্থিব ইনজয় লাভে অভ্যস্ত। তাই মানুষ যে কাজে বাহ্যিক আনন্দ এবং তৃপ্তি অনুভব করে, সেদিকেই মন ধাবিত হতে থাকে। এ জাতীয় কাজে অনুপ্রাণিত করাই নফস বা মনের স্বভাব। নফস মানুষকে এমনভাবে উৎসাহিত করে যে, কাজটি করো, আনন্দ পাবে, ইনজয় অনুভব করবে। এমতাবস্থায় মানুষ যদি নফসকে লাগামহীন ছেড়ে দেয় এবং তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তার কথা মতো কাজ করতে থাকে, তাহলে মানুষ আর প্রকৃত মানুষ থাকে না, বরং সে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর স্তরে নেমে যায়।

নফসের টালবাহানা

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا . أما بعد!

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين . (سورة العنكبوت ٦٩)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين .

যারা আমার রাস্তায় মুজাহাদা করবে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।

মুজাহাদার অর্থ

উক্ত আয়াতের আলোকে ইমাম নববী (রহ.) একটি অধ্যায়ের সূচনা করেছেন যার নামকরণ করেছেন– بَابٌ فِي الْمُجَاهَدَةِ 'মুজাহাদা অধ্যায়'।

মুজাহাদার আভিধানিক অর্থ সাধনা করা, চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা। 'জিহাদ' শব্দেরও শব্দমূল অভিন্ন। এই জন্যই জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ লড়াই করা নয়; বরং চেষ্টা, সাধনা বা মেহনত করা। সুতরাং জিহাদ ও মুজাহাদা শব্দদ্বয়ের অর্থ অভিন্ন। তবে কুরআন হাদীস ও সুফীদের পরিভাষায় মুজাহাদা বলা হয়, এমন বিষয়ে চেষ্টা-সাধনা করাকে যাদ্বারা সাধকের আমল-আখলাক তথা কর্ম ও চরিত্র পরিশীলিত হয়, মার্জিত হয়, সে নিজেকে গুনাহ থেকে মুক্ত রাখতে পারে এবং নিজের নফসকে দমন করতে সক্ষম হয়। এই মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে হলে যে শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন, তারই নাম মুজাহাদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

المجاهد من جاهد نفسه . (ترمذى، فضائل الجهاد : ١٦٢١)

অর্থাৎ প্রকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি যে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করাও জিহাদ। কিন্তু প্রকৃত মুজাহিদ্ সে যে তার নফস ও কুপ্রবৃত্তি এবং মনের অসাধু চাহিদা ও বাসনার হাতছানিকে পদদলিত করে সৎ ও ভালো পথ বেছে নিতে সক্ষম নয়। এরই নাম মুজাহাদা। সুতরাং যে ব্যক্তি নফসের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে, তাকে অবশ্যই কঠোর মুজাহাদা করতে হবে এবং মনের অসৎ অভিলাস ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করে তার উপর কঠোর শাসন চালিয়ে তিক্ততার স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। এভাবে রিপুর সাথে লড়াই করে তার বিপরীত অভ্যাস গড়ে তোলাই মুজাহাদার প্রকৃত অর্থ।

মানুষের মন বিনোদন প্রত্যাশী

মানুষের প্রবৃত্তি শক্তি তথা এমন শক্তি যা মানুষের মধ্যে কাজের স্পৃহা জোগায়, সেটি পার্থিব ইনজয় লাভে অভ্যস্ত। তাই মানুষ যে কাজে বাহ্যিক আনন্দ এবং তৃপ্তি অনুভব করে, সেদিকেই মন ধাবিত হতে থাকে। এ জাতীয় কাজে অনুপ্রাণিত করাই নফসের স্বভাব। নফস মানুষকে এমনভাবে উৎসাহিত করতে থাকে যে, কাজটি করো, আনন্দ পাবে, ইনজয় অনুভব হবে। এমতাবস্থায় মানুষ

যদি নফসকে লাগামহীন ছেড়ে দেয় এবং তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, তার কথা মতো কাজ করতে থাকে, তাহলে তখন মানুষ আর প্রকৃত মানুষ থাকে না। বরং সে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর স্তরে পৌছে যায়।

নফসের চাহিদার শেষ নেই

নফসের চাহিদার মূল স্বভাব হলো, তুমি তার আনুগত্য করতে থাকো, তার পিছনে চলতে থাকো, তার কথা মতো জীবনযাপন করতে থাকো, কখনো শান্ত হবে না। নফস কখনও একথা বলবে না যে, তার কামনা, চাহিদা পূরণ হয়ে গেছে, সে তৃপ্তি বা প্রশান্তি লাভ করেছে। এখন আর কোনো কিছুর চাওয়া পাওয়া নেই। এমনটি আজীবনেও হবার নয়। কারণ মানুষের চাহিদার অন্ত নেই। তাই নফসের বশ্যতা স্বীকারের মাধ্যমে কখনো স্থিরতা বা প্রশান্তি লাভ করা যায় না। প্রকৃতির নিয়ম হলো– যদি কেউ চায় যে, নফসের সকল দাবি পূরণ করবো, তাহলে কখনো সে ব্যক্তি প্রশান্তি ও স্থিরতার ঠিকানা খুঁজে পাবে না। নফস ও প্রবৃত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, একটির স্বাদ অনুভব করার সাথে সাথে আরেকটির স্বাদ আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়ে যাওয়া। সুতরাং যদি চাও নফসের চাহিদা পূরণ করে প্রশান্তিময় জীবন লাভ করবে তাহলে কখনো তা হবার নয়।

স্বাদ ও অভিলাসের অন্ত নেই

বর্তমানে যাদেরকে উন্নত জাতি মনে করা হয় তাদের বক্তব্য হলো, মানুষের প্রাইভেট লাইফ বা ব্যক্তিগত জীবনে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করো না। যার যা ইচ্ছা তাই করতে দাও, যেভাবে যে আনন্দ পায় তাকে সেভাবে আনন্দ করতে দাও। তাতে কোনা বিধি-নিষেধ আরোপ করো না। একটু লক্ষ্য করুন, বর্তমানে ভোগ বিলাসের পথে কোনো বাধা নেই। প্রচলিত আইন কিংবা সামাজিক বাধা কোনোটাই নেই। সবাই নিজের ইচ্ছে মতো চলছে। তদুপরি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভোগ উপভোগ পরিপূর্ণভাবে অর্জন হয়েছে তো? প্রতিউত্তরে কারো মুখ থেকে হ্যাঁ বের হবে না। প্রত্যেকের মনের আওয়াজ একটাই হবে, আরো চাই, আরো প্রয়োজন। যেহেতু চাওয়া পাওয়া তো অন্তহীন বিধায় এক চাহিদা আরো হাজারো চাহিদার জন্ম দেয়।

প্রকাশ্য ব্যভিচার

পশ্চিমা বিশ্বে একজন নারী ও একজন পুরুষ যদি তাদের জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে চায় তাহলে তাদের জন্য দরজা খোলা, তারা আপোসে যথেচ্ছা করতে পারে। বাধা দেয়াও কেউ নেই। ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে। যা বিশ্ববাসী প্রতিনিয়ত স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। তিনি ইরশাদ করেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন ব্যভিচার এতো ব্যাপক আকার ধারণ করবে যে, তখন দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভালো ও সভ্য মানুষ তাকে মনে করা হবে, যে দুই পাপিষ্ঠকে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখে বলবে, একটু গাছের আড়ালে গিয়ে করো, ওই লোকটি কোনো বাধাও দেবে না, নিন্দা বা মন্দও বলবে না। অর্থাৎ সে শুধু এতটুকু বলবে, কাজটা এভাবে প্রকাশ্যে সকলের চোখের সামনে না করে একটু গাছের আড়ালে গিয়ে করো। এতটুকুতেই সে সবচে উত্তম ও সভ্য লোক হিসেবে বিবেচিত হবে। বর্তমানে সে সময়টি আমাদের সামনে উপনীত। আজকাল অনেক দেশে প্রকাশ্যে ও অবাধে এই যৌনমিলন চলছে।

আমেরিকায় ধর্ষণের আধিক্য কেন?

আমেরিকায় ধর্ষণের আধিক্য কেন? যেখানে নিজের জৈবিক চাহিদা যে ভাবে ইচ্ছা সেভাবে মেটাতে পারে, কোনো বাধা বিপত্তি নেই। নারী পুরুষ ইচ্ছা করলেই যেভাবে ইচ্ছা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারে। এতদসত্ত্বেও আমেরিকায় ধর্ষণের এত ঘটনা কেন ঘটে? এই দেশটিতে ধর্ষণের ঘটনা যে হারে ঘটে বিশ্ব মানচিত্রে এর ন্যায় দ্বিতীয় আরেকটি দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর একমাত্র কারণ তারা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যভিচারের স্বাদ আস্বাদন করে ফেলেছে। তবুও তাদের মনের স্থিরতা বা প্রশান্তি আসেনি। এখন জোরপূর্বক ব্যভিচার করার লিপ্সা সৃষ্টি হয়েছে বিধায় ধর্ষণের স্বাদ আস্বাদন করতে চায়। চাহিদার কোনো সীমা নেই। বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই চাহিদা বা লালসা কখনো পূর্ণ হবার নয়।

এ পিপাসা নিবারণের নয়

আপনারা একটি ব্যাধির কথা হয়তো শুনেছেন। রোগটির আরবী নাম 'জওয়ুল বাক্কার' বা ক্ষুধার রোগ। রোগটির বৈশিষ্ট্য হলো, রোগীর ক্ষুধা লাগতে থাকে ফলে মন যা চায় তাই খেতে থাকে, কিন্তু ক্ষুধা মিটে না। অনুরূপ

আরেকটি রোগ হলো 'ইস্তেস্কা' বা পিপাসার রোগ। যার বৈশিষ্ট্য হলো, পিপাসার্ত ব্যক্তি যদি কলসের পর কলস বরং একটি কূপের পানিও যদি শেষ করে ফেলে, তবুও তার পিপাসা নিবারণ হয় না। মানুষের নফস বা প্রবৃত্তির চাহিদার অবস্থা ঠিক অনুরূপ। যদি নফসকে নিয়ন্ত্রণ বা পদদলিত করা না যায়, শরীয়তের আইন বা চারিত্রিক বাঁধনে না বাঁধা যায় তাহলে ইস্তেস্কা রোগের মতোই তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাহিদা পূর্ণ হবে না এবং স্থিরতাও লাভ হবে না। বরং আরো বাড়তে থাকবে।

এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ও তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা নফসের পিছনে চলোনা। তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করো না। কেননা এই নফস তোমাকে ধ্বংসের অতলান্ত খাদে নিয়ে যাবে। তাই তার লাগাম টেনে ধরো, তাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসো, শরীয়তের যৌক্তিক গণ্ডির ভেতরে রাখো। অবশ্য এরূপ করতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে তুমি সংকীর্ণতায় পড়বে। কিছু কষ্ট ও বেদনা অনুভূত হবে। কিন্তু পরে শান্তি, স্বস্তি ও স্থিরতা লাভ করে অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করতে পারবে।

নফস দুর্বলের উপর ব্যাঘ্রতুল্য

'আমি কখনো নফসের অনুসরণ করবো না, প্রবৃত্তির কাছে আমি হার মানবো না। যদি কেউ দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও নফসের বিরুদ্ধে একবার এই সংকল্পবদ্ধ হয় তখন অনায়াসে নফস দুর্বল হয়ে পড়ে। নফস ও শয়তান দুর্বলের উপর ব্যাঘ্রতুল্য। যে এদের সামনে ভেজা বেড়ালের মতো দুর্বলভাব দেখাবে, তাকেই তারা আছন্ন করে ফেলবে এবং তাকে ধরাশায়ী করে ফেলবে। আর দৃঢ় মনোবলের অধিকারী মানুষের কাছে নফস খুবই অসহায়। তার সামনে নফস অনায়াসে দুর্বল হয়ে পড়ে।

নফস দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায়

আল্লামা বুসিরী (রহ.) নামক একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসায় 'ক্বাসীদায় বুরদাহ' নামক একটি সুদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। তাতে তিনি নফস সম্পর্কে একটি জ্ঞানগর্ভ ও বিস্ময়কর কবিতা লিখেছেন। তিনি বলেন–

- اَلنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اَنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى ۔ حُبِّ الرِّضَاعِ وَاَنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ ۔

অর্থাৎ, নফস বা প্রবৃত্তি দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায়। তাকে দুধ পানের সুযোগ দিলে বড় হয়েও দুধ পানে অভ্যস্ত থেকে যাবে। আর যদি দুগ্ধপান বন্ধ করে দাও, তবে কিছুদিন কান্নাকাটি করে এমনিতেই সে তা ছেড়ে দিবে।

মানুষের নফস ও ঠিক যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। যে মায়ের দুধ পান করে এবং দুগ্ধপানে অভ্যস্থ। যদি তাকে দুধ ছাড়ানোর লক্ষ্যে দুগ্ধপান বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে প্রথম দিকে সে কান্নাকাটি করবে। অবশেষে দুগ্ধপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি এই চিন্তা করে যে, দুধ ছাড়ালে আমার সন্তান কান্নাকাটি করবে, তার কষ্ট হবে। সুতরাং তাকে দুধপান বন্ধ করা যাবে না। তাহলে এই শিশু বড় হয়েও দুগ্ধপান করতে চাইবে। তার সামনে রুটি বা সাধারণ খাবার আনলে সে বলবে, আমি খাবো না, আমাকে দুধ দিতে হবে। কিন্তু কোনো সচেতন মা-বাবা তাদের শিশু সন্তানটিকে সাময়িক কান্নাকাটি ও কষ্টের ভয়ে আজীবন মায়ের দুগ্ধপানে অভ্যস্ত রাখে না। তারা জানে, শিশুর দুগ্ধপান বন্ধ করলে সে স্বাভাবিক ভাবেই কিছুদিন কান্নাকাটি করবে, রাতে ঘুমোতে চাইবে না। মা-বাবাকে ঘুমোতে দিবে না। তবুও শিশুর বৃহত্তম স্বার্থ ও কল্যাণের কথা ভেবে তারা দুধ ছাড়িয়ে নেয়। যদি শিশুর দুধ ছাড়ানো না হয়, সারা জীবনেও সে স্বাভাবিক খাবারের উপযোগী হবে না।

গুনাহের স্বাদ তাকে পেয়ে বসেছে

আল্লামা বুসিরী (রহ.) বলেন, মানুষের নফসও এই ছোট শিশুটির ন্যায়। তার অন্তরে গুনাহের মজা জেঁকে বসেছে। যদি তাকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়, সে নানা রকম গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। তাকে তখন ফেরানো বড়ই মুশকিল হবে। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা, গীবত করা, সুদ ও ঘুষ খাওয়ায় অভ্যস্ত তার এসব বদ স্বভাব দূরীভূত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এখন যদি নফসের এই কষ্ট দেখে পিছিয়ে পড়ে বা ঘাবড়ে যায়, তাহলে সারা জীবনেও সে গুনাহের কাজ ছাড়তে পারবে না এবং সে আন্তরিক স্থিরতা ও প্রশান্তিও লাভ করতে পারবে না।

প্রশান্তি রয়েছে আল্লাহর যিকিরে

মনে রাখবে, নাফরমানীর মাঝে প্রশান্তি নেই। এ পৃথিবীর যাবতীয় উপায় উপকরণও যদি একসাথ করা হয়, তবুও প্রশান্তির ঠিকানা খুঁজে পাবে না, স্থিরতা লাভ হবে না। আমি একটু পূর্বে পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। সেখানে অর্থ সম্পদের পাহাড় রয়েছে, শিক্ষার আলো রয়েছে, আমোদ-প্রমোদ, চিত্তবিনোদন ও

ভোগ বিলাসের সকল দরজা উম্মুক্ত রয়েছে। তবুও তাদের মনে প্রশান্তি ও স্থিরতা নেই কেন? কারণ তারা শান্তি খুঁজে গুনাহ ও পাপাচারের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকে। এভাবে প্রশান্তির গন্ধও পাবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ . سُوْرَةُ الرَّعْدِ : ٢٨

আল্লাহর যিকিরের মাঝেই রয়েছে আত্মার প্রশান্তি ও স্থিরতা। নাফরমানী আর পাপাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকবে আর শান্তিও কামনা করবে এটা বোকামী ও মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। মনে রেখো! কখনো এভাবে শান্তি মিলবে না বরং তুমি তার ধারে কাছেও পৌছতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই প্রশান্তি ও স্থিরতা দিয়ে থাকেন, যাদের অন্তর আল্লাহর যিকির ও ভালোবাসায় সজীব ও সদা জাগ্রত থাকে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়তো বা তাদেরকে নিঃস্ব মনে হয়। অতএব দুনিয়াতে শান্তিও স্থিরতা লাভ করতে হলে অবশ্যই গুনাহ ত্যাগ করতে হবে। নফস তথা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর মুজাহাদা করতে হবে।

আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা হয় না

আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا .

অর্থাৎ, যারা আমার রাস্তায় কষ্ট ক্লেশ ও মুজাহাদা করবে, পরিবার-সমাজ ও নফসের অন্যায় আশা-আকাঙ্ক্ষা ভূলুণ্ঠিত করে আমার পথে চলবে। অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো।

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

হযরত থানভী (রহ.) উক্ত আয়াতের অর্থ এভাবে করেছেন, আমি তাদেরকে হাত ধরে আমার পথে পরিচালিত করবো। এমন নয় যে, শুধু দূর থেকে পথ দেখাবো। তবে প্রথমে তাকে একটু অগ্রসর হতে হবে, কিছুটা বদ্ধপরিকর হতে হবে এবং নফসের বিরুদ্ধে মেহনত করতে হবে, তারপর আল্লাহর সাহায্যের আগমন ঘটবে। এটা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি, যা কখনও মিথ্যা হবার নয়।

অতএব মুজাহাদা বলা হয় দৃঢ়তার সাথে এই ওয়াদাবদ্ধ হওয়া যে, আমি গুনাহর কাজ করবো না চাই মনে ব্যথা আসুক, নফসের চাহিদা পদদলিত হোক, মন মস্তিষ্কের উপর তুফান বয়ে যাক, তবুও গুনাহ করবো না। যে বান্দা এভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে, সেদিন থেকে সে আমার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, মাহবুবও

প্রিয় বান্দায় পরিণত হবে। আমি (আল্লাহ) নিজেই তার হাত ধরে তাকে আমার রাস্তায় উঠিয়ে নিব।

অন্তরকে আমি তোমার উপযোগী বানাবো

আত্মশুদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ হলো, মুজাহাদা ও দৃঢ় সংকল্প করা। আমার শাইখ ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) প্রায় কবিতাটি বলতেন–

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں
اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

মনের যত আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই খুন হোক, আফসোস ভূলুণ্ঠিত হোক, তবুও এ অন্তরকে তোমার উপযোগী বানাতে হবে আমাকে।

অর্থাৎ, মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা সমূহ আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিস্যাত হয়ে গেলেও আমি সংকল্প করলাম যে, অন্তরকে আজ থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য তৈরি করবো। এমনটি হলেই কেবল তখন অন্তরে আল্লাহর মারিফাতের আলো জ্বলে উঠবে। মহব্বত ও ভালোবাসায় অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। গুনাহ প্রকাশ পাবে না , তুমি দেখতে পাবে, তারপর থেকে আল্লাহ তা'আলার রহমত তোমার উপর অকল্পনীয় ভাবে অবতীর্ণ হচ্ছে।

মা এতো কষ্ট সহ্য করেন কেন?

একজন মায়ের প্রতি লক্ষ্য করো তার কেমন অবস্থা হয়, হাড় কাঁপানো শীতের রাতে লেপের নিচে মা ঘুমিয়ে আছেন। পাশেই তার শিশু সন্তান। এমনি মুহূর্তে শিশু পেশাব করে দিলো। এখন নফসের কথা হলো, আরামের বিছানা ছেড়ে কোথায় যাবো। কনকনে এই শীতের ভেতর আরামে ঘুমিয়ে থাকি। বিছানা থেকে উঠা এক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু মা চিন্তা করে যদি আমি বিছানা থেকে না উঠে শুয়ে থাকি, তাহলে আমার আদরের সন্তানের শরীর ও কাপড়-চোপড় ভেজা থেকে যাবে। এতে সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়বে। করুণাময়ী মা নিজের মনের চাহিদা বিসর্জন দিয়ে প্রচণ্ড শীতের রাতে বরফের মতো ঠাণ্ডা পানি দিয়ে শিশুর শরীর, জামা, কাপড় পরিষ্কার করে। কখনও সন্তানের পেশাব পায়খানা লেগে যাওয়ার কারণে তাকে গোসলও করতে হয়। এটা কি কোনো সাধারণ কষ্ট? কিন্তু মমতাময়ী মা এসব কষ্ট অকুণ্ঠচিত্তে সহ্য করে নেয়। কারণ

মায়ের একমাত্র কাম্য হলো, সন্তানের কল্যাণ ও সুস্থতা। যার ফলে সে এ কনকনে শীতের মধ্যে তার সকল আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দিয়ে এ সবকিছু করে যাচ্ছে।

ভালোবাসা কষ্টকে মিটিয়ে দেয়

এক মহিলার কোনো সন্তান নেই। সে ডাক্তারকে মিনতি স্বরে বলে ভাই! যেকোনো উপায়ে চিকিৎসা করুন, যাতে আমি সন্তানের মা হতে পারি। এই লক্ষ্যে সে বিভিন্ন স্থানে দু'আ, তাবিজ-কবজ তন্ত্র মন্ত্রসহ আরো কতো কিছুর দ্বারস্থ হয়। তার এই ব্যাকুলতা দেখে অপর মহিলা তাকে বলে, শোনো, তুমি যে সন্তানের আশা করছো সে তো বড়ই কষ্টের ব্যাপার। সন্তানকে লালন-পালন করতে হবে। প্রচণ্ড শীতের রাতে ঘুম বিসর্জন দিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে জামা কাপড় ধৌত করতে হবে। আরো কতো কী! সন্তানের প্রত্যাশী নিঃসন্তান মহিলা উত্তর দেয়, আমি একটি সন্তান পাওয়ার জন্য হাজার শীতের রাত কুরবান করবো।

মহিলার এমন বলার কারণ হচ্ছে, সন্তানের মূল্য ও গুরুত্ব তার হৃদয়ের গভীর প্রোথিক হয়ে গেছে। সন্তানের মুখ দেখে সে সমস্ত কষ্ট ভুলে যাবে। এসব কাজ যদিও বাস্তবেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু যৌক্তিকতার মানদণ্ডে দেখা যায় তা মায়ের জন্য প্রশান্তি বয়ে আনে। যখন প্রশান্তি লাভ হয়, তখন আশা-আকাঙ্ক্ষা কুরবান করার মাধ্যমেই আনন্দ পাওয়া যায়। কথাটিকে আল্লামা রুমী (রা.) এর ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে–

از محبت تلخہا شیریں شود

অর্থাৎ, ভালোবাসার কারণে তিক্ততর বস্তুও মিষ্ট হয়ে যায়।

মাওলার ভালোবাসা যেন লায়লার ভালোবাসার চেয়ে কম না হয়

মাওলানা রুমী (রহ.) তার রচিত মসনবী শরীফে প্রেম ও ভালোবাসার অনেক বিরল ঘটনাবলীর বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি লায়লা-মজনুর প্রেমের ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। মজনু লায়লার ভালোবাসায় আসক্ত হয়ে দুধের নহর খনন করা আরম্ভ করে দিয়েছিলো। তার এই পরিশ্রম ও কষ্ট দেখে কেউ কেউ তাকে বললো, তুমি যা করছো তা অত্যন্ত সঙ্গীন ও কষ্টসাধ্য কাজ। সুতরাং তা পরিত্যাগ করো। মজনু উত্তর দিলো, শত সহস্র কষ্ট, ক্লেশ কুরবান হোক তার

জন্য যার প্রেম ভালোবাসার নিমজ্জিত হয়ে আমি এসব করছি। এই নদী খননের মধ্যে আমি আনন্দ ও তৃপ্তি আস্বাদন করি। কেননা, এটা তো আমার প্রিয়ার জন্য করছি। মাওলানা রুমী (রা.) বলেন–

عشق مولی کے کم از لیلی بود

گوئے گشتن بہر اواو لے بود

অর্থাৎ, মাওলার ভালোবাসা কিভাবে লায়লার ভালোবাসা অপেক্ষা কম হয়? মাওলার জন্য গোলাকার বল হয়ে যাওয়াও তো আরো বেশি উত্তম। তাই মানুষ যখন ভালোবাসার খাতিরে কষ্ট ক্লেশ সহ্য করে, তখন তার কষ্ট-ক্লেশ আনন্দ ও প্রশান্তিতে পরিণত হয়।

বেতনের মহব্বত

এক ব্যক্তি অন্যের অধীনে চাকুরি করে। কঠিন শীতের মৌসুমেও কাক ডাকা ভোরে তাকে চলে যেতে হয় আরামের শয্যা ত্যাগ করে। কখনো বা এমন হয় যে আদরের সন্তানদেরকে ঘুমে রেখে যায়, আবার রাতে ফিরে এসে তাদেরকে ঘুমন্ত পায়। এখন যদি তাকে কেউ বলে, ভাই! তোমার চাকুরি তো দেখি ভীষণ কষ্টের, চলো আমি তোমার চাকুরি ছাড়িয়ে দেই। কারণ এতো ভোরে ওঠা, স্ত্রী সন্তান ছেড়ে চলে যাওয়া, সারাদিন অপরের অধীনে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করা, সবগুলোই মনের চাহিদার পরিপন্থী! সে ব্যক্তি উত্তর দিবে, আরে ভাই! এই চাকুরি তো অনেক কষ্টের পরে পেয়েছি, চাকুরি ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই উঠে না।

কাক ডাকা ভোরে স্ত্রী সন্তান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার মাধ্যমেই সে পরিতৃপ্তি লাভ করে। কারণ বেতন ও ভাতার সাথে তার মহব্বত তৈরি হয়ে গিয়েছে, যা সে মাস শেষে পায়। তখন এসব কষ্ট তার কাছে আনন্দদায়ক হয়ে যায়। কোনো সময় তার চাকুরি চলে গেলে সে কাঁদবে। সুপারিশের জন্য কর্মকর্তাদের দ্বারে দ্বারে সে ঘুরবে, যেন চাকুরিতে তাকে পুনঃ নিয়োগ দেয়া হয়।

যদি কোন বস্তুর সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসা গড়ে উঠে। তখন উক্ত বস্তু পাওয়ার সাথে সাথে তার জন্য সকল কষ্ট সুখকর হয়ে যায়। এর মাধ্যমেই সে প্রশান্তি লাভ করে । তদ্রূপ গুনাহের কাজ বর্জন করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রথমে তাতে কষ্ট হবে। কিন্তু কেউ একবার যদি গুনাহের কাজ ছেড়ে দেয়ার উপর

বদ্ধপরিকর হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসতে থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্যের মজা পেতে থাকে।

ইবাদতের স্বাদ লাভে অভ্যস্ত হও

আমাদের শাইখ ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) একবার একটি বিরল ও সুন্দর কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন, নফস তো তৃপ্তি ও আনন্দের তীব্র আকাঙ্ক্ষা করে। তার খোরাকই হলো স্বাদ, মজা, আনন্দ ও ভোগ বিলাস।এই চিত্তবিনোদন ও ভোগ বিলাসিতার নির্দিষ্ট কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। সুতরাং তাকে অবশ্যই আনন্দ ও উপভোগ দিতে হবে। এখন যদি নফসকে খারাপ কাজ ও অন্যায় আকাঙ্ক্ষায় অভ্যস্ত করে তোলে, তাহলে সে খারাপ কাজেই আনন্দ উপভোগ করবে। আর যদি তাকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপনের অভ্যস্ত করে তোলো, তাহলে নফস তার মধ্যেই আনন্দ ও স্বাদ পাবে।

দিন রাত আমাকে আত্মহারা হয়ে থাকা উচিত

কবি গালিবের একটি প্রসিদ্ধ কবিতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন, লোকেরা তার কী অর্থ করে। কিন্তু আমাদের শাইখ ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) কবিতাটির খুব সুন্দর অর্থ করেছেন। কবিতাটি হলো–

مے سے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو

اک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے

অর্থাৎ, মদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি দিনরাত আত্মহারা হয়ে থাকতে চাই। তোমরা আমাকে মদের স্বাদের অভ্যস্ত বানিয়েছ, তাই তাতেই আত্মহারা হয়ে থাকি। তোমরা যদি আমাকে আল্লাহর যিকির, তাঁর স্মরণ ও ভালোবাসায় অভ্যস্ত করে তুলতে, তবে আমি তার মজাতেই আত্মহারা হয়ে থাকতাম। এটাই তোমাদের ভুল যে, তোমরা আমাকে ভালো কাজের অভ্যস্ত না বানিয়ে মদ আস্বাদনে অভ্যস্ত বানিয়েছ।

নফসকে অবদমিত করে স্বাদ পাবে

তদ্রূপ এই মুজাহাদা প্রথম প্রথম তো কষ্টকর মনে হবে। নফস চাচ্ছে গীবত করতে। গীবতের মজলিসে বসে চায়ের কাপে ঝড় তুলতে। এখন সবক দেয়া হচ্ছে তাতে লাগাম লাগানোর। তাই এটা এখন এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু

মনে রাখবো, অভিজ্ঞতা না থাকার দরুন এটাকে কষ্টসাধ্য মনে হয়। একটিবার মাত্র নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা করার দৃঢ় সংকল্প করুন, তাহলে দেখতে পাবেন, এর মাঝেই প্রকৃত স্বাদ বিদ্যমান। নফসকে অবদমিত করার স্বাদ নফসের গোলামি করার স্বাদ অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি।

ঈমানের স্বাদ আস্বাদন কর

হাদীস শরীফে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তির অন্তরে কুদৃষ্টি দেয়ার স্বাদ জাগলো। আর এমন কে বা আছে যার অন্তরে এরূপ আগ্রহ জাগে না। এখন তার অন্তর বারবার চাচ্ছে, তাকে একটিবার দেখেই নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভক্তি ও ভয়ের কারণে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। তার দিকে সে তাকালো না। এতে তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের এমন স্বাদ ও তৃপ্তি দান করবেন যে, তখন পূর্বের কুদৃষ্টির স্বাদ তার নিকট খুবই তুচ্ছ মনে হবে।

এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিশ্রুতি, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। [মুসনাদে আহমদ ঃ খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৫৬]

যে কোনো গুনাহের কাজ বর্জন করার ক্ষেত্রেও হাদীসটি প্রযোজ্য। যেমন গীবতের মধ্যে অনেক মজা, কিন্তু একবার যখন আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করে গীবত ছেড়ে দিবেন কিংবা গীবত করতে করতে থেমে যাবেন, তখন দেখবেন, কী রকম স্বাদও আত্মতৃপ্তি অনুভব হয়। মানুষ যখন গুনাহের স্বাদের পরিবর্তে গুনাহ বর্জনের স্বাদ আস্বাদনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর ভালোবাসা ও সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

তাসাউফের মূলকথা

হাকীমুল উম্মাত হযরত আশরফ আলী থানভী (রহ.) অত্যন্ত চমকপ্রদ কথা বলেছেন। যা ভালোভাবে স্মরণ রাখার মতো। তিনি বলেছেন, তাসাউফের মূল কথা হলো,যখন কারো অন্তরে শরীয়তের কোনো বিধি-বিধান পালনে উদাসীনতা সৃষ্টি হয়, তখন তার বিরোধিতা করা। যেমন নামাযের সময় হয়েছে, কিন্তু নামাযে উপস্থিত হতে অলসতা লাগছে। এই অলসতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে নামাযের বিধানের প্রতি আনুগত্যতা প্রকাশ করা। তদ্রূপ গুনাহ বর্জন করার ব্যাপারেও যদি উদাসীনতা আসে, তখন গুনাহ বর্জন করে নফসের বিরোধিতা করা। এরপর তিনি বলেন, ফলে এভাবেই আল্লাহ তা'আলার সাথে মিতালী গড়ে

উঠবে। এর মাধ্যমেই সম্পর্ক উন্নত ও গভীর হতে থাকবে। তাই যখন কেউ নফসের চাহিদা সমূহকে পদদলিত করে তাকে নিঃশেষ করে দেয়, তখন তার অন্তর আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লী ও জ্যোতি বিচ্ছুরণের পাত্রে পরিণত হবে।

অন্তর তো ভাঙ্গার জন্যই

আমার মরহুম আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) একটি দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। এখন তো পূর্ব যুগের অবস্থা নেই। পূর্বযুগে ইউনানী শাস্ত্রীয় চিকিৎসক বা হাকীম পাওয়া যেতো। তারা কুশতাহ (একপ্রকার শক্তিবর্ধক হালুয়া জাতীয় টনিক) বানাতো স্বর্ণের কুশতাহ, রৌপ্যের কুশতাহ,, না জানি আরো কতো কি! কুশতাহ বানানোর জন্য তারা স্বর্ণ-রৌপ্য আরো বিভিন্ন মূল্যবান পাদার্থকে আগুনে খুব ভালো ভাবে জ্বালাতো। তাদের থিউরি ছিলো, এসব ধাতব যত বেশি জ্বালানো হবে তত বেশি শক্তিবর্ধক হবে। কুশতাহ তৈরির পর তা বর্ণনাতীত শক্তিবর্ধক হতো।

আমার মরহুম আব্বাজান নফসকে সেই কুশতাহর সাথে তুলনা করে বলতেন, যখন নফসকে অবদমিত করে নিস্তেজ করে ফেলবে, তখন তা কুশতাহর মতো হয়ে যাবে। তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক গড়ার যোগ্যতা চলে আসবে। তাঁকে ভালোভাসার শক্তি লাভ হবে এবং তাঁর নূর ও তাজাল্লির উপযুক্ত বনে যাবে। অন্তরকে যত ভাঙ্গা হবে ততোই আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হবে।

تو بچا بچا کے نہ رکھا اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ

جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

অর্থাৎ, এটা আয়েনা আর ওটিও আয়না বলে আগলে রোখো না। কারণ ভাঙ্গা আয়নাই তো আয়না প্রস্তুতকারীর অধিক প্রিয়।

তাই নফসকে যতো করাঘাত করবে ততো বেশি নফসের স্রষ্টার কাছে প্রিয় হবে। কারণ নফসের স্রষ্টা তাকে ভাঙ্গার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তার জন্যই নফসকে শাস্তি দিতে হবে। আর নফসকে কষ্ট দিতে পারলে নফস কী হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আমাদের ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) সুন্দর একটি কবিতা বলেছেন–

یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پٹک دیا

اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

অর্থাৎ, এই বলে পেয়ালা প্রস্তুতকারক পেয়ালা হাত থেকে ফেলে দিলো যে, এখন সে তা বেঙ্গে অন্য কিছু বানাবে। সুতরাং ভেবোনা যে, প্রবৃত্তি দমনের কারণে যে দুঃখ কষ্ট হবে তা বিফলে যাবে। বরং এরপর আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র হবে। তার যিকির ও স্মরণের উপাযোগী হবে। এমন প্রশান্তি ও তৃপ্তি পাবে যে, আল্লাহর কসম, সেই স্বাদের কাছে গুনাহ ও পাপের স্বাদ তুচ্ছ ও মাটি মনে হবে। গুনাহকে অসাড় মনে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই অমূল্য সম্পদ নসীব করুন। হ্যাঁ, এর জন্য প্রথম পর্যায়ে কিছু কষ্ট ও পরিশ্রম তো করতেই হবে। আর এরই নাম হলো মুজাহাদা। কথাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে এভাবে বলেছেন–

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ.

অর্থাৎ 'প্রকৃত মুজাহিদ তো সেই, যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে, নিজের নফসকে আল্লাহর জন্য দাবিয়ে রাখে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। নফসের খেলার পুতুল হওয়া থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন। প্রবৃত্তির চাহিদাসমূহ কাবু করে রাখার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

মুজাহাদা কেন প্রয়োজন?

ইতিপূর্বেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যার সারকথা হলো, মুজাহাদার অর্থ হচ্ছে নফসের চাহিদা সমূহের মোকাবিলা করে আল্লাহর বিধান মতে জীবন পরিচালনার ফিকির করা। একেই বলা হয় মুজাহাদা। মুজাহাদা কেন করতে হয়, এর প্রয়োজন–ই বা কি? এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি? এসব বিষয় ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য একটু বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। তাই আসুন এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

মুজাহাদা কেন প্রয়োজন?

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل
عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله
الا الله وحده لاشريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا
محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله
واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا . اما بعد!
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع
المحسنين . (سورة العنكبوت ٦٩)
امنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي
الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.

যারা আমার পথে মুজাহাদা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের সাথে আছেন।

[সূরা আনকাবূত, আয়াত : ৬৯]

জাগতিক কাজেও মুজাহাদা

দ্বীনের কাজ তো মুজাহাদা চেষ্টা-সাধনা ছাড়া চলেই না, বরং জাগতিক কাজও মুজাহাদা ছাড়া হয় না। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে মানুষকে দৌড়ঝাপ করতে হয়, নিজের কামনা-অভিলাস বিসর্জন দিতে হয়। নফসের অভিলাস তো ছিল, দিব্যি আরামে বাসায় বসে থাকবে। তবুও মানুষকে ছুটে বেড়াতে হয়, যেহেতু শুয়ে-বসে থাকলে উপার্জন করবে কে?

শিশুকাল থেকে মুজাহাদার অভ্যাস

এই মুজাহাদা শুরু হয় শিশুকাল থেকেই। একটি শিশু পড়ার বয়সে পড়তে যেতে হয়, মনে না চাইলেও অভিভাবকের চাপে সে পড়তে যায়, চাহিদার বিপরীত কাজ তাকে করতেই হয়। একেই বলে মুজাহাদা তথা চেষ্টা-সাধনা। শিক্ষার্জনের লক্ষ্যে, উপার্জনের প্রয়োজনে বরং দুনিয়ার সকল প্রয়োজনে মানুষকে কামনা-বাসনার বিপরীতে সাধনা করতে হয়। কেউ এমনটি না করলে পার্থিব কোনো বিষয়ই সে লাভ করতে পারবে না। বিফল হবে জীবনের সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

জান্নাত হবে মুজাহাদা মুক্ত

আল্লাহ তা'আলা তিন ধরনের জগত সৃষ্টি করেছেন। প্রথমটি হলো যাতে মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। কোনো কাজই যেখানে মনের বিপরীত হবে না। সব ধরনের কাজ করার স্বাধীনতা সে জগতে থাকবে। সকল সুযোগ সেখানে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। এ জগতটি হচ্ছে জান্নাত। এ জগত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ.

(سُوْرَةُ حٰمٓ سَجْدَة : ٣١)

সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা ফরমায়েশ করবে।" [সূরা হা-মীম সিজদাহ : আয়াত ৩১]

হাদীস শরীফে এর ব্যাখ্যা আরো সবিস্তারে এসেছে। যেমন কারো হয়তো বেদানার জুস পান করার ইচ্ছে জাগবে, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে বেদানার জুস। অথচ বেদানা, বেদানাবৃক্ষ, জুসমেশিন কিছুই হয়তো তার দৃষ্টিগোচর হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এমন শক্তি দান করবেন যে, চাওয়া মাত্র সে কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে যাবে। এর জন্য আকাঙ্ক্ষা অবদমিত করার, মনকে বুঝানোর কিংবা কাঙ্ক্ষিত বস্তুর জন্য চেষ্টা করার প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজন হবে না কোনো মুজাহাদা বা সাধনার। এটাই হলো জান্নাত। মহান আল্লাহ আপন মহিমায় আমাদেরকে এ জগতের বাসিন্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

যে জগতের নাম জাহান্নাম

দ্বিতীয় জগতটি উপরোক্ত জগতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে সব কাজই চলে ইচ্ছার বিপরীতে। দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসীবত, বেদনা-পেরেশানিসহ মনের প্রতিকূলে সব ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রিয় জিনিস এ জগতে থাকবে। আরাম-আনন্দ এবং শান্তি বলতে কোনো কিছুই সেখানে আশা করা যাবে না। ওই জগতকেই বলা হয় জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে জাহান্নাম থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

এ জগতের নাম দুনিয়া

তৃতীয় জগতটি বৈচিত্র্যময়। যেখানে ইচ্ছার অনুকূল-প্রতিকূল অর্থাৎ উভয় ধরনেরই বস্তু থাকবে। আনন্দ-বেদনা, কষ্ট-আরাম, সুখ-দুঃখ সবই এখানে রয়েছে। আবার কখনো সুখ ও আনন্দের মাঝে লুকিয়ে থাকে কষ্ট, বিষাদ। স্বস্তির ভেতর ঘাপটি মেরে থাকে অস্বস্তি। তেমনি কখনো দুঃখের পেছনে ঘুমিয়ে থাকে সুখ। নিরানন্দের ভেতরে চুপটি মেরে থাকে আনন্দ। কান্নার মাঝে চাপা পড়ে থাকে হাসি। এ বৈচিত্র্যময় জগতটিই হচ্ছে দুনিয়া। এ জগতে বিশাল অর্থ বৈভব, ভবন-অট্টালিকা এবং আবিষ্কার ও উপকরণের মালিককেও যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার জীবনে বেদনাদায়ক কোনো ঘটনা আছে কি? পুরো জীবন কি সুখ শান্তিতেই কাটিয়েছেন? তাহলে একজনকেও পাবেন না যিনি এর উত্তরে বলবেন যে, জীবটা পুরোপুরি সুখ ও শান্তিতেই কেটেছে, জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়েছে। কেন পাবেন না? যেহেতু এটা জান্নাত নয়, এটা দুনিয়া। এখানে সুখ ও দুঃখ হাত ধরাধরি করে চলে। এখানে শুধুই সুখ ও শান্তির আশা দুরাশা ছাড়া কিছুই নয়। এমন আশা জীবনেও পূর্ণ হবার নয়। কবি বলেছেন–

قیدِ حیات بند وغم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

"যেহেতু জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে দুশ্চিন্তা পেরেশানী, তাহলে মৃত্যুর পূর্বে মানুষ পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে কেন?"

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। সুখ ও শান্তির পাশাপাশি দুঃখ এবং বেদনাও সমভাবে এখানে উপস্থিত। তাই নিঃশ্বাস থাকতে কেউ পেরেশানী থেকে মুক্তি লাভের চিন্তা এ জগতে করতে পারে না। কোথায় আমরা আর কোথায় আম্বিয়ায়ে কেরাম! তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সবচে প্রিয় বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তাদের জীবনেও দুঃখ কষ্ট এসেছে। বরং অনেক সময় তো সাধারণ মানুষের চেয়েও বেশি যন্ত্রণা তাঁরা ভোগ করেছেন। মোটকথা, পেরেশানী থেকে মুক্ত হওয়া এ জগতে সম্ভব নয়। কী মুমিন, কী কাফির, কী আস্তিক, কী নাস্তিক সকলকেই দুঃখ কষ্টের শিকার হতে হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজটি করে নাও।

অতএব, এ দুনিয়া পরিচালনার জন্য মানুষের সামনে দু'টি পথ। প্রথম পথ এই যে, মানুষ প্রবৃত্তির বিপরীত কাজ করবে, দুঃখ কষ্ট সহ্য করে জীবন কাটাবে, কিন্তু এতসব দুঃখ কষ্টের ফলাফল আখিরাতে কিছুই পাবে না। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিও ভাগ্যে জুটবে না।

দ্বিতীয় পথ হলো, মানুষ প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে চলবে, পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে জীবন কাটাবে, যেন আখিরাতের জীবন উজ্জ্বল হয়, আল্লাহও যেন খুশি হন। প্রকৃতপক্ষে নবীগণও দ্বিতীয় এ পথটির প্রতিই মানুষকে ডেকেছেন। তাঁরা বলেছেন, দুনিয়াতে যখন নিজের মন মত চলা যায় না, চাইলেও চলা যায় না, না চাইলেও না, তখন কেবল এই প্রতিজ্ঞাই করে নাও যে, মন মত যখন চলাই যাবে না, তাহলে সেভাবেই চলবো যেভাবে চললে আল্লাহ তা'আলা রাজি খুশি হন।

মুয়াযযিন নামাযের দিকে আহ্বান করছেন, কিন্তু অলসতা আপনাকে পেয়ে বসেছে, মসজিদে যেতে মন চায় না, এখন আপনার সামনে দু'টি পথ। মনকে শাস্তি দিয়ে মসজিদে যাবেন অথবা তার সামনে বশ্যতা স্বীকার করবেন। আপনি গ্রহণ করলেন দ্বিতীয় পথ, মনের কাছে হেরে গেলেন। তাই মসজিদে গেলেন না, শুয়ে রইলেন। ইতোমধ্যে কেউ এসে আপনার দরজা নাড়া দিল। এবার যে আপনাকে বিছানা ছাড়তেই হবে। বিছানা থেকে উঠলেন। বাইরে গেলেন। তার সাথে কথাবার্তা বললেন। তাহলে হলো কী? অবশেষে আপনার মনের বিপরীত কাজই করতে হলো।

আরামকে মাটি করে দিয়ে আপনাকে উঠতেই হলো। বোঝা গেলো, কেউ ইচ্ছা করলেই মনচাহি জীবন যাপন করতে পারে না কিংবা কষ্ট থেকেও নিজেকে বাঁচাতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ সন্তুষ্ট হন যে পথে, সেই পথটাই গ্রহণ করা উচিত। আরামকে হারাম করে মসজিদে যাওয়াটাই অধিক শ্রেয়।

এ সময়ে যদি প্রেসিডেন্টের পয়গাম আসে

বড় কাজের কথা বলতেন আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.)। তিনি বলতেন, ভাই, মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে কিংবা দ্বীনের অন্য কোন কাজ করতে গেলে যদি তোমার মাঝে অলসতা আসে। মনে কর, ফজর অথবা তাহাজ্জুদের নামাযের সময় তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো, কিন্তু চোখে ঘুম, উঠতে কষ্ট হচ্ছে। তখন একটু ভাবো যে, ঘুমের এ ঘোরের মধ্যে যদি তোমার নিকট প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে কোনো পয়গাম আসে, যদি বলা হয়, এ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট তোমাকে ডেকেছে, বড় কোনো পদক তোমাকে দেয়া হবে। বল তো, তখন তোমার ঘুম যাবে কোথায়? নিশ্চয়ই ঘুম, অলসতা সবই পালাবে।

কিন্তু কেন? যেহেতু প্রেসিডেন্টের সম্মান, পদকের মর্যাদা সম্পর্কে তোমার জানা আছে। তাই মন চাইলেও এখন আর বিছানায় শুয়ে থাকবে না, বরং পারলে দৌড়ে যাবে, ভাববে সুযোগ তো সবসময় আসে না, তাই এই মহা সুযোগ আলসেমির কারণে নষ্ট করে দেয়া যাবে না। আরে ভাই! দুনিয়ার প্রেসিডেন্ট থেকে পদক লাভের আশায় যদি তুমি এভাবে গাফলতি ছুঁড়ে ফেলতে পার, তাহলে বিশ্ব জাহানের প্রভু মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কি ক্ষণিকের আরামও ছাড়তে পার না? যেভাবেই হোক, তোমাকে যখন আরাম ছাড়তেই হয়, তাহলে এই ছাড়াটা একটু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে করা যায় না?

মহান আল্লাহ তাঁর সঙ্গী

এ পয়গামই ছিলো আম্বিয়ায়ে কেরামের। তাঁরা মানুষকে নফসের সঙ্গে লড়াই করার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এরই নাম মুজাহাদা তথা সাধনা। সাধনার এই পথে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমাদেরকে যখন চলতেই হয়, তাহলে এ পথে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় চলাটাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর কোনো লাভ আমরা দেখতে না পেলেও মহান আল্লাহ ওয়াদা করেছেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا .

যারা আমার পথে মুজাহাদা-সাধনা করবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো।

কাজ সহজ হয়ে যাবে

আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথী হন কিভাবে? এভাবে যে, প্রথমদিকে নফসের এ বিরোধিতা কঠিন মনে হতো, তবিয়তপরিপন্থী কাজ করা কষ্টকর হতো, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে তাঁর পথে চলার উপর বদ্ধপরিকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই কঠিন ও কষ্টকর বিষয়ও সহজ হয়ে যায়। সহজটা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই করে দেন। যথা এক ব্যক্তির নিকট নামায পড়া কষ্টকর মনে হতো। পাঁচ ওয়াক্ত নামায তার নিকট এক মহা ঝক্কি-ঝামেলার বিষয় মনে হতো। কিন্তু সে নফসের সাথে লড়াই করে নামায পড়া শুরু করে দিল।

কিছুদিন যেতে না যেতে সে নামাযে অভ্যস্ত হয়ে গেলো। নামায এখন আর তার কাছে কষ্টকর মনে হয় না। বরং কেউ হাজার টাকার বদৌলতেও নামায ছাড়ার কথা বললে সে সম্মত হবে না। সম্মত হবে না কেন? যেহেতু শুরুর দিকে নামায পড়া তার নিকট কষ্টকর মনে হলেও পরবর্তীতে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পড়ার কারণে তা সহজ হয়ে গেছে। আর সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা।

সামনে অগ্রসর হও

দ্বীনের সম্পূর্ণ বিষয়টি এমনই। মানুষ বসে বসে ভাবতে থাকলে সঙ্গীন মনে হবে। কিন্তু দ্বীনের পথে চলা আরম্ভ করলে আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দেন। হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এ প্রসঙ্গে সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। একটি দীর্ঘ সরু পথ, দু'ধারে গাছের সারি, ডানে-বামে বৃক্ষরাজি। এমন একটি পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সম্মুখ পানে দৃষ্টি দিলে মনে হবে, একটু পরেই পথটি মিলিয়ে গেছে, যেখান থেকে সম্মুখ যাওয়ার পথ একেবারেই বন্ধ। এ অবস্থা দেখে কোনো নির্বোধ যদি মনে করে, যেহেতু একটু পরেই পথটি মিলিয়ে গেছে, তাই এই পথে চলাটা অযথা। এমন মনে করলে লোকটি কখনো লক্ষ্যস্থলে পৌছতে পারবে না। আপন লক্ষ্যস্থলে তো সেই পৌছতে পারবে যে সম্মুখপানে পথ বন্ধ দেখেও তার তোয়াক্কা না করে সাহসিকতার সাথে সম্মুখপানে চলতেই থাকে।

যেহেতু যখন সে পথ চলা শুরু করবে তখন সে অনুধাবন করতে পারবে যে, পথ বন্ধ হয়ে যাওয়াটা ছিলো চোখের একটা ধোঁকা। প্রকৃত পক্ষে সামনে এগুতে থাকলেই বোঝা যেত যে পথ বন্ধ হয়নি। তেমনি দ্বীনের উপর যারা চলতে চায় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলেন, দ্বীন থেকে দূরে বসে থাকলে মনে হবে আসলে দ্বীনের পথে চলা মুশকিল। দূর থেকে মুশকিল মনে করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকো না, বরং সামনে বাড়তে থাকো, দেখতে পাবে এই পথে চলা কত সহজ। সহজ তো করবেন আল্লাহ তা'আলাই। তোমার প্রয়োজন শুধু মনচাহি জীবনের উল্টো দিকে চলার হিম্মত এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার। আর একেই বলে মুজাহাদা, চেষ্টা ও সাধনা।

বৈধ কাজ থেকে বেঁচে থাকাও মুজাহাদা

অবৈধ ও শরীয়ত পরিপন্থি কাজ থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখাই প্রকৃত মুজাহাদা। কিন্তু আমাদের নফস যেহেতু আরাম-আয়েশ, আশা আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-ইনুজয়ে অভ্যস্ত এবং এত বেশি অভ্যস্ত যে, এ নফসকে এখন শরীয়তের প্রতি টেনে আনতে চাইলেও সে আসে না, তাই এখন তাকে পরাজিত করতে হলে, আল্লাহর নির্দেশিত বিধিবধানের সামনে বশ্যতা স্বীকার করাতে হলে, প্রয়োজন হবে মাঝে মধ্যে বৈধ জিনিসকেও ত্যাগ করার। কারণ, বৈধ জিনিস থেকেও যখন তাকে মাঝে মধ্যে বঞ্চিত রাখা হবে, তখন সে আস্তে আস্তে অবৈধ কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করার যোগ্যতাও অর্জন করে নিবে। তখন নিজেকে অবৈধ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা সহজ হবে। সুফীগণের পরিভাষায় এটাকেই বলা হয় মুজাহাদা।

যেমন- পেট ভরে খাওয়া গুনাহের কাজ নয়। অথচ সুফীগণ বলেছেন, পেট ভরে খেয়োনা, পেট ভরে খেলে নফস অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। মজার মজার জিনিসের প্রতি লোভাতুর হবে, তাই নফসকে সুস্থ রাখার জন্য আহার কিছুটা হ্রাস কর। এটাও মুজাহাদা।

বৈধ কাজেও মুজাহাদা কেন?

হযরত মাওলানা ইয়াকুব (রহ.) কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! সুফীগণ বৈধ কাজ থেকেও বিরত থাকতে বলেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা বৈধ করেছেন- এটা কেমন কথা? উত্তরে হযরত বললেন, দেখো, বিষয়টির দৃষ্টান্ত যেন কিতাবের এই পাতাটির মত। পাতাটিকে তুমি মুড়িয়ে নাও। লোকটি

মুড়িয়ে নিলেন। হযরত বললেন, আচ্ছা, এবার তাকে আগের মত সোজা কর, কিন্তু এখন তো আর সোজা হয় না, চেষ্টা করেও লোকটি সোজা করতে পারলো না। হযরত বললেন, সোজা করার উপয় হলো, পাতাটিকে উল্টো দিকে মুড়িয়ে নাও। দেখবে সোজা হয়ে গেছে। তারপর তিনি বললেন, নফসের কাগজটিও গুনাহ ও মুসীবতের দিকে পাক খেয়ে আছে। এখন তাকে সোজা করতে গেলে সোজা হবে না তাকে তার কামনা-বাসনা থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দাও, পাশাপাশি কিছু বৈধ কাজও ছেড়ে দাও, যার ফলশ্রুতিতে দেখবে সে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে সঠিক পথে চলে এসেছে। আর এটাও তো মুজাহাদা।

চার বিষয়ে মুজাহাদা

প্রসিদ্ধ আছে যে, সুফীগণের দরবারে চারটি বিষয়ে মুজাহাদা হয়। (১) تَقلیل طَعام তথা কম আহার (২) تقلیل کلام তথা কম কথা বলা। (৩) تقلیل مَنام তথা কম নিদ্রা যাওয়া। (৪) تَقلیل الا ختِلاط مع الاَ نام তথা মানুষের সাথে কম মেলামেশা করা।

স্বল্প আহারের পরিসীমা

(১) تقلیل طعام তথা আহারেহ্রাস করা। আগের যামানায় সুফীগণ কম আহারের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং কঠিন কঠিন মুজাহাদা করাতেন। এমনকি কোনো কোনো সময় মানুষ ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়তো। কিন্তু হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেছেন, এই যামানায় এ রকম মুজাহাদা করা যাবে না। এখন এমনিতেই মানুষের পেশী শক্তি দুর্বল। তার উপর যদি খাবারও কমিয়ে দেয়া হয় তাহলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে। ফলে এমনও হতে পারে আগে যে ইবাদত করতো, এখন আর তাও পারবে না। তাই বর্তমানে একটি কাজ করলে স্বল্প আহারের উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে যাবে। অর্থাৎ খাবারের সময় একটা সময় আসে যখন মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায় যে, আরো খাবো কি খাবো না? আরেকটু নিবো কি নিবো না? এই দ্বিধার মুহূর্তটি আসলে তখন আর খেয়ো না। এভাবেই সুফীগণের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

ওজনও কম, আল্লাহও খুশি

ওজন কম, আল্লাহও খুশি কথাটি আমি আব্বাজন মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) এবং হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.) থেকে কয়েক বার শুনেছি।

মাওয়ায়েজেও পড়েছি। পরবর্তী একজন দক্ষ ডাক্তারের এ বিষয়ে কিছু লিখা আমার দৃষ্টিগোচর হলো, তিনি লিখেছেন–

আকজাল মানুষ ওজন হ্রাস করার জন্য কত রকম পরামর্শ গ্রহণ করে। কেউ রুটি ছেড়েছে, কেউ ছেড়েছে দুপুরের খাবার। আরো কত কী। বর্তমানের পরিভাষায় একে বলা হয় 'ডাইটিং'। ইউরোপে এর প্রচলন ব্যাপক মহামারির মতো ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। এর উদ্দেশ্য শরীরের ওজন কমানো। সবিশেষ করে নারীদের মাঝেই এর প্রচলন বেশি। তারা ট্যাবলেট খেয়ে ওজন হ্রাস করার চেষ্টা করে। এ পদ্ধতিতে অনেক সময় মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়ে।

অতঃপর ডাক্তার সাহেব লিখেন, আমার মতে ওজন কমানোর সর্বোত্তব পদ্ধতি হলো, মানুষ কোনো বেলার আহার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিবে না, রুটিও কমাবে না, বরং সারা জীবনের রুটিন এভাবে করে নিবে যে, ক্ষুধার তুলনায় আহার একটু পরিমাণে কম গ্রহণ করবে।

তারপর ডাক্তার সাহেব যে কথাটি লিখেছেন তা হুবহু এরকম যে, আহারকারীর জন্য একটা সময় এমন আসে, আমরা তখন দ্বিধান্বিত হই যে, আহার আরেকটু নিবো কি নিবো না, ঠিক তখনই আহার ত্যাগ কর। যে এভাবে সারা জীবন চলতে পারবে তার ওজন বাড়ার কিংবা পেটের পীড়ায় ভোগার কোনো অভিযোগ আর শোনা যাবে না। তার আর ডাইটিং করার প্রয়োজন হবে না।

এই পরামর্শই কয়েক বছর পূর্বে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) লিখে গিয়েছেন। এখন ইচ্ছে হলে কমানোর খাতিরে কিংবা আল্লাহকে রাজি-খুশি করার লক্ষ্যে পরামর্শটি অনুযায়ী চলতে পার। তবে কথা হলো, আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহকে রাজি-খুশি করা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে খাবারের রুটিন এভাবেই করে নাও। এতে সাওয়াবও পাবে, আল্লাহও খুশি হবেন, তোমার ওজন কন্ট্রোল হবে। কিন্তু কেবল ওজন কমানোর উদ্দেশ্যে করলে হয়তো তোমার ওজন কমবে কিন্তু সাওয়াব পাওয়া যাবে না।

নফসকে মজা থেকে দূরে রাখো

হযরত থানভী (রহ.) বিষয়টি আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। অন্যথায় আগেকার যুগের সুফীগণ না জানি কত রকম সাধনা করাতেন। সুফীদের দরবারে তখন লঙ্গরখানা থাকতো। সেখানে ঝোল পাকানো হতো। খানকার মুরীদদের প্রতি নির্দেশ ছিলো, যার নিকট এক বাটি ঝোল থাকবে সে ওই সমপরিমাণ পানি

মিশিয়ে তারপর খাবে। যেন নফস মজার চক্কর থেকে বের হয়ে আসতে পারে। তাছাড়া মুরীদদেরকে অনেক সময় ক্ষুধার্তও রাখা হতো। কিন্তু পূর্বেকার সেই সময় আর আমাদের বর্তমান সময় তো এক নয়। যামানার পরিবর্তনে যেমনি ডাক্তারি বিদ্যার মধ্যে ও পরিবর্তন আসে তেমনি হাকীমুল উম্মাত থানভী (রহ.) আমাদের মেজায তবিয়তের প্রতি খেয়াল রেখে আত্মিক চিকিৎসার নতুন পথ দেখালেন। কম আহার করা সম্পর্কীয় তাঁর এ যুগোপযোগী পরামর্শ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট।

উদরপূর্তি

ভালোভাবে উদরপূর্তি করা যদিও ফিকহী দৃষ্টিকোণে নাজায়েয বা হারাম নয়, কিন্তু শারীরিক ও আত্মিক ব্যাধি সৃষ্টি করার কারণ তো অবশ্যই। কারণ, সমূহ নাফরমানীও গুনাহের চিন্তা পেট ভরা থাকলেই তো করা হয়। মানুষ যদি পেটে দানাপানি ঠিক মত না দিতে পারতো, তাহলে গুনাহের চিন্তা-পরিকল্পনাও কমে যেত। তাই বলা হয়েছে, তৃপ্তি মিটিয়ে উদরপূর্তি করে খাওয়া থেকে দূরে থাক। এটার নামই আহার হ্রাস করার সাধনা।

কম কথা বলাও মুজাহাদা

মুজাহাদার দ্বিতীয় প্রকার হলো, تقليل الكلام তথা কম কথা বলা। অর্থাৎ সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের কথা তো থেমে নেই, নিরবচ্ছিন্ন গতিতেই চলছে আমাদের যবান, মুখে যা আসে তাই বলে দিচ্ছি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে, এটা ঠিক নয়। যেহেতু যবানকে এভাবে বল্গাহীন ছেড়ে দিলে, তাকে কাবু না করলে গুনাহ তো হবেই। মনে রাখবে, হাদীস শরীফে এসেছে, নবীজী (সা.) বলেছেন– জাহান্নামে নিক্ষেপকারী জিনিস হচ্ছে যবান। এই যবান স্বাধীনভাবে চলতে থাকলে স্বভাবতই মিথ্যা বলার সাথেও জড়িয়ে পড়তে হয়। গীবত-শেকায়েত এবং অন্যকে কষ্ট দেয়ার গুনাহতে লিপ্ত হবে। আর এভাবে এসব গুনাহের কারণে জাহান্নামের পথও তৈরি হবে।

যবানের গুনাহ হতে নিষ্কৃতি পাবে

মানুষকে কথা কম বলার সাধনা এজন্যই করতে হয় যে, যবান থেকে যেন অযথা কথা বের না হয়। মাপকাঠি দিয়ে প্রয়োজনীয় কথা বলবে। বলার পূর্বে চিন্তা করবে, কথাটি বলা আমার উচিত হচ্ছে কি? গুনাহের কথা বলে ফেলছি নাতো? প্রয়োজন ছাড়া মানুষ কথা না বললে ধীরে ধীরে স্বল্পভাষী হওয়ার

যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। অহেতুক বকবক করতে মন চাইলেও তখন যবানকে কাবু করে রাখা সহজ হয়। মিথ্যা, গীবত এবং যবানের অন্যান্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

বৈধ বিনোদনের অনুমতি

অহেতুক কথাবার্তার যে মজলিস হয়, বর্তমান পরিভাষায় যাকে বলা হয় গল্পসল্পের মজলিস। কোনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হলে বলা হয়, আসো, বসে একটু গল্পসল্প করি। এ অহেতুক গপ্পো মানুষকে গুনাহের প্রতি ধাবিত করে। হ্যাঁ বিনোদনের কম-বেশির অনুমতি ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে। বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম তো এও বলেছেন যে–

رُوِّحُوا الْقُلُوْبَ سَاعَةً فَسَاعَةً. (كَنْزُ الْعُمَّال: ٥٣٥٤)

মাঝে-মধ্যে চিত্তবিনোদন কর। নবীজীর শিক্ষার জন্য উৎসর্গিত হোক। আমাদের জীবন, আমাদের স্বভাব, প্রকৃতি ও প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে! তিনি জানেন, মানুষ যেহেতু মানুষই ফেরেশতা তো নয়, তাই তাদেরকে যদি বলা হয়, দিবানিশি আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকবে, এছাড়া অন্য কোনো কথা বলা নিষেধ, তাহলে তারা তা করবে না। তাদের কিছুটা আরাম-আনন্দেরও প্রয়োজন আছে। বিধায় ফুরফুরে মেজায নিয়ে একটু খোশগল্প তাদের জন্য শুধু জায়েযই নয়; বরং নবীজির পছন্দও। এটা সুন্নাতও। তবে খোশগল্পে ডুবে যাওয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করা, মূল্যবান সময় নষ্ট করা মোটেই উচিত নয়। তাহলে এ জিনিস তাকে স্বাভাবিকভাবে নিয়ে যাবে গুনাহর পথে। তাই বলা হচ্ছে, তোমরা স্বল্পভাষী হও। আর এটাও মুজাহাদারই অন্তর্ভুক্ত।

মেহমানের সাথে খোশগল্প করা সুন্নাত

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) এর নিকট এক ভদ্রলোক আসা-যাওয়া করতেন। তিনি খুব বেশি কথা বলতেন। এসেই তিনি এটা সেটা বলা শুরু করে দিতেন। থামার যেন নামই নিতেন না। আমাদের বুযুর্গদের নিয়ম ছিলো, কোনো মেহমান আসলে তাকে সম্মান করতেন। তার কথাবার্তা শোনা এবং যথাসম্ভব আরামের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিতেন। যদিও একজন ব্যস্ত মানুষের পক্ষে কাজটি কঠিন, আর যাদের জীবন ছিলো হাজারো ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ তাদের পক্ষে তো আরো কঠিন। কিন্তু হাদীস শরীফে

এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোনো আগন্তুক এসে কথা বলা আরম্ভ করলে তিনি ধৈর্য সহকারে শুনতেন। তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সে নিজে মুখ ফিরিয়ে নেয়। হাদীসের ভাষ্য ঠিক এরকম–

حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَالْمُنْصَرِفُ ـ (شَمائِل تِرْمِذِيْ بَاب ماجا فى تو اضع رسو ل الله)

অর্থাৎ, যতক্ষণ না আগন্তুক নিজে চলে যায়। কাজটি সত্যিই কষ্টকর। কারণ অনেকের অভ্যাস দীর্ঘক্ষণ গল্প করার, তখন তার কথা পুরোপুরি মনোযোগের সাথে শোনা নিতান্তই বিরক্তিকর। এতদসত্ত্বেও এটি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বিধায় আমাদের বুযুর্গগণ আগন্তুকের কথা শুনতেন এবং তাকে উল্লসিত করতেন।

সংশোধনের একটি পদ্ধতি

সংশোধনের উদ্দেশ্যে হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। তখন সেক্ষেত্রে কিছু বাধা-নিষেধ দেয়া যেতে পারে। যাক বলতে চাচ্ছিলাম, ওই ভদ্রলোক এতই বকবক শুরু করে দিতেন আর আব্বাজানও অসহায় ভঙ্গিতে তার কথা শুনতেন। কিছু দিন পর ভদ্রলোক আব্বাজানের নিকট দরখাস্ত পেশ করলেন যে, হযরত! আমি আপনার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক করতে চাই। আমাকে কিছু আমল অথবা তাসবীহ বলে দিন। আব্বাজান বললেন; তোমার জন্য বিশেষ কোনো আমল অথবা তাসবীহ নেই। তোমার কাজ শুধু যবানকে নিয়ন্ত্রণ করা। আজ থেকে মুখে তালা লাগাও এবং অহেতুক বকবক করার অভ্যাস বর্জন কর। এটা তোমার ত্রুটি। আজ থেকে এখানে আসলে চুপ করে বসে থাকবে। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা এখন থেকে তোমার জন্য নিষেধ।

অবশেষে এ জাতীয় বাধ্যবাধকতার ফলে কেমন যেন তার উপর প্রলয় নেমে এলো। নীরবে বসে থাকার এ সাধনা তার জন্য হাজারো সাধনার চেয়েও কষ্টসাধ্য মনে হলো। কোনো কথা বলতে মনে চাইলে ও বাধ্য হয়েই নিশ্চুপ থাকতে হতো। চিকিৎসার এ পদ্ধতির মাধ্যমে মহান আল্লাহ তার হাজারো আত্মিক ব্যাধি দূর করে দিলেন।

আব্বাজান উপলব্ধি করেছিলেন, তার মৌলিক ব্যাধি এটিই। এ ব্যাধি বশীভূত করতে পারলে তার জন্য অন্যসব চিকিৎসা সহজ হয়ে যাবে। হলোও তাই। কিছুদিন পরই আল্লাহ তার অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটালেন। মূলতঃ সকলের ব্যাধি এক নয়। অবস্থা প্রেক্ষিতে একেকজনের চিকিৎসা হয় একেক

রকম। কার জন্য কেমন চিকিৎসার প্রয়োজন পীর বা শায়খ তা নির্ণয় করেন। সারকথা, কথা কম বলাও একটা সাধনা।

ঘুমের নিয়ন্ত্রণ

তৃতীয় মুজাহাদা তথা সাধনা হলো تقليل منام অর্থাৎ কম ঘুমানো। এক্ষেত্রেও ওই একই কথা। পূর্বেকার যুগে তো বিনিদ্র থাকাই ছিলো মুজাহাদা। কোন প্রসিদ্ধ আছে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ইশার অযু দ্বারা ফজর নামায পড়তেন। কিন্তু পরবর্তী বুযুর্গানে দ্বীন কম ঘুমানো প্রসঙ্গে বলেছেন, দিবা-রাত্রি কম্পক্ষে ছয় ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। ছয় ঘণ্টারও কম নিদ্রায় মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবে। আর হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, কারো যদি অসময়ে ঘুমানোর অভ্যাস থাকে তাহলে তাকে তা ত্যাগ করতে হবে। আর এটাও তখন মুজাহাদা হবে।

মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক কম রাখা

চতুর্থ মুজাহাদা – تقليل الاختلاط مع الانام

অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা কম করা। অত্যাধিক মেলামেশা থেকে বেঁচে থাকা। কারণ, যার বন্ধুবান্ধব যত বেশি হবে তার গুনাহের আশঙ্কাও তত বেশি। প্রয়োজনে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। অথচ আজকাল তো মানুষের সঙ্গে মিতালী করা স্বতন্ত্র একটি বিদ্যায় পরিণত হয়েছে। যাকে বলা হয় public Relation 'পাবলিক রিলেশন। এ বিদ্যার উদ্দেশ্য, মানুষের সাথে যত পারো সম্পর্ক করো নিজের বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত-অনুরক্ত যত পারো বৃদ্ধি কর। কিন্তু আমাদের বুযুর্গগণ অহেতুক সম্পর্ক তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। বরং তাঁরা পরিচিতজনের সংখ্যা কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

হৃদয় একটি আয়না

কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরকে আয়না স্বরূপ তৈরি করেছেন। যে দৃশ্য মানুষ দেখে তাই হৃদয়ে অংকিত হয়ে যায়। মানুষের সাথে ওঠা-বসা যতবেশি হবে হৃদয়ে তার প্রভাবও তত বেশি হবে। মানুষের মধ্যে ভালো, মন্দ কত ধরনের লোক আছে। দুষ্ট প্রকৃতির কোনো ব্যক্তির সাথে ওঠা-বসা হলে তার প্রভাবও পড়বে এ অন্তরে। এর দ্বারা হৃদয় নষ্ট হবে। তাই বলা হয়েছে, মানুষের সাথে অহেতুক ওঠা-বসা করো না। অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক যত হ্রাস পাবে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক তত বৃদ্ধি পাবে। মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন ·

تعلق حجاب است و بے حاصلی
چوں پیوندہا بگسلی واصلی

অর্থাৎ, এসব সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। দুনিয়াতে যত বেশি বন্ধু-বান্ধব বৃদ্ধি পাবে যে, অমুকের সঙ্গে হৃদ্যতা, অমুকের সঙ্গে সখ্যতা, তত বেশি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক হ্রাস পাবে। অবশ্য বান্দার অধিকার তো আদায় করতেই হবে। এ ব্যাপারে কমতি করা যাবে না। আর এরই নাম تقليل الاختلاط مع الانام তথা মাখলুকের সঙ্গে সম্পর্ক বেশি না রাখা।

সারকথা, এসব মুজাহাদা করতে হয় যেন আমাদের নফস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং অবৈধ কাজের প্রতি যেন তার স্পৃহা না থাকে। তাই সকলেরই এসব মুজাহাদা বা সাধনা করা প্রয়োজন। উত্তম হচ্ছে নিজস্ব মর্জি ও সিদ্ধান্ত মতে মুজাহাদা না করে কারো তত্ত্বাবধানে করা। মানুষ যদি নিজের পানাহার, নিদ্রা ও ওঠা-বসা সম্বন্ধে নিজেই সীমা নির্ধারণ করে তাহলে সেক্ষেত্রে ভারসাম্যতা রক্ষা হয় না। কোনো পথ প্রদর্শকের অধীনে থেকে মুজাহাদা করলে ইনশাআল্লাহ ভালো ফল পাওয়া যাবে, ভারসাম্যও ঠিক থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.